# সমুদ্র-যাত্রা

## অনিল ঘড়াই

ঘুমের মধ্যে আমি বাড়ি দেখি। জঙ্গলের মতো জনহীন, দিঘির মতো অথই, দুর্গের মতো নিশ্ছিদ্র, ফাংগাসের মতো ছত্রাকার, আবার ফাঁকা হাতায় লম্বা দেউড়ি নিয়ে ব্যাপক বাড়ি। কোনওটাই ছোটখাটো নয়। এত বিরাট যে তাদের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো, নীচ থেকে ওপরে যেতে অনেক সময় লাগে। অত সময় ঘুম কাউকে দেয় না। তাদের আদি-অন্ত, নীচ-মহল ওপর-মহল আমার অজানাই থেকে যায়। দেউড়ি থেকে শুরু করি, কখনও কোনও রহস্য-চাতালে, কখনও অফুরান বারান্দার মাঝ-মধ্যিখানে শেষ।

দুর্গ-বাড়িটা একটা কালো মাঠের মধ্যে। কালো, খোলা মাঠ। কিন্তু সে খোলা মাঠ আটকে দিয়েছে গম্ভীর পাঁচিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি দিনের পর দিন। ছায়া-শরীরেরা ইশারায় আমায় ডেকে নিয়ে যায়। এ ঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘর, সব ঘর থেকে সব ঘরে যাওয়া যায়। কিন্তু একটা দরজা বন্ধ করে দিলেই সব শেষ। ভেতরে-যাওয়া কিংবা বাইরে আসা। কোথাও কোনও জানলা নেই। ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে আসি। দরজার পাল্লাগুলো মরচে-ধরা কব্জার ওপর ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে নড়ে। ভয়াল ভ্রূকুটি করে চাপা গর্জন করে দুর্গ। যেন ভীষণ বদমেজাজি রাগী মানুষ একটা, কথার অবাধ্যতা সইতে পারে না। তারপরে দেখি আমার পরনে একটা সুতোও নেই। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। কেন না অনেক দূর দিয়ে ছায়া-মানুষেরা যাচ্ছে। তাদের কেমন চেনা-চেনা মনে হয়। ঘামে ভিজে গেছি দেখি।

ছত্রাকার বাড়িটা আরও অদ্ভুত। তার ঘর উঠোন বারান্দা সব আলাদা আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। যেন কেউ বাড়িটাকে একটা বিশাল কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে প্রচণ্ড রকম ঝাঁকানি দিয়ে দশ-পঁচিশের ঘুঁটির

মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। সব ঘর বারান্দার ছাত খুলে গেছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে আমি লাফ দিয়ে চলে যাই। নষ্ট কুয়োর মতো গোল ঘর। শ্যাওলার চৌবাচ্চার মতো চৌকো ঘর। ঘুরে বেড়াই নিশ্চিন্তে। কেন না আমি উড়তে পারি। আগে যে কথাটা জানতুম না সেটা আশ্চর্য মনে হয়। আফসোস হয়, আগে জানা থাকলে কত নতুন দেশে ভেসে যাওয়া যেত। লোকে কি সেভাবেই যায়? দেশভ্রমণে, তীর্থযাত্রায়? অথচ ট্রেন, অথচ বাস, জাহাজ, উড়োজাহাজ! কেন? কেন! তখন বুঝতে পারি অন্য কেউ পারে না, আমি একাই পারি, জলের তলার অদৃশ্য ডাঙায় লগি দিয়ে ঠ্যালা মেরে যেমন নৌকাযাত্রা, সেরকমই। গুপ্ত ক্ষমতা। আমার একার।

আবার অনেক সময়ে প্রশস্ত হাতায় উড়ে বেড়ায় শুকনো শালপাতা, খড়কুটো, বহুদিনের চাপা ধুলো। বড় বড় থামের মাথায় কবুতর কুবকুব করে, দেখে বুঝি। আওয়াজ শুনি না। তিন মানুষ উঁচু সিং দরজা। খোলা হা হা করছে। চলে যাও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, ঢুকে যাও। রোয়াক দিয়ে ঘেরা চৌকো উঠোন দ্যাখো। ওপর দিকে চেয়ে দ্যাখো আদ্যিকালের সিসে রং আকাশ, যেন কোনও বহুদিনের পুরনো সিন্দুক থেকে বার করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছ্যাতলা-পড়া সাদা পাথরের ঘর। দরজার মতো বড় বড় জানলা। বাইরে তাকালে পড়ো জমি, চোখ অন্ধ করা ভগ্নস্তূপ —কোনও ঘর, ছাত, দালান ধসে পড়ে আছে। বাড়ি ঘিরে ভেতর বাড়ির গোলবারান্দা, বাইরেও দোতলা তিনতলা চারতলা ঘিরে বারান্দা চলেছে এক অন্তহীন পথের মতো। বাড়ির গাঁট থেকে দেওয়াল ফাটিয়ে, ফুঁড়ে উঠেছে ভূতের মতো বট-পাকুড়। তাদের বিস্তৃত শেকড়ের নিশ্বাস আমি শুনতে পাই। ছড়িয়ে যাচ্ছে দেওয়ালময়। ভয়, বিস্ময়, আহ্লাদ তেমন কিছু তো কই হয় না। বাড়িটা তার ঘর, দোর, দালান, উঠোন, বারান্দা, থাম, তার ভগ্নতা ও ভয়াল আগাছা নিয়ে এক ধরনের বাস্তব। ছায়া-বাস্তব। কোথাও ওর কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করা যাবে না। আমি এখানে কেন? আমার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? কী খুঁজছি? কিছু খুঁজছি কী? না কি কেউ আমাকে এই বাড়িগুলো পর

পর দেখিয়ে যায়, বাড়ির দালালরা যেমন দেখায়। যদি কোনওটা পছন্দ হয়।

সারা জীবন এই স্বপ্নগুলো না-ছোড় ফিসফিস করে। ফিরে ফিরে আসতে ওদের কোনও ক্লান্তি নেই, লজ্জা নেই।

যারা খুব অন্তরঙ্গ একমাত্র তাদেরই আমি এই স্বপ্নের বাড়ির কথা বলেছি। এরকম মানুষ আমার জীবনে খুব কম। যেমন দাদু। দাদুই বোধহয় ছিলেন সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাঁর, একমাত্র তাঁরই সারাদিনের কার্যক্রম আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করতুম। একই কাজ করছেন, কিন্তু প্রতিদিন যেন নতুন করে, কেমন একটা ছন্দ আছে, তাতে কোনও একঘেয়েমি নেই। বামুন ঠাকুরের পড়া পাঁচালি নয়, বেশ যত্ন নিয়ে শব্দ বেছে বেছে লেখা এক উপাখ্যান। পুরনো দিনের একটা রাজকীয় স্টুডিবেকারে চড়ে স্যুট-কোট-টাই পরে, হাতির দাঁতের মুণ্ড-অলা ছড়ি নিয়ে তিনি হুস করে অফিস যেতেন। সেটা ছিল তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিক। তাঁর চুলগুলো সব ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি এক কোটি-কোটিপতি ব্যক্তির এস্টেট-ম্যানেজার ছিলেন। কোনও কোনও সংস্থার ডিরেক্টরও ছিলেন। যেমন এক গ্লাস ফ্যাক্টরি। বাব্‌ল উঠে যাওয়া কাচের জিনিস আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত। বড় বড় রঙিন ফুলদানি, সুন্দর সুন্দর গ্লাস, কিন্তু একেকটা একেক রকম, প্লেট আসত ছাপ ঠিকমতো ওঠেনি, ভাল পালিশ হয়নি। এইসব খুঁতো, বুড়বুড়ি ওঠা জিনিসই ডিরেক্টরদের বাড়ি আসত। কেউ এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলত না, খালি মা দুঃখিত গলায় মাঝে মাঝে বলতেন— কখনও কি নিখুঁত জিনিস আপনাকে দেওয়ার কথা মনে হয় না কারও? এত করছেন!

দাদুকে বলতে শুনেছি— মানুষ যেমন নিখুঁত হয় না, জিনিসও তেমন। যা পাচ্ছি, যা পাচ্ছ বউমা, যার হাত দিয়ে যেমনই আসুক সব ঈশ্বরের দান, খুঁতো বলে কি তুমিই ফেলে দিয়েছ? কত যত্ন করে যে সাজিয়ে রেখেছ!

আমার নিজের ঠাকুমা আমার জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু আরও দুই ঠাকুমা ছিলেন—বড়দিদা আর ছোড়দিদা। আর কোনও দাদু বেঁচে ছিলেন না। জ্যাঠামশাই বিয়ে করেননি, কোথায় যে থাকতেন, তখন জানতুম না, কাকা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে, খুব বদলি হতেন, আমার যখন জ্ঞান হয়েছে তখন কাকা আমেদাবাদে। পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানাডা চলে যান, আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। আমার বাবা, বলবার মতো বড় কিছু করতেন না, কিন্তু তাঁর দাপট ছিল খুব। নাম রাজকুমার। দাদুকে গরিব-গুর্বো লোকেরা ভালবেসে রাজাবাবু বলত, তারাই বোধহয় মুখে মুখে রাজকুমার নামটা চালু করে। দাদুর দ্বিতীয় সন্তান আমার বাবা ছিলেন রীতিমতো সুপুরুষ। একটা বি. এ ডিগ্রি ছিল। দাদুর দৌলতে বড় বড় পোস্টে চাকরি পেতেই পারতেন। কিন্তু নিতেন না। তাঁর মত ছিল বাবার বন্ধু বলে যাঁরা তাঁকে স্নেহ করেন, খাতির করেন, তাঁদের তিনি ওপরওয়ালা ভাবতে পারবেন না। সাফ কথা। ভাল ছাত্রও ছিলেন, কিন্তু ইউনিভার্সিটির ছায়া মাড়াননি। ডিগ্রি নিয়ে কী হবে? তিনি কি কোনও ডিগ্রিধারীর থেকে কম পড়াশোনা করেন? সুতরাং তিনি থাকতেন তাঁর মর্জি মেজাজ অনুযায়ী রাজকুমারেরই মতো। বাড়িতে তিনটি বুড়ো মানুষ ও নিজের মেজাজি স্বামীকে সামলাতে মা হিমশিম খেতেন। আমরা জ্ঞান হয়ে থেকে তাঁর সঙ্গ তেমন পাইনি। বাবাকে ঘোর ভয় পেতুম এবং অপছন্দও করতুম। আমার একমাত্র আকর্ষণ ছিল দাদু নামে সেই বৃদ্ধ অথচ কর্মঠ, বাস্তববোধসম্পন্ন অথচ স্নেহশীল মানুষটির প্রতি।

সন্ধেবেলা দাদু ফিরে এসে শরবত কি এক গ্লাস হরলিক্স খাবেন, তারপর আমাদের নিয়ে বসবেন। দাদা এত ভাল ছাত্র ছিল যে নিজেই সব বুঝে করে নিতে পারত। খুব মাঝে মাঝে ছাড়া সাহায্য দরকার হত না। ফিনকি আমার বোন সন্ধে হলেই মায়ের আঁচল ধরে ধরে ঘুরবে। বাকি রইলুম আমি। পড়ি, গল্প করি। যত প্রশ্ন যত মনের কথা পাঠ্য এবং পাঠ্যের বাইরে সবই দাদুর কাছে, দাদুর সঙ্গে। পড়ছি, পড়ছি হঠাৎ হয় তো বইটা ঠেলে সরিয়ে রাখলুম।

—কী হল? বুঝতে পারছ না? না ভাল লাগছে না?

—আচ্ছা দাদু, স্বপ্নের কোনও মানে থাকে?

—খারাপ স্বপ্নের মানে থাকে না। ভাল স্বপ্নের মানে থাকে— দাদু হেসে বললেন— কী স্বপ্ন দেখেছ, ভয় পেয়েছ?

—না বাড়ি। খালি বাড়ি...

স্বপ্নগুলো দাদুকে সবিস্তার বলি।

দাদু কখনও আমার কোনও কথা উড়িয়ে দিতেন না। মন দিয়ে শুনতেন, তর্ক-বিতর্কও করতেন যেন আমি তাঁর সমান বয়সি। ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—তুমি তো মার্বল প্যালেস দেখেছ?

—হ্যাঁ। তুমিই তো নিয়ে গিয়েছিলে!

সারা শীতকাল দাদুর সঙ্গে মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, হুগলির ইমামবাড়া, ব্যান্ডেল চার্চ, চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড, কিছু না হোক আমাদের গঙ্গার ঘাট, ফোর্ট উইলিয়ামের ঢালু জমির ওপর বেড়াতে বেড়াতে মাঝ গঙ্গায় নোঙর করা বড় জাহাজ দেখা ছিল আমাদের তিন ভাইবোনের কাজ।

—স্বামী বিবেকানন্দর বাড়িটাও দেখেছ!

—হ্যাঁ, উনি কোন ঘরটায় জন্মেছিলেন সেটাও।

—ঘিঞ্জি, পড়োমতো, না?

— হ্যাঁ।

—আর দেবেদের বাড়ি? ও বাড়ির একটি ছেলে তোমার বন্ধু না? গেছ?

—কতবার।

—তা হলে ওই বাড়িগুলোই স্বপ্নে নানারকম ভোল পাল্টে পাল্টে আসে। খুব একটা ইমপ্রেশন পড়েছে তোমার মনে, ভাল লেগেছে, বুঝেছ? নাও এবার এসেটা কী লিখলে দেখি।

—আমার ভাল লাগেনি।

—তা হলে খারাপ লেগেছে?

—তা-ও না। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। ভালও না খারাপও না। তুমি থাকলে হয়তো ভাল লাগত।

—ঠিক আছে, এবার থেকে তোমার স্বপ্নের মধ্যে আমায় ডেকে নিয়ো।

আমি স্বস্তি পাই না— স্বপ্ন যদি তোমায় ঢুকতে না দেয়?

—ঠিক কথা— দাদু চিন্তিত মুখে বলেন— জোর করে কি আর কারও স্বপ্নে ঢোকা যায়?

যায় না বোধহয়। তাই আমার স্বপ্নগুলো ছিল জনহীন।

আমাদের বাড়ি আর স্কুলের খুব কাছেই গঙ্গা, বাগবাজারের ঘাট। ঘাটে নাও এসে লাগে। বড় বড় খড়বোঝাই। আবার ছোট ছোট দাঁড়ের নৌকো। তার পাটাতনের তলায় কী আছে কে জানে, ছই থাকলে তার ভেতরটা দেখতে পাই না। একটা অন্ধ কোটর মতো। পাটাতনের ওপর কুণ্ডলী করা জাল, কাক ঠুকরোচ্ছে। জালের সুতো ঠোঁটে চেপে ধরে একবার এদিক একবার ওদিক। তারপরে হঠাৎ হয় তো একটু পাখনা ঝেড়ে নিল। গলা অবধি সমস্ত শরীরটা তখন পালক-পালক। কাক আমার ভাল লাগে। খুব কর্কশ ডাক কাকের, এঁটো কাঁটা খায়, মাথায় ঠোক্কর মারে, বাসা বাঁধতে জানে না, চামচ মুখে করে নিয়ে চলে যায় হরদম। কিন্তু কাক যখন হালকা গরমের দুপুরে একলা গাছেব মাঝডালে বসে থাকে, চুপচাপ, চোখ বাঁকানো নেই, খাবার খোঁজা নেই, কেমন যেন উদাস, ধ্যানস্থ, তখনই কাকের আসল রূপটা ধরা পড়ে। প্রতিদিনের উঞ্ছতা ছাড়িয়ে কাক তখন একা একা জীবন ভাবে, অদ্ভুত নির্লিপ্ত দেখায় তাকে। কালো গা, মিশকালো নয়, কেমন ছাতারে কালো। যা-ই খাক না কেন, কাকের চেহারা খুব সাফসুতরো, আমি কোনওদিনও কোনও মোটা কাকও দেখিনি। ছিপছিপে, হালকা পলকা।

কাকটা জাল ঠোকরাচ্ছে। মাঝি খুব অলস ভাবে একবার তাড়া দিল হু শ্ শ্... কাক একটু পিছিয়ে যায়। আবার তুড়ুক তুড়ুক ফিরে আসে। মাঝি আর ফিরে দেখে না। উবু হয়ে বসে গভীর ভাবে বিড়ি টানে। যেন বিড়ি টানাটা একটা ভীষণ জরুরি কাজ। একটা ঝুপসি গাছের তলায় বসে আমি এইসব দেখি। আশেপাশে তাকিয়ে একটা দুটো ঢিল

খুঁজি। তারপর একটার পর একটা জলে ছুড়ে দিই। খুব বেশি দূর যায় না। কেন? হাতের জোর নেই আমার? ইচ্ছের জোর? পুলুও তো আমার মতো রোগা, ওর ঢিল তো অনেক দূর যায়। নৌকাটার আশেপাশে যদি পড়ত ঢিলটা! শব্দ হত টু প্‌ প্‌ প্‌। মাঝি মুখ তুলে দেখত। সে যদি একবারও আমাকে লক্ষ করে তো আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। সে নৌকা বায়, দূর-দূর দিক-দিগরে যায়, জাল ফেলে মাছ ধরে, মাছের গায়ে রুপো চিক চিক, দুপুরের রোদ চলকে চলকে পড়ছে মাঝির গায়ে, নাওয়ের গলুইয়ে, গঙ্গার ঘোলা জল তখন আর ঘোলা থাকে না, অজস্র চকচকে আঁশ তার জলে চলকায়। এক জীবনে সে কত ঘাট জানল, জলের কত নিবিড় খবর তার কাছে। মাঝি খুব অবাক মানুষ। কেমন একটা সম্ভ্রম হয়, বিশেষ করে যখন দূরে নিজের ডিঙিতে বসে দোল খায়।

পুলু এসে ডাকল— ঠিক জানি তুই এখানে বসে আছিস। কী গরম! রোদের কী ভাপ রে এখানে?

কথা বলি না। মাথার ওপর ঝুপসি গাছের ছাউনিটা দেখিয়ে দিই। পাতা-পাতলির মধ্যে দিয়ে চকরাবকরা রোদ এসে পড়েছে আমার শাদা শার্টের ওপর। কালো কালো ছায়া-পাতার নকশা।

—তাতে কী? ভাপটা তো বেরোচ্ছে মাটি থেকে! গরম হচ্ছে না?

—আমার হচ্ছে না। তোর হলে চলে যা।

তখন গরমের ছুটি। স্কুলে একটা স্পেশ্যাল ক্লাস হয়। হেড সার নিজে পড়াতেন, অঙ্কের জন্যে ছিলেন যতীনবাবু, সব বাঘা বাঘা মাস্টারমশাই। কোচিং ক্লাস সেরে বাকি দুপুরটা বাড়ি যেতে মন চাইত না। নিঝঝুম বাড়ি। দিদারা ঘুমোচ্ছেন। দাদা খুব শান্ত ধরনের, ভীষণ পড়ুয়া ছেলে, তার থাকা না থাকা সমান, ফিনকি গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে, মা খুটুর খুটুর করে আলমারি গোছাচ্ছেন, কী সব সেলাই টেলাই নিয়ে বসেছেন, তারপর একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়েছেন ফিনকির পাশে। কেমন স্যাঁতসেঁতে মরা বাড়ি। আমি নিজেও যে খুব হই-চইয়ে দুরন্ত ছেলে, খুব বলিয়ে-কইয়ে তা তো

একেবারেই নয়। আমার ভেতরের স্তব্ধতাটা যেন আরও জো পেয়ে যেত এমন দুপুরে। তার চেয়ে গঙ্গার ধারে ঝুপসি বটতলায়...— ভাল। অন্যদিন দুপুরে বেরোলে বলে বেরোতে হত, খালি স্পেশ্যাল কোচিং-এর দিনগুলোয় কোনও জবাবদিহি নেই। দেড় ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টা ক্লাস, তারপর স্কুলেই হুটোপাটি। গান, গল্প। যতক্ষণ না দীনবন্ধু দারোয়ান চাবির তোড়া নিয়ে উদয় হত ততক্ষণ দু চারখানা খোলা ঘরে আড্ডা। গলা খাঁকারি, চাবির ঝন ঝন, তার মানেই দীনবন্ধুদা আসছে, উঠে পড়ো এবার।

অন্যান্য দিনে স্কুলে কী রকম একটা গমগমে ভাব। সারেদের পড়ানোর আওয়াজ। ছেলেদের যাওয়া-আসা, একটু-আধটু কথা হাসি সব মিলিয়ে একটা জমজমাট হাওয়া। কিন্তু এই সব গ্রীষ্ম দুপুরের তাতে স্কুলটা যেন একটা অতিকায় কিন্তু খুব নিরীহ জন্তু। তার বিশ্রামের সময়ে কয়েকটি বালখিল্য সামান্য উৎপাত করছে তাতে সে কিছু মনে করত না। সামান্য আওয়াজ করলেই সেটা যেন লাউড-স্পিকার-এ ঘোষণা হয়ে যেত। আমি খুব সন্তর্পণে কান পেতে স্কুল বাড়িটার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেতুম। একটা ভারী শরীরের শ্বাসযন্ত্রে যেমন হয়। আড্ডা হয়। কিন্তু আমি যে তাতে যোগ দিই না, শুধু হাসি, অনেক সময়ে হাসির জায়গায়ও হাসি না, কেমন অন্যমনস্ক থাকি এটা একমাত্র পুলুই লক্ষ করত।

—কী ভাবিস রে? এই সমু?

—কই কিছু না তো!

—কিছু হয়েছে?

—কী হবে?

—তা হলে এরকম চুপচাপ...

—কিচ্ছু ভাবি না।

—বলবি না তাই বল।— এক ঝটকায় ইয়ো-ইয়ো ঘোরাতে শুরু করে পুলু।

আমি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে উঠি— যা মাঞ্জা বানাব না! এবার গোপালদের সব ঘুড়ি কাটতে হবে।

—কী রং দিবি?

—ম্যাজেন্টা, ঘোর ম্যাজেন্টা, আকাশেও সুতোটা দেখা যাবে!

—আমি হলে অরেঞ্জ দিতুম... অরেঞ্জটাও খুব... টিউটোরিয়্যাল থাকলে খুব মজা না রে তোর?— মাঞ্জার প্রসঙ্গ থেকে ছিটকে টিউটোরিয়্যালের প্রসঙ্গে চলে যায় ও। ও আমার কাছ থেকে কথা বার করতে চাইছে। আমার ভেতরে বসে কে যেন ক্রমাগত বলতে থাকে— বলে না এসব বলতে নেই... বলতে নেই...।

বটগাছতলায় বসে গঙ্গার অনর্গল বয়ে যাওয়া দেখছি। ক্লান্ত কাকের ক্বঃ ক্বঃ... মাঝির দোল খাওয়া... পালতোলা নৌকো দূর দিয়ে যাচ্ছে... পুলু বলল—তুই এমন চুপ করে বসে থাকিস কেন রে?

—ভাল লাগে।

—ভাল তো আমারও লাগে। কিন্তু এ রকম চুপচাপ না। দ্যাখ কী রকম এক দফা সাঁতার দিয়ে নিই।

সাঁতার আমিও জানি। দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে শিখেছি। ফ্রি-স্টাইল যাকে গোরাদা বলেন আনতাবড়ি, তার পরেও চিৎ সাঁতার ডুব সাঁতার। ডুব সাঁতার দিচ্ছি একদিন, হঠাৎ জলের মধ্যে থেকে কে আমায় ডাকল—সমর্পণ। স ম-র্পণ। আমার নাম সমর্পণ নয়, তবু মনে হল আমাকেই ডাকছে। কোন পাতালঘর থেকে ভুড়ভুড়ি কাটতে কাটতে ডাকটা বেরিয়ে এল। আমার কানের কাছে এসে যেন ফেটে গেল। তাড়াতাড়ি ভেসে উঠি। এইভাবে দ্বিতীয়বার ডাকলে আমাকে ডুবতে হবে আরও গভীরে। সেখান থেকে ভেসে ওঠবার ক্ষমতা আমার হবে কি না আমি জানি না।

এর পরেই একদিন একটা দুর্ঘটনা হল। ঘোষেদের বাড়ির মনু, মনসিজ পুকুরটাতে ডুবে গেল। বাড়িতে মাকে ভাত বাড়তে বলে এক ছুটে চান করতে গিয়েছিল। চান করা মানে একবার অন্তত এপার-ওপার করা। মনু খুব ভাল সাঁতার জানত। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর মতো চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু কী করে ডুবে যায়! আমি আন্দাজ করতে পারি। ওকে কেউ ডেকেছিল। ডাকটা পুকুরের অতল থেকে পাক খেতে খেতে উঠে এসে মনুর কানের কাছে ফেটে যায়।

ও ডাকটার উৎস খুঁজতে গিয়েছিল। আর ওপরে উঠতে পারেনি। সকলে বলত পুকুরের ভেতর একটা কুয়ো আছে, মরণফাঁদ। জানি না কিন্তু আমার মনে হত ওই কুয়োর মধ্যে ঠিকঠাক মতো ডাইভ দিতে পারলে সোজা অন্য কোনও অজানা ভূখণ্ডে পৌঁছনো যায়। সেখান থেকে কারা আমাদের ডাক পাঠায়, বড্ড একা লাগে ওদের। ওরা কেমন? মানুষই হবে, কিন্তু খুব একা, সঙ্গী-খোঁজা ছায়ামানুষ। তাদের খোঁজে যাব কী! পুকুরটা এরপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। ট্রেনিং বন্ধ রইল এবং মা দাদুকে বলে আমার পুকুরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

—যাবি না সাঁতারে? পুলু শার্টটা খুলে আমার দিকে ছুড়ে দিল। তারপর ঝাঁপ দিল। কিছুক্ষণ পরে সোঁপাট ভিজে উঠে এল প্যান্ট নিংড়োতে নিংড়োতে।

—গেলি না?

—আমি তো যাব বলিনি!

—ভয় পাস?

—আমার এখন সাঁতারের সময় নয়।

—কীসের সময় এখন তা হলে! পুলু একটা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, তারপর শার্টটা ছিনিয়ে নিয়ে প্যান্টের জল নিংড়োতে নিংড়োতে চলে গেল। রাগ হয়েছে।

সত্যিই তো! সাঁতারের সময় নয়তো কিসের সময়? পড়ার সময়, খেলার সময়, শোওয়ার সময়... তেমন কি সাঁতারেরও নির্দিষ্ট সময় থাকে?

গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠপিঁপড়ে নেমে আসে। ঝুরি বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠে যায়। এত সুন্দর প্রাণী, আমার ধারণা ছিল ওদের ডাক পাখির শিসের মতো হবে। ইঁদুর-কিচকিচ শুনে প্রথমটা খুব অভক্তি হয়, এখন সয়ে গেছে। ঘাটে এই পড়তি দুপুরেও চানে নেমেছে জনা দুই লোক। গামছা পরা। গামছার তলা থেকে বেরিয়ে আছে খুব লোমঅলা শুকনো ডালের মতো পা। বুক জলে নেমে ওরা সামনের জল সরিয়ে সরিয়ে ডুব গালছে, কুলকুচি করছে। একজন

কুলকুচির জলটা গাল ফুলিয়ে সামনে ফেলে দিল, আর একজন ফোয়ারার মতো উঁচুদিকে মুখ করে ছুড়ছে। ...ওরা উঠে আসছে। ভিজে গামছা নিংড়িয়ে পরল। ভেতরে ইজের পরা। একজন কুচকুচে কালো, আরেকজন একটু কম। আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

—কী খোকা ইস্কুল পালিয়েছ?

আমি চমকে উঠি। ওদের গায়ের আঁশ-আঁশ জল-চিকচিক চামড়া, কড়া বুড়ো ঘাসের মতো হাত পায়ের লোম, না কামানো নারকোল-ছোবড়ার মতো মুখ... খুব মন দিয়ে দেখছিলুম, ওরা যে আমাকে লক্ষ করতে পারে ভাবিইনি। কেন না আমি তো নিশ্চিহ্ন হয়েছিলুম। গঙ্গার জলে, ভাসমান নৌকোয়, গুটোনো জালের কুণ্ডলীতে, বটের ঝুরিতে একেবারে ঢুকে গিয়েছিলুম, আমার ফুটকির মতো দেহটার একটা দৃশ্যমান অস্তিত্ব আছে এটা একেবারে ভুলে। তাই থতমত খেয়ে যাই।

বলি— এখন গরমের ছুটি তো!

—কোথায় থাকো? বাড়িতে বকেছে?

—না তো!

ওদের বোধহয় বিশ্বাস হয় না। আমার দিকে মাঝে মাঝে চাইতে চাইতে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওরা চলে গেল। ওদের পায়ের ছাপ ধুলোবালিতে শুষে নিয়েছে।

একদিন কোচিং ক্লাসের পর পুলুকে বললুম— পুলু আরেকটু থাক তোকে একটা জিনিস শোনাব।

সবাইকার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে, খাতাপত্তর মুড়ে রেখে বললুম —শোন!

—কী শুনব বল!

—বলব না। তুই শোন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে শোন।

মিনিট দুই তিন হয়ে গেলে ও অধৈর্য হয়ে কনুই দিয়ে ঠ্যালা মারল আমাকে— কী রে, কী শুনব?

—একটা ঝিঝির ডাকের মতো আওয়াজ পাচ্ছিস না?

—না, আমি কোনও ঝিঝি টিঁঝি শুনতে পাচ্ছি না।

—আশ্চর্য! শুনতে পাচ্ছিস না? অমন পষ্ট!

—না, বেশ, ওটা কী? দিন দুপুরে ঝিঝি ডাকে না— না হয় ডাকলই, তো কী?

—ঝিঝি নয় ওটা। আমাদের সবাইকার, সারেদের, পিওনদের, ছেলেদের সবাই সারাদিন যত কথা বলে, হইচই করে সব রেকর্ড করা রয়েছে।

—কী করে বুঝলি আমাদেরই। অন্যকিছুরও তো হতে পারে!

—অন্য কিছু?

ধর ভূত!— বলেই পুলু উঠে দাঁড়াল।

—ভূত নয়— আমি জোর দিয়ে বলি, ভূত-টুত নয়— আমি হেডসারের গলা মাঝে মাঝে চিনতে পারি, অবিনাশবাবুর, তমোনাশদার, ফার্স্টক্লাসের বিজয়মুকুলদা আর তথাগতদা ডিবেট করছিল একদিন। আমরা বাড়ি চলে যাই, আমাদের গলা থেকে যায়।

পুলুর চোখে অস্বস্তি, বলল— তুই শুনতে চাস শোন, আমি চললুম।

দোতলায় হচ্ছিল আমাদের ক্লাস। রুম নাম্বার ইলেভেন। পুলু চলে গেল, আমি বসেই রইলুম। কান পেতে শুনছি, বোঝবার চেষ্টা করছি। ক্রমে যেন ধ্বনি পরতের পর পরত খুলে যায়, খুব পাতলা পরতগুলো, একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া, ক্রমেই ভেতরের পরতের দিকে যেতে থাকি। আশ্চর্য হয়ে শুনি মেয়েদের গলার আওয়াজ। ভারী, সরু, মিঠে। সরু গলার চিৎকার, ভারী গলার ধমক। সবই কিন্তু খুব আবছা। কী এগুলো? আমাদের স্কুলে ভোর সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে দশটা মেয়েদের ক্লাস হয়। সেই আওয়াজগুলো কি এখনও রয়ে গেছে! তার মানে আজকের, গতকালের, পরশুর, অনেক বছর আগেকার ধ্বনিরাও রয়ে গেছে? রয়ে যায়?

এই সময়ে পুলু হাতে খাতা নিয়ে ফিরে আসে। ভয়-ভয় গলায় বলে— এই সমু। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারছি না। ভয় করছে, চল, আমার সঙ্গে চল, লক্ষ্মীটি।

—ভয়? কেন?

— তুই-ই তো ওইসব ভুতুড়ে কথা বলে ভয় ধরিয়ে দিলি আমার।

এখন সাড়ে তিনটে তো বেজে গেছেই! চারদিকে ঘেরা বারান্দা, মাঝখানে উঠোন। বারান্দা দিয়ে নীচের দিকে চাই। কেমন একটা চৌকো কুয়োর মতো, তার ভেতর জলে পড়ে রয়েছে, ঝরা পাতা, খড়কুটো। যে কোনও সিঁড়িতে পৌঁছতে হলেই আমাদের খানিকটা হাঁটতে হবেই। পুলু প্রায় আমার গা ঘেঁষে চলেছে। ওর ঘামের গন্ধ পাচ্ছি। চটচটে হাত, ঠান্ডা। সিঁড়িতে পা দিয়েই চিৎকার করে ডাকল— 'দীনবন্ধুদা— আ— আ।' ডাকটা সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এল। 'দীনবন্ধুদা —আ —আ— আ— আ— আ।' শিউরে উঠল পুলু।

আমি বললুম— ও তো প্রতিধ্বনি। ভয় খাচ্ছিস কেন?

আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি প্রায়, স্কুলের দোতলার তিনটে ঘর খোলা, সদর ফটক, কোল্যাপসিব্‌ল সব খোলা। কী করে যাই? পুলুকে বলি— চল, দীনবন্ধুদাকে ডেকে আনি। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুলু আমার সঙ্গে চলে।

পেছন দিকে স্কুলবাড়ি থেকে নেমে প্লে গ্রাউন্ড। তার একদিকে ছোট্ট একটা ঘর দীনবন্ধুদার। ঘরে তালা মারা। কোথায় গেল? জানে না গেটে তালা দিতে হবে? আমরা আবার সামনে আসি। খোলা গেটের সামনের ধাপে বসে থাকি। পশ্চিমে ময়লা কাপড়ের মতো রোদ ঝুলছে বাড়িগুলোর বারান্দা, ছাত থেকে। তাপ নেই তেমন। কিন্তু ঘাম হচ্ছে, আবার যখন গঙ্গার দিক থেকে হাওয়া আসছে ঝলক ঝলক তখন ঘামের ওপর হাওয়া লেগে খুব আরাম।

পুলুর এখন ভয় অনেকটা কেটেছে। সামনে রাস্তা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে। হেঁটে, সাইকেলে। রিকশা চলে গেল কয়েকটা ঠুনঠুন করতে করতে।

আজকে আর গঙ্গার ধারে যাওয়া হল না। নির্মলদা যাচ্ছিল, সাইকেল থামিয়ে বলল— কী রে। এখানে বসে?

আমরা কৈফিয়ত দেবার আগেই দীনবন্ধুদা এসে গেল। হাতে মাটির ভাঁড়, একটা কাগজের ঠোঙা, ঠোঙাটা তেলে ভিজে উঠেছে।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—খাবে? তেলেভাজা?

—দাও— আমি, পুলু, নির্মলদাও হাত বাড়ায়, আমাদের হাতে একটা করে লম্বা লম্বা বেগুনি দেয় দীনবন্ধু। প্রত্যেকটাতে একটা করে কাঁচা লংকা সাঁটা।

—হরি ঘোষের ইস্ট্রিট থেকে ভাজিয়ে আনলুম। কখন গেছি, তখন তোমরা ক্লাস করছ খোকা। বেজায় ভিড়।

বেগুনি মুখে দিয়েই খিদে পেয়ে গেল। পুলুকে বলি—চ', আমাদের বাড়ি থেকে খেয়ে খেলতে যাব।

—ধুৎ, আমার খেলার মেজাজ নেই।

—কেন?

—কেমন মন খারাপ লাগছে।

—বাড়ি গিয়ে কী করবি?

—তা-ও তো! চল তোদের বাড়িই যাই। তারপরে দেখা যাক।

লুচি ভাজার গন্ধ আসছে। প্রায় পাঁচটা। এই সময়ে আমি, দাদা, বোন কয়েক মিনিট পর পর ফিরি। বোন এখন ছুটিতে বাড়িতেই আছে। এই সময়ে রোজ লুচি কিংবা পরোটা ভাজা হয়। ডালডায়। প্রতি মাসে এত এত ডালডার টিন আসে আমাদের বাড়িতে। ফুরিয়ে গেলে সেগুলো আমরা দখল করি। যত বড় হচ্ছি, ডালডার খালি টিনগুলো অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। মার্বেল ভর্তি, সমুদ্রের ঝিনুক কড়ি ভর্তি, খুচরো পয়সা ভর্তি টিন সব। অনেক সময়ে মা আমার কাছ থেকে খুচরো পয়সা চান— দাও তো তিন টাকা, পরে দিয়ে দেব। মা সেভাবে আর কোনওদিনই ফেরত দেন না। তবে টাকাপয়সা তো আমরা মোটামুটি পাই-ই। জন্মদিনে, পয়লা বৈশাখে, দোল, রথ, সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজো, এ রকম অনেক উপলক্ষ আছে। লুচি ভাজার বোদা জ্বলা-জ্বলা গন্ধটা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু খাবার সময় অত গন্ধ পাই না। আলু চচ্চড়ি দিয়ে মুড়ে খেয়ে নিই। আলু মরিচ করলে মা একটু মাখন দ্যান, সেটা খেতে আমি বেশি ভালবাসি।

সদর-দরজাটা আধ-ভেজানো, ভেতরে আমাদের উঠোনের একটা

সরু রেখা দেখা যাচ্ছে। খুলি। রোদ ঢুকে যায়, একেবারে পড়তি বেলার ঝিমঝিমে রোদ। উঠোনে ঢুকেই কিছু দূরে একটা পেয়ারা গাছ, এটা আমাদের বাসনমাজার লোক মঙ্গলা পুঁতেছিল। চকচকে মচমচে গাঢ় সবুজ হালকা সবুজ পাতা নিয়ে সুন্দর দাঁড়িয়ে থাকে গাছটা। পেয়ারা গাছের পেছনে লোকজনেদের কলঘর। বেশ বড় একটা চত্বর জুড়ে জায়গাটা। বড় চৌবাচ্চা, ভেতরে কল বাইরেও কল। কাপড় মেলার জায়গা আছে। পায়খানা ডানদিকে। আমি দেখেছি। ওটা রোজ পরিষ্কার করান দাদু। লোকজন যে-ই ব্যবহার করুক, কিন্তু তবু আমার ঘেন্না করে। কী রকম একটা কৌতূহলও হয়, মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে দেখি— একটু পুরনো রঙের সাদা প্যান। দুটো ধাপি, পাশেই কল, কলের তলায় একটা এত বড় পেতলের গাড়ু বসানো থাকত আগে। সেটা চুরি হয়ে যাবার পর এখন একটা মরচে-ধরা টিনের মগ থাকে। আমার মনে হয়, এই জায়গাটুকু একটা ভিন্ন দেশ, অচেনা, অজানা, পুকুরের মধ্যেকার কুয়োর উল্টো দিকের দেশের মতো। কখনও কখনও জলভর্তি চৌবাচ্চাটার ধারে দাঁড়াই। ভেতর বাড়ির কলঘরে এত বড় চৌবাচ্চা নেই। দাঁড়ালে জলের মধ্যে আমার ছায়া পড়ে।

—তুমি এখানে থাকো? জলের মধ্যে? —কেমন ঝাপসা চুল, ঝাপসা চোখ মুখ ছেলেটার। টুপটাপ করে পেয়ারা পাতা খসে পড়ে, সামান্য একটু চিড় খায় জল, ছায়া ভেঙে ভেঙে যায়। ও আমার কথার জবাব দেবে না। লুকিয়ে পড়ল। ওকে ধরতাই দিল পেয়ারা গাছ, হাওয়া, হাওয়ার ভেতর মিশে থাকা ধুলো, আলো, ছায়া। জানি ওটা আমারই ছায়া। কিন্তু জলের মধ্যে সে যেন অন্য কেউ। চেনা আবার অচেনা। ছায়া মানুষ। আর এক জীবন, অন্য ধরনের। সে আমাকে কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দেবে না।

লুচি দিয়ে কুমড়োর ছোঁকা খেয়ে আমরা লুডো খেলতে বসি। আমি, পুলু আর বোন, প্রত্যেকবার কী কৌশলে বোন জিতে যায়, বেস্ট অব থ্রি, বেস্ট অব ফাইভ, বেস্ট অব সেভেন...তাতেও। নিজের ঘুঁটি হোমে উঠিয়ে ও বলে—তোরা খেলা শেষ কর। আমি চট করে

ঘুরে আসছি। —ঘুরে আসছি মানে ও পুতুলদের কাপড় পাল্টাবে। ছোট বড় কাঠ মাটি কাচ গাদা পুতুল ওর। সেগুলো নিয়ে খেলে। নাইলন ডল সাজিয়ে রেখে দেয়।

ও আমার চেয়ে বেশ ছোট। আমি যেমন শান্ত, চুপচাপ, ও তেমন দস্যি। মুখে খই ফুটছে। বাবার খুব আদুরে ও। একমাত্র ওকেই বাবা কখনও বকেন না। দাদা এখন কলেজে, তবু দাদা মাঝেমধ্যে বাবার খারাপ মেজাজের আঁচ পায়। আমি তো পাই-ই। তবে আমি পারতপক্ষে বাবার ত্রিসীমায় যাই না, বকা-ঝকা খাওয়ার মতো কিছু তো করিও না। তবুও কোনও কারণে মেজাজ খারাপ হলেই বাবা গর্জন করে আমাকে আর মাকে বকেন।

—কী খেতে দাও ছেলেটাকে? এত রোগা? এত কালো? নিজেও যেমন হচ্ছ, এ ছেলেটাকেও তেমন করছ। অ্যাই সমু কোনওদিনও যেন আর না শুনি যে তুমি দুধ খাওনি। ট্যাং ট্যাং করে রাস্তায় ঘুরতে দেখি না যেন।

বাবা কী করে আমায় রাস্তায় ঘুরতে দেখবেন? ফেরেন তো রাত নটার আগে নয়। তখন আমার খেলাধুলো, পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া সব শেষ। তখন আমি কোনও বই বা পত্রিকা পড়ছি। আর দুধ? দুধ যে কবে শেষ খেয়েছি আমি মনে করতেই পারি না। দুধ দেখলে আমার বমি আসে। মা, দিদারা এমনকী দাদু পর্যন্ত এই কঠিন সত্যটা মেনে নিয়েছেন যে আমাকে দুধ বা ছানা খাওয়ানো যাবে না। আর বাবা সে খবরই রাখেন না! বাবাকে আমি খুব এড়িয়ে চলি। যত বড় হচ্ছি তত ভয়বোধটা চলে যাচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বিরক্তি। দাদার সঙ্গে তো ক্রমে বাবার কোনও কথাবার্তাই থাকছে না। দাদা, আমি, ফিনকি সবাই একসঙ্গে খেয়ে নিই। তখন বাবা কোথায়? জুতোর মচমচ শব্দ শুনলেই দাদা শেষ গরসটুকু হাপুস-হুপুস করে খেয়ে নিয়ে, বা পাতে ফেলে রেখে উঠে পড়ে, চৌকাঠ পেরিয়ে পগারপার। নিজের থালাটা পর্যন্ত দাদা উঠোনে কলের নীচে নামিয়ে রেখে যায়। আর আমি? মা যদি 'তোমার বাবা'... দিয়ে কোনও কথা শুরু করেন, আমি বলি—আহ্—ছাড়ো তো।

দাদু বাবাকে খোকা বলেন, খুব সমীহ করেন, কিন্তু দাদুর মতামত, আমাদের সঙ্গে ব্যবহার বাবার একেবারে বিপরীত। দাদু আমাদের এগিয়ে দ্যান, সাহস দ্যান, বাবা বাগড়া দ্যান। বয় স্কাউট-এ ভর্তি হব, বাবা বললেন—না। দাদু বললেন—ডিসিপ্লিনের শিক্ষা হবে খোকা ও ভর্তি হোক।

—বাবলুর বেলায় তো বলনি?

—বাবলু চায়নি। যে যেটা ভালবাসে, আপনি করে।

—তবে ও বয় স্কাউটে যাবেই!

—আমি তো সেটাই উচিত মনে করি।

বাবা শব্দ করে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখেন। ভীষণ জলদ গলায় হাঁকতে হাঁকতে চলে যান ওপরে—আমি আজ সাড়ে আটটায় ভাত খেতে নামব। তরকারি যেন কাঁচা না থাকে।

মা মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে দাদুর ঘরে ঢোকেন।

—কী হল, বাবা?

—সমু বয় স্কাউট করতে চাইছে।

—পছন্দ নয়?

—না।

—কেন?

—পছন্দ নয়, পছন্দ নয়। খোকার অপছন্দের কি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে বউমা! দেখো গতকাল হয়তো আপিসে হিসেব মেলেনি।

মাসের শেষে হিসেব মেলাটা ছিল বাবার প্রতি মাসের ক্রাইসিস। ওই সময়টা বাবা একেবারে অন্যমনস্ক এবং তিরিক্ষি হয়ে থাকতেন। আসল কথা, বিদ্যা, ঝোঁক, মেজাজ সব ধরতে গেলে বাবার হওয়া উচিত ছিল অধ্যাপক। কিন্তু হতে হয়েছিল হেড-আপিসের বড়বাবু। ছোটবাবু থেকে শুরু করে আমাদের যখন ভালমতো জ্ঞান হয়েছে তখন বড়বাবু। ওই কাজ করতে ওঁর ভাল লাগত না। এদিকে নিজের পায়ে কুড়ুলটি তো নিজেই মেরেছেন। তার ওপর ষোলো আনার জায়গায় তাঁর কাজে নিষ্ঠা ছিল ষোলো আনা, ভয় আঠারো

আনা। টাকাপয়সা নিয়ে কারবার! কাজেই ক্রাইসিস, মেজাজ খারাপ।

বাবাকে স্বাভাবিক সাবধানতায় এড়িয়ে চলতুম। আর এই সময়টা একেবারে ধারেকাছে থাকতুম না। সেবার হল কি রাত্তিরে ফিরেই বাবা হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছেন।

দাদুকে বলছেন—কত বার বলেছি তুমি রাতে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। বুড়োমানুষ ঠিক সময়ে খাওয়া ঘুম চাই, কিছুতেই কথা শুনবে না?

দাদু—আমি যদি বুড়ো মানুষ হই তো তুই কী! আমার তো মনে হয় তুই-ই বুড়োমানুষ। বাহাত্তুরে ধরলে তখন মানুষ খামোখা এমন অশান্তি করে। কী হল তোর? আবার হিসেব মেলেনি!

—আর বোলো না, কে যে ভুলটা করে বসে আছে এখনও ধরতেই পারিনি।

—মাথা ঠান্ডা করে, টেন্‌স্‌ না হয়ে দ্যাখ ভাল করে। ঠিক বেরোবে।

—বলছ?

—বলছি। না বেরোবে তো যাবে কোথায়?

—কালই বেরোবে তো? তোমার মনটা কী বলছে?

—কালই বেরোবে।

—দেখি। তোমার কথা তো সচরাচর মিথ্যে হয় না। একটু ঠান্ডা হলেন এইভাবে, তারপরই—বাবলা, বাবলা কোথায়?

বাবলা মানে আমার দাদা।

—তার খোঁজে তোর কী দরকার? দাদু বলে উঠলেন।

—সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে নিজের সন্তান-সন্ততির খবর নিতে পারব না! বা বাঁবা বা!

মা মাথার ঘোমটাটা একবার তোলবার ভঙ্গি করলেন, ধীর গলায় বললেন, বাবলা খেয়েদেয়ে এখন পড়াশোনা করছে।

—এত রাত্তির অব্দি? চোখ-ফোক খারাপ হয়ে গেলে?

দাদু বললেন—এখন মোটে সাড়ে ন'টা, বাড়ি ফেরবার পক্ষে দেরি

কিন্তু বি. এসসি-র পড়া করবার পক্ষে দেরি নয়। তুই যা, হাত পা ধুয়ে খেতে বোস গে।

সে সময়ে আমরা মেঝেতে খেতুম। ছোট কিন্তু খুব পরিষ্কার সবুজ মেঝের ঘরখানা। গরমকালে খুব শীতল থাকত। শতরঞ্চির চৌকো চৌকো আসন পাতা থাকত। সোজা উল্টো বোঝবার জন্যে মেজদিদা আসনের এক পিঠে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখতেন। সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে খানিকটা গিঁট পাকানো। যদি কোনওদিন ভুলক্রমে উল্টো দিকটা ওপরের পিঠে পড়ত তো বাবার বিরক্তি দেখতে হয়! তার ওপরে আবার লুচি ফোলেনি। বেগুনভাজা ভেতরশক্ত, মাংসের ঝোলটা কেন জলের মতো... একটার পর একটা বাবা খুঁত ধরতে থাকতেন। রাঁধুনি কাঠ হয়ে যেত। শেষে দাদু ডাক পাড়তেন ফিনকি! ফিনকি! ফিনকি আমার বোনের নাম। ও তখন ঘুমে ঢুলছে। আমি ওকে বেশ করে নাড়া দিয়ে বলতুম—শুনতে পাচ্ছিস না! দাদু ডাকছেন, একবার নীচে গিয়ে দ্যাখ।

মুঠো দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে নোদলগোদল করে নেমে যেত ফিনকি—বাঁব্বাঃ, এঁকটুখানি ইতিহাঁস পঁড়ছিলুম। তোমরা আমাকে একটু পঁড়তেও দিলে না। পঁরীক্ষাতে খাঁরাপ হঁলে বলতে পারবে না কিন্তু। খালি কাঁজ আর কাঁজ আর কাঁজ... এইভাবে গজ গজ করতে করতে নেমে যেত ফিনকি। আর তার মিষ্টি গলার পাকা পাকা কথা শুনতে শুনতেই বাবা ক্রমে অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন।

দাদু ফিনকিকে ডেকে দিয়েই ঘটনায় ইতি টেনে দিতে পেরেছেন জেনে এবার শুতে চলে যেতেন। এবার উনি বই পড়বেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে যে-ই ঘুমে চোখ বুজে আসবে, অমনি বেড সুইচটা টিপে অফ্ করে দিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়বেন। পরদিন ভোর চারটে সাড়ে চারটেয় উঠে ছোটখাটো ব্যায়াম করবেন, চান করবেন। বেলপোড়া আর কাঁঠালিকলা খাবেন। তারপর গীতা কিংবা মহাভারত কিংবা ভাগবত একটা কিছু পড়বেন।

এদিকে ফিনকি খাবার ঘরে ঢুকে বলবে—একটু শান্তি করে

পাঁড়তেও তুমি আমাকে দেবে না বাঁবা। উঃ! কী চিৎকার, কী চিৎকার, ঠিক যেন বাঁড়িতে ডাঁকাত পড়েছে।

বাবা হাসতে হাসতে বলবেন—তা তুই যে ডাকাতদলনী আছিস! ভয়টা কী! এই নে একটা লুচি খা তো এখন!

—আমরা বিকেলে লুচি খেয়েছি বাবা, আর খাব না। রাত্তিরে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাই। আমার পেটটা ঠাসা।

—একটা খা না! ওগো, ফিনিকে একটা লুচি আলুভাজা দিয়ে দাও তো!

—ও পারবে না, অসুখ করবে— মায়ের জবাব।

—অসুখ করবে? না, থাক তবে...

তারপর বাবার প্রবল উৎসাহে গল্প শুরু হয়ে যাবে। একটু পরে ফিনকি ঢুলতে ঢুলতে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়বে। বাবা বলবেন জোছনায় ফিনিক ফুটেছে।

আঁচিয়ে টাঁচিয়ে কোলে করে ফিনকিকে নিয়ে ওপরে উঠবেন বাবা, মায়ের বিছানায় শুইয়ে দেবেন আস্তে।

আমি এই পুরো সময়টা, দাদার টেবিলে-চেয়ারে বসে গল্পের বই পড়তুম। রবিনসন ক্রুসো, মাস্টারম্যান রেডি, টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দা সি। এই সব। আমার চারপাশ ঘিরে জল, অরণ্য কিংবা আকাশ। মাঝে মাঝে নীচ থেকে হাসি, কথার টুকরো ওপরে উঠে আসছে, যেন মহাকাশে একটা স্যাটেলাইট চলে গেল। সমুদ্রে একটা ভেলা, কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছে, সমুদ্র যেমন তেমনই। আমার সমুদ্র আকাশ অরণ্যে কখনও চিড় ধরে না। হঠাৎ দাদা বলে ওঠে— কী রে সমু, কখন থেকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?

তবে কি দাদা অনেকক্ষণ ধরেই ডাকছে? আমি শুনতে পাইনি তো!

দাদা বলে— এই ডায়াগ্রামটা আমায় করে দে তো! আমি ততক্ষণ চ্যাপটারটা শেষ করে নিই। লেবেলিং করতে হবে না, আমি করে নেব।

ডায়াগ্রামটা কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখি। তারপরে সেট স্কোয়্যার, কম্পাস, রুলার দিয়ে এঁকে ফেলি।

—বাঃ তুই এগুলো এত চমৎকার আঁকিস, তুই আর্কিটেকচার নিয়ে পড়িস, বুঝলি? এত গল্পের বই পড়িস কেন?

—পড়ব না? পড়লে কী হয়!

—পড়বি না বলিনি। এত পড়াটা ঠিক নয়। মগজটা অলস হয়ে যাবে।

—গেলে?

—গেলে আর কী! ডিফিকাল্ট কিছু ধরতে পারবি না, ধৈর্য চলে যাবে।

আমি বইটা উল্টে রেখে দিই।

সত্যি কথা বলতে কি আমার অসুবিধে হয় না। মানান রকম ভাবনা-চিন্তা বই-টই সত্ত্বেও লেখাপড়ার ব্যাপারটা আমার ভালই আসে। হাতের লেখা ভাল। ছোট্ট করে গুছিয়ে সব লিখে দিতে পারি। অঙ্ক বেশির ভাগই ঠিক হয়। আশি নব্বুই কক্ষনও পাই না। সব সারই বলেন, তুমি বড্ড কম লেখো সমুদ্র, সুন্দর স্পষ্ট উত্তর, কিন্তু বড্ড ছোট্ট। এ কথার মানে কী আমি বুঝি না। যেটার ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে সেটা তো পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। তবে? এর চেয়ে বেশি বলতে লিখতে আমার ভাল লাগে না। তাতে ফার্স্ট সেকেন্ড না হলুম তো না-ই হলুম।

দাদা বলল— তুই কেন এত নির্জীব রে? ভাল করে খাস না, না কি!

সত্যি কথাই, আমার খাওয়া একটু কম। ঠাকুমারা এ নিয়ে অনেক বকাবকি করেছেন। মা বলেন ওর পেটের খোল যদি ছোট হয় তো ও কী করবে বড়মা?

—খেলাধুলো করো না? —দাদু জিজ্ঞেস করেন।

—খেলি তো!

—কী, কী?

—ফুটবল না। কিন্তু ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন তো প্রায়ই খেলি।

দাদা বলল— একটু এক্সারসাইজ কর দেখি। স্বাস্থ্যটা ভাল হবে। রোজ রোজ এই কালো রোগা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগে।

তখন আমি সত্যিই ব্যায়াম করতে আরম্ভ করি। গোরাদাদেরই একটা ক্লাব আছে। সেখানে খালি হাতে ব্যায়াম, যোগাসন, বার্বেল, ডাম্বেল মুগুর এসব নিয়ে সব রকম্যেরই শেখায়। আমি বললুম—গোরাদা, আমার যাতে চেহারাটা বেশ তাগড়াই হয়, খাওয়া বাড়ে তেমন কিছু শেখান তো!

—যাতে খাওয়া বাড়ে? কে বলেছে? এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে? গোরাদা হাসতে লাগল।

—সব্বাই, আমিও হেসে বলি।

ভাল করে দেখে শুনে গোরাদা বলল— তুই দু'চারটে ফ্রি হ্যান্ড কর, তারপর তোকে যোগ-ব্যায়াম শেখাব। দেখবি চমৎকার চেহারা হয়ে যাবে।

সত্যিই কিন্তু আমি যখন হায়ার সেকেন্ডারিতে কলেজে ভর্তি হই তখন আমার খুব চমৎকার স্বাস্থ্য! আয়নায় নিজেকে দেখতে নিজেরই গর্ব হয়। ঠিক যাকে বলে পেশিবহুল দেহ তা নয়। কিন্তু দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ঠিকঠাক চওড়া, পেশি দিয়ে সুন্দর ভাবে ঢাকা কাঠামোখানা, তার ওপরে মাছি পিছলোনো চকচকে চামড়া। এখন আর কণ্ঠা জেগে নেই। চোখের কোল বসা নয়, আঙুলগুলো খ্যাংরা ঝাঁটার কাঠির মতো নয়। আমার অখণ্ড মনোযোগের ক্ষমতা পরীক্ষার খুব কাজে লেগেছে। বাড়িতে সবাই খুশি। আমাকে নিয়ে আর তেমন সমস্যা নেই।

সমস্যা অবশ্য আগেও ছিল না। কিন্তু আমি অত রোগা-টোগা বলে, খাওয়া-দাওয়া তেমন করে করতুম না বলে, আর লোকের সঙ্গে মিশতে পারতুম না বলে বোধহয় ভাবনা ছিল, মা আর দাদুর মধ্যে এ নিয়ে নিশ্চয় কথা হত। কেন না একদিন দাদুই কথাটা বলেছিলেন—যাক সমুভাই, এখন তোমার স্বাস্থ্যটা আর ভাবাচ্ছে না।

—ভাবাচ্ছিল বুঝি? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

—হ্যাঁ তা তো খানিকটা বটেই। স্বাস্থ্য ভাল না হলে মানুষ ঠিকঠাক জীবন উপভোগ করতে পারে না। আর উপভোগ না হলেই মনমরা হয়ে থাকে।

—আমি কি মনমরা থাকতুম, দাদু? কই, আমি জানি না তো!
—জান না? নিজে অনেক সময়ে বুঝতে পারা যায় না।

তখন আমার ইলেভ্‌ন্‌ থেকে টুয়েলভে ওঠার পরীক্ষা এসে গেছে। প্রিপারেশনের ছুটি চলছে। পরীক্ষার জন্যে আমার আলাদা করে পড়ার দরকার হত না। তাই সারা বছরের রুটিনই চলত। কিন্তু তাতে তো সবার মন উঠত না। দাদাই তো ধমক মারত। একগাদা প্রবলেম দিত সল্‌ভ্‌ করতে। বেশির ভাগই পারতুম। কয়েকটা হয়তো পারলুম না। দাদা বলত— দেখছিস তো? প্র্যাকটিস চাই। ভাল রকম অনুশীলন।

বাবা নিজের ভুল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন বলেই থেকে থেকে বলছিলেন পড়াশুনো ঠিকঠাক হচ্ছে তো? দেখো ফাঁকি দিয়ো না, পস্তাবে।

মায়েরও খুব টেনশন হচ্ছে ভেতরে ভেতরে, বোঝা যেত। একটু বেশি করে মাছ দিলেন হয়তো, খেতে আপত্তি করলে বলতেন— মাছ খেলে মগজ পরিষ্কার হয় সমু।

সেই সময়ে একদিন দাদু একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরলেন। মুখটা গম্ভীর। হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ির ঢোলা পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরলেন। আমিও তখন সবে বাড়ি ঢুকেছি। দাদু বললেন— সমু ভাই, তোমার একটু সময় হবে?

—হ্যাঁ, কেন হবে না? —আমি বসে পড়ি।

দাদু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখতে থাকেন। যেন জরিপ করে নিচ্ছেন কিন্তু একটু অন্যমনে। আমি ধৈর্য ধরে বসে থাকি। হঠাৎ দাদু কথা বলেন।

—সাম হাউ আমার মনে হয়, তুমি একটু আলগা, মানে বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্কর কথা বলছি।

আমি চুপ করে থাকি।

—শুধু বাড়ি কেন, সমু, পুরো সংসারটার সঙ্গেই যেন তোমার কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই। ঠিক কি না?

এটা সরাসরি প্রশ্ন। জবাব দিতেই হয়।

—কেন এ কথা বলছ? আমি তো আজকাল বাজার পর্যন্ত করি। ফিনকিকে পড়া দেখিয়ে দিই, আমি ভাবতে থাকি তারপর বলি, আর ধরো হঠাৎ ডাক্তার ডাকতে হলে, ওষুধ কিনতে হলে... বাড়িতে কেউ এলে মিষ্টি-টিষ্টি কিনতে হলে...।

দাদু বললেন— সেটাই তো ভাবাচ্ছে। এমন নয় যে তুমি দায়িত্বশীল নও, কিছু করতে বললে সেটা তুমি পালনও কর। আমি জানি, তোমার বয়সে একটু বাইরের টান বেশি হয়। বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু এটা আজকের ব্যাপার নয় সমু। ছোট্ট থেকেই তোমাকে এমনই দেখছি। পুলু ছাড়া কোনও বন্ধুকেও তো আসতে দেখি না। বন্ধু হয়নি তোমার? কলেজে, ক্লাবে?

—হ্যাঁ, অনেক তো!

—না, না, আমি জাস্ট পরিচিত সমবয়সিদের কথা বলছি না। বন্ধু, যার সঙ্গে তোমার কোনও বন্ড আছে, যাকে তুমি সব কথা বলতে পার।

আমি চুপ করে থাকি। ভেবে দেখতে গেলে সত্যিই তেমন প্রাণের বন্ধু কেউই নেই আমার। অথচ কতজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। ক্লাবে ব্যায়ামের পর খালি গায়ে তোয়ালে কাঁধে যখন বসে থাকি, কত গুলতানি হয়, আমি তো থাকি, মাঝে মধ্যে ফোড়নও দিই।

—অখিলদা আজকাল খুব ডাঁটে থাকে... দেখেছিস? মোটরবাইকটা কেনার পর থেকে... কেউ হয়তো বলল।

—এবার পেছনে কোমর জড়িয়ে বসার কেউ এলে তো আর দেখতে হচ্ছে না, কী বল সমু? বিনুনি উড়বে, আঁচল উড়বে। পথ যদি না শেষ হয়... আরেকজন।

আমি হাসি।

—এবার জুনিয়র সেকশনে বান্ধব-সমিতির একটা ছেলে নিখিল ভারত যোগকুমার হয়েছে... কী নাম রে ছেলেটার? ...আমি বলি।

—সঙ্কর্ষণ বোধহয়...

—গোরাদার ক্ষমতা নেই ওরকম একটা বার করে, কী বল সমু? একজন মন্তব্য করে।

—কেন? আমরা তো বেশ ভালই আছি!

—এতদিন শরীর-চর্চা করছি, একটা অ্যাম্বিশন থাকবে না?

—আমার তো এটাই অ্যাম্বিশন ছিল। ভাল স্বাস্থ্য, সত্যিই আজকাল সব সময়ে বেশ ফ্রেশ লাগে।— আমি বলি।

কলেজের আড্ডা আবার অন্য রকম। বেশির ভাগ ছেলেই মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করে।

—প্রীতি খুব স্মার্ট, কী রকম গটমট করে যায়, টকাটক উত্তর দেয়!

—মুখটা ভ্যাঁটকা। সুইট হল রীনা...মুখার্জি না মিত্র রে?

—কেন তাতে কী দরকার? পদবি মিলিয়ে প্রেম করবে গুরু? কী বলে সেই? পাল্টি ঘর?

—যাঃ, প্রেম-ফ্রেম কে করতে চাইছে?

—পেটে খিদে, মুখে লাজ, বাবা! আছ হোস্টেলে, চুটিয়ে যা করবার করে নাও এই বেলা।

মেয়েদের বিষয়ে আমার যে খুব একটা শুচিবাই আছে তা কিন্তু নয়। আমিও দেখি—প্রীতিকে। ওর স্মার্টনেস আমার ভাল লাগে। রীনা সত্যি সুন্দর। এত সুন্দর হাসে। এ ছাড়াও আছে রত্নাবলী, নন্দিতা, সুমিতা। সুমিতা খুব ভাল ছাত্রী, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা, ও খুব পড়ুয়া টাইপ। কারও দিকে বড় একটা মন দেয় না। রত্নাবলী ধনী লোকের মেয়ে, গাড়িতে আসে যায়, গা থেকে ভুরভুরে সেন্টের গন্ধ বেরোয়, একেক দিন একেক রকম শাড়ি। নন্দিতা কালো, রোগা, গম্ভীর। মনে হয় ও অম্বলের অসুখে ভুগছে। এ ছাড়াও অনেক আছে— অর্ণব, সুকান্ত, চঞ্চল, আদি, প্রণব... অনেক, অনে-ক।

আমি গ্যালারির সর্বোচ্চ বেঞ্চে বসে ওদের কালো কালো মাথা দেখি, একটা স্থির কালো নদী যেন। বাবরিতে, বিনুনিতে, কদম ছাঁটে, বব-চুলে বয়ে বয়ে চলেছে। ক্লাস শেষে নদীতে ঢেউ ওঠে, ভেঙে ভেঙে যায় সব।

পুলক বলে—কী রে, যাবি না!

যেন ঘুম ভেঙে উঠি—অ্যাঁ? হ্যাঁ! চল।

দাদু আবার বলেন—বন্ধু না থাকাটা একটু...

আমি বলি—বন্ধু নেই, তা নয়, আছে। তবে মনের কথা বলার মতো... তা ছাড়া মনের আবার আলাদা করে কথাই বা কী! কোনও কথা নেই তো!

—তুমি যে সেই বাড়ির স্বপ্নের কথা বলতে! জানলাহীন বাড়ি। বট অশ্বত্থ গজিয়েছে... দেওয়াল থেকে।

আমি চমকে উঠি। আগের রাতেই দেখেছি। ঘরের পরে ঘর, তারপরে আরও ঘর, ভগ্নস্তূপ। দেওয়াল আঁকড়ে আছে শেকড়-বাকড়। চুন বালি খসা দেওয়াল...

—দেখি, মাঝে মাঝে।

—শোনো, প্রায়ই যখন দ্যাখো ও স্বপ্নের কোনও একটা মানে আছে।

আমার একটু আগ্রহ হয়। আমিও নিশ্চিত স্বপ্নটার কোনও মানে আছে। কিন্তু সেটা কী ধরনের মানে তা আমি বুঝতে পারি না। যেভাবে বলা হয় ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। ভবিষ্যতের ছবি দেখা যায়। সাপের স্বপ্ন মানে বংশবৃদ্ধি। এইভাবে কী? আমি জানি না, কিন্তু জানতে চাই। নিজে নিজে বুঝতে পারলেই সবচেয়ে ভাল।

—তুমি কি কবিতা লেখ?— দাদু জিজ্ঞেস করেন।

—না, না,— আমি খুব প্রতিবাদ করে উঠি।

—কেন সমু, কবিতা লেখা তো খারাপ কিছু নয়? তোমাদের বয়সে তোমাদের বাবাও অনেক কবিতা লিখেছে। সে স্টেজটা স্থায়ী হয়নি। যাদের স্থায়ী হয় তারাই কবি হয়।

—আমি কবিতা লিখি না দাদু, কিন্তু আমার প্রতিদিন কত কী মনে হয়!

—শোনো সমু, সেই মনে-হওয়াগুলো অনর্থক মনের মধ্যে না রেখে একটা ডায়েরি-টায়েরিতে লিখে ফেল। তুমি...তুমি বোধহয় তোমার বয়সের তুলনায় বেশি ম্যাচিওর, হয়তো সেই জন্যেই সমবয়সিদের মধ্যে বন্ধু পাও না। যেটুকু কথা বলো সে এই বুড়ো মানুষটার সঙ্গে, কেমন?

দাদুর কথা শুনে আমি হাসি।

—আজকে তোমাকে কয়েকটা দরকারি কথা বলতে ডেকেছি ভাই।

—বলো!

দাদু বললেন— কীভাবে বলব...তুমি কী এসব শোনবার মতো বড় হয়েছ? জানি না। সমু আমাদের আয়টা অনেক কমে যেতে চলেছে। আমি এবার অবসর নেব ভাবছি।

আমি শুনছি চুপচাপ।

দাদু থেমে থেমে বলতে লাগলেন— পালিতসাহেব মারা যাবার আগে একটা উইল করে গেছেন বলে শুনেছিলুম। উনি নিজেই আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলেন। যতদিন চাকরি করব, ততদিন তো ধরো স্যালারি ড্র করবই, তা ছাড়াও... কিছু পার্কস... ধরো টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, গাড়ি উইথ শফার, পেট্রল, বাইরে বেড়াতে যাবার খরচ, বাড়িতে কোনও উৎসব-টুৎসব হলেও উনি আমাকে সওগাত পাঠাতেন। ...ধরো তোমার বাবা-মা'র বিয়েটা বা তোমাদের অন্নপ্রাশন আমি খুব ঘটা করে দিতে পেরেছিলুম... কেন না অনেকগুলো খাতে খরচ পালিতসাহেবই করেছিলেন। কিন্তু কেউ জানে না তোমায় বলছি সমু, উনি আমাকে আমার যোগ্য মাইনে দিতেন না। জমিদারি যাবার পর ওঁরা টাকাপয়সা লাগান কোলিয়ারিতে। চা-বাগানে। লসে চলছিল। আমি আসার পর ওঁরা ফুলে ফেঁপে ওঠেন, বহু স্থাবর সম্পত্তি, ঘোড়া এ সমস্ত আমার উদ্যোগেই হয়েছে। কুর্গ ভ্যালির চা-বাগান আমারই প্ল্যান। তা ছাড়া রেসহর্স। এই সব সম্পত্তির চার ভাগের তিন ভাগই আমার করা। উনি বলতেন গাড়িটা তুমি অবসর নেওয়ার পরও পাবে। ওটা তোমারই। ম্যান্ডেভিলার বাড়িটা তোমায় দিয়ে যাব, কিছু ভাল শেয়ার, পেনশন তো থাকবেই। পালিতসাহেব তো হঠাৎই মারা গেলেন। উইল পড়ে দেখা যাচ্ছে, ওসব কিছুই উনি আমাকে দ্যাননি। শুধু হাজার টাকা পেনশন... ...আমার ধারণা জুনিয়র পালিতেরও কিছু কারসাজি আছে এতে। ও কোনওদিন আমাকে তেমন...। আসলে ওর বাবা আমাকে

বেশি বিশ্বাস করতেন তো! ...এখন কিছুকাল ওর আন্ডারে কাজ করলুম। সুবিধে হচ্ছে না। সংসারের কথা ভেবে... আর বোধহয় চালানো ঠিক হবে না। মানীর মান রাখতে জানে না। কী? ঠিক করছি তো? বয়সও আমার অনেক হল। অন্য চাকরি করলে কবে রিটায়ার করে যেতুম।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যেখানে মান থাকবে না... দাদু এত বৈষয়িক কথা আমাকে বলছেন! আমাকে!

—এগজ্যাক্টলি। যেখানে আমিই হর্তা-কর্তা ছিলুম সেখানে পদে পদে—বিসাইডস ও ছেলেটা ভাল তৈরি হয়নি, বুঝলে? এ সম্পত্তি ও রাখতে পারবে না। তখন খুব কষ্ট পাব, তিল তিল করে গড়া একটা সাম্রাজ্য তো... তবে তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেছি... সে-ও একই কথা বলেছে। সে সব ঠিক আছে। আমার কথাটা হল, স্টেটাস, আয় সবই কমে যাবে। তোমরা এখনও কেউ তৈরি হওনি... তোমাদের ওপর এর প্রভাব অনেকটাই... তোমরা যদি বলো তো আরও কিছুদিন...।

—না, না, দাদু। আমাদের জন্যে... অসম্ভব। তা ছাড়া আমি তো গাড়িও চড়ি না, টেলিফোনও তত ব্যবহার করি না। ছোটবেলায় অবশ্য তোমার সঙ্গে অনেক বেড়িয়েছি।

—জানি। তুমি বললে শুনে ভাল লাগল। তোমার দাদার... কিন্তু মত অন্য রকম।

—অন্য রকম?

—হ্যাঁ, ও খুব ক্ষুব্ধ মনে হল। এম. এসসি ফাইন্যাল ইয়ার ওর, কী করবে না করবে ...আমি যেটা বলছিলুম সমু, তুমি যদি হায়ার সেকেন্ডারিটা পাশ করে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, তা হলে চট করে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি জানি তোমার সাহিত্য-দর্শন এ সবের দিকে ঝোঁক। তাই-ই... একটু...

—কে বললে? না তো! সাহিত্য পড়তে আমার ভাল লাগে। ফিলসফিক্যাল থটস নিয়ে পড়তেও ভাল লাগে...। কিন্তু ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব এঞ্জিনিয়ারিংই পড়তে।

—থ্যাংকিউ, আমার একটা ভাবনা গেল। তোমার দাদা আমাকে কেস করবার কথা বলছিল।

—কীসের কেস!

—ওই যে উইলটা! আমাকে এক রকম বলেছিলেন, আরেক রকম বার হল! কনটেস্ট করতে বলছিল। এ বিষয়ে তোমার কী মত?

—মুখে বলেছিলেন, সেটা উইলে সত্যিই লিখেছিলেন কিনা... শিওর না হয়ে তো... আমি অবশ্য এ সব ব্যাপারে...।

—সেটাও একটা কথা, তা ছাড়া পালিতসাহেব খুব কৃপণও ছিলেন। একটু মীন মাইন্ডেড যাকে বলে। কাজ করিয়ে নিয়ে পরে হাঁকিয়ে দেওয়া ওর চরিত্রে ছিল। আনপ্রেডিক্টেবল। আমার উচিত ছিল সোঁদা কথায় না ভিজে স্যালারিটা বাড়িয়ে নেওয়া। লোকের জন্য এত বিষয়সম্পত্তি করলুম অথচ নিজের বেলায়... ঠকে... ঠকেই তো গেলুম। ইমপ্র্যাকটিক্যাল!

দাদু মাথা নিচু করে বসে রইলেন। এরকম পরাজিত রূপ তাঁর কখনও দেখিনি। এভাবে নিজের কর্মক্ষেত্র, বিষয়সম্পত্তি, মালিকের সম্পর্কে কথা তাঁকে বলতেও শুনিনি। অদ্ভুত মানুষ, আমাদের কাছেও উনি এক রকম জবাবদিহি করছেন, পরামর্শ চাইছেন।

আমার দাদুর জন্য কেমন কষ্ট হল। কেমন একটা ধূসর কষ্ট। তীক্ষ্ণ নয়। সমস্ত মনটাতে যেন শীতের সন্ধে নামল। ইনি এত সচ্ছল ছিলেন যে এঁর ছেলে রাজকুমার আখ্যা পায়। ইনি গাড়ি চড়ে চলাফেরা করতেন। সাহেব-সুবোর মতো ধরনধারণ। এখন কী অপমানজনক ভাবে ইনি বঞ্চিত হয়েছেন। ঠকে গেছেন। দাদুর সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখ যে অনেকটাই গাঁটছড়া বাঁধা ছিল সেদিনই স্পষ্ট বুঝেছিলুম। এবং হয়তো সেই দিন থেকেই আমরা প্রকৃত বন্ধু হলুম। সতেরো আর সাতাত্তর।

## ২

রাত আর বেশি নেই। আকাশ ময়লাটে, ঘোলাটে, হঠাৎ কদিন একটু বৃষ্টিবাদলও হচ্ছে। সময়টা বর্ষাই। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। উঠোনের পেয়ারা গাছ, পাশের বাড়ির মিনারের মতো চিলেকুঠুরির ওপর ফ্ল্যাগ-স্টাফ। দু তিন বাড়ির মাঝখানে লেবু, বেল, নিম গাছ। এই জায়গাগুলো সবই পাখিদের আর প্রজাপতিদের প্রিয়। এখন ওই পাশের বাড়ির ফ্ল্যাগ-স্টাফের ওপর বসে ছোট্ট কালো পাখি শিস দিচ্ছে। দোয়েল বোধহয়। অনেকক্ষণ ধরে শিস দিচ্ছে দোয়েলটা। আমিও শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে শুনছি। আমার প্রিয় পাখি কাক একটা জানলার পাটে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে ডাকল ক্বঃ। একদম সকালে ওদের গলা কী রকম আধো আধো থাকে। বাচ্চার মতো। বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া ঢুকল এক ঝলক। আমার মনে হল ঠিক এই রকম দোয়েল এবং কাক, এই রকম ভেজা হাওয়া, ঠিক এই রকম ভোরের বিছানা আমার জীবনে আরও আরও অনেক বার এসেছে। ভোরের একটা কী রকম স্পর্শ তো থাকেই, কীরকম একটা গন্ধও। সেই গন্ধটা পাবার জন্য আমি বুক ভরে প্রশ্বাস নিই। ঠিক এই রকম কোথায়? কবে? এবং এই অনুভূতিটাও যে আমার এরকম আগেও হয়েছিল, কোথায়? কবে? ঠিক এই রকম। এ ঠিক গতানুগতিক মনে হওয়া নয়।

আজ থেকে আমি হস্টেলে চলে যাচ্ছি। কাল থেকেই মায়ের মুখ একটু শুকনো হয়ে আছে। ফিনকি কান্নাকাটি করছে। দাদা গত মাসেই অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেল। দাদু বলছিলেন— দিল্লির খরচ-খরচা বেশি বউমা। আজ ও হস্টেলে জায়গা পেয়েছে। হয়তো চিরকাল পাবে না, তারপর...ধরো চোখের আড়ালে চলে গেল, মানসিকতার পরিবর্তন হবে। তুমি ওর থেকে বেশি কিছু আশা কোরো না।

মা ম্লানমুখে বললেন—সে যদি বলেন বাবা, আমি আপনি ছাড়া কারও কাছেই কিছু আশা করি না।

ঠিক এই সময়টাতেই আমি ঢুকলুম।

—মা আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছি। কালো প্যান্টটা কোথায় বলতে পার?

—ওটা ডাইংক্লিনিংএ দিয়েছি। পরের বার এসে নিয়ে যেয়ো। আর কী কী দরকার মনে করো। শেষে...

দাদু বললেন—একটা লিস্ট করেছ কী? বইপত্তর, জামাকাপড়, মিসেলেনিয়াস?

—করেছি। তবে আমি তো সব জিনিস একসঙ্গে নিয়ে যাব না। যদি দেখি ওখানে কাপড়-জামা কাচতে বেশি খরচ, কি বেশি সময় লাগছে, তো সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়িতে দিয়ে যাব।

মা একটু উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, প্রতি সপ্তাহে আসতে পারবে তো?

—পারতেই হবে। ফিনকিকে কথা দিয়েছি, রবিবার রবিবার ওকে পড়িয়ে দেব। আর দু' বছর পরেই তো...

আমি ফিনকির কথাটাই বললুম। কিন্তু আসলে আমি পুরো বাড়িটার কথাই ভাবছিলুম। দাদুর কথা, মায়ের কথা। যদিও তার কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আমাদের পরিবারের সবাই-ই খুব শান্ত এবং চাপা, বাবা আর ফিনকি ছাড়া। বাবা অনর্গল কথা বলেন, অনর্গল রাগারাগি করেন, সামান্য কারণেই চেঁচামেচি, পাঁচজনের মুণ্ডপাত। আর ফিনকি সর্বক্ষণ কলকল করে। কোথায় ওর নতুন বন্ধু অদ্ভুত নামের প্রিসিলা। সে নাকি একেবারে মেমসাহেব, একমাত্র মনীষা অর্থাৎ আমাদের ফিনকিকে ছাড়া কাউকে পাত্তা দেয় না। ওদের প্রিন্সিপ্যাল কত রাগী, বাংলার টিচার বানান ভুল করেন। হিস্ট্রির টিচারকে ওরা কত ভালবাসে, পড়ান মোটামুটি কিন্তু চমৎকার চমৎকার শাড়ি পরেন, খুব গ্ল্যামার। গ্ল্যামারই, ঠিক সুন্দর নয়। সে যদি বলো সায়েন্সের বল্লী নায়ার খুব মিষ্টি। কালোর ওপর এত সুন্দর যে...।

এত কথা, প্রতিদিনের খুঁটিনাটি, তা ছাড়া মনের কথা প্রাণের কথা ফিনকি মোটের ওপর সবাইকেই বলে। দাদু থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত। দাদাকে ও একগাদা ফরমাশ করেছে। গালার চুড়িবালা, সালোয়ার কামিজ এবং দিল্লির চটি।

দাদা ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হেসে বলেছিল—মনে হচ্ছে আমার কলেজের পাশেই তোর গালা না ফালার দোকান, চটিগুলো বোধহয় গেটের কাছেই ফুটপাথে বসে।

—ওসব জানি না—মাথা ঝাঁকিয়েছিল ফিনকি—আমি কাগজের ওপর আমার পায়ের মাপ ভাল্লো করে এঁকে দিয়েছি। চটি ভীষণ সস্তা ওখানে, লাল সবুজ সব রকম দেখে এনো ঠিক।

দাদার দিল্লি যাওয়াটা ওর কাছে বেশ একটা আনন্দের ব্যাপার। দিল্লি একটা সব পেয়েছির দেশ— ওর কাছে। সে সব সরবরাহ করবার জন্যেই দাদা যাচ্ছে, চাকরি-টাকরি গৌণ। কিন্তু আমি হস্টেলে যাচ্ছি শুনে ওর ঠোঁট ফুলতে লাগল।

—তুই না দেখলে আমি পাশ করব কী করে?

বাড়িতে একমাত্র ফিনকির সঙ্গেই আমি অনেক সময় কাটাই। সব বিষয়ে পড়াশোনার জন্য ও আমার ওপর নির্ভর করে। ওকে আর মাকে আমিই আত্মীয় বাড়ি, সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে যাই।

বলি—এই তো এইখানে শিবপুর, প্রতি সপ্তাহে আসব, ভাবনা কী?

—ঠিক আসবি তো?

—ঠিক। না হলে তুই পাশ করবি কী করে?—দুজনেই হাসি।

এই রকম একটা ভূমিকা তৈরি হয় আমার হস্টেল-যাত্রাকে ঘিরে। বড় একটা স্যুটকেস মা দিয়েছেন। বোধহয় মায়ের বিয়ের সময়কার। ভাল চামড়ার। ভেতরে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় থেকে যে বইগুলো আপাতত কিনতে পেরেছি সেগুলো, দাদুর দেওয়া ডায়েরিটা পর্যন্ত সবই আছে। মা গুছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি জানি মায়ের বহু কাজ, সময় বার করা খুব শক্ত। ফিনকি একটু আধটু সাহায্য করেছে। ব্যাস।

কিন্তু মা ও কথাটা বললেন কেন?— তা যদি বলেন বাবা, আমি আপনাকে ছাড়া কারও কাছেই কিছু আশা করি না।

এই প্রথম বাড়ির কারও কথা আমার মনে ঢেউ তুলল। সত্যিই, মায়ের কথা আমরা কে কতটুকু ভাবি? দাদা আর আমি নিজেদের নিয়ে থাকি। বাবাও এক রকমের তাই। আমরা নিঃশব্দ বাবা সশব্দ

এইটুকু তফাত। আদুরে বোনটাও মায়ের চেয়ে বাবার কাছেই ঘেঁষে বেশি। বাকি তো থেকে যাচ্ছেন দাদুই। দিদারা দুই বৃদ্ধা, জপতপ, পুজো-অর্চনা নিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রয়োজনগুলো মাকেই মেটাতে হয়। মটকার কাপড় পরে পুজোর জোগাড় করে দেওয়া, নিরামিষ রান্না উনুন পেড়ে করে দেওয়া। আমাদের রাঁধুনি মেয়েটি বামুন নয়। তার হাতে ওঁরা খান না। আমাদের এমনিতেই তিন চার রকম রান্না হয়, দিদারা পুরো নিরামিষ, দাদুর হাই ব্লাডপ্রেশার, নুন চলে না, বাবা মশলাদার রান্না ছাড়া খেতে পারেন না, আমরা তিন ভাই বোন মোটামুটি অল্প মশলা পছন্দ করি, কিন্তু কেউ এ ডাল খায় না, কেউ ও ডাল খায় না, কারও কাঠি আলুভাজা চাই, কারও গোল, মায়ের ঠিক কী পছন্দ, শেষ পর্যন্ত মা কী খান, জানি না। জানবার কথা আগে মনেও হয়নি। ইদানীং দাদু নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা আলোচনা করার পর থেকে একটু-আধটু লক্ষ করি। তারপর থেকে আমি রাত্তিরে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। বাজার আমিই করি। মা মাংস আনতে বললেও একদিনের বেশি আনতুম না। বলতুম—যাঃ ভুলে গেছি। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন মাংস না হলে বাবা বড্ড চ্যাঁচামেচি করতেন। বকুনিটা খেতেন মা। সেদিন অমনই চুপচাপ বকুনি খাচ্ছিলেন। আমি নীচে নেমে গেলুম। খাবার ঘরে ঢুকে বললুম— মা আনতে বলেছিলেন, আমিই ভুলে গেছি। একটু চুপ করে বললুম, জিনিসপত্রের দাম খুব। ওই টাকায় কুলোতে পারি না। আমি চাকরি করি, তখন তোমাকে রোজ মাংস খাওয়াবো...।

বাবা আমার ইঙ্গিতগুলো বুঝেছিলেন মনে হয়। চুপ করে গেলেন। বাবা বোধহয় আমাদের অর্থাৎ দাদাকে ও আমাকে কিঞ্চিৎ ভয় করতেও শুরু করেছিলেন। আমরা তাঁকে যতটা, তিনি আমাদের তারও বেশি।

মা ইদানীং খুব রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন। আমার কেমন মনে হচ্ছিল আমাদের ঠিক আগের মতো খাওয়াতে গিয়ে মা নিজের খাওয়া-দাওয়া কমাচ্ছেন। এমনিতেও তেমন যত্ন-আত্তি করতেন না। নিজেকে নিজে যত্ন করতে মায়েরা চিরকাল লজ্জা পেয়ে এসেছেন। তখন

পরীক্ষা শেষের ছুটি চলছিল, একদিন দুপুরে সন্তর্পণে নীচে নেমে গেলুম, খাবার ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি মা এক থালা ভাত খাচ্ছেন, সুদ্ধু ভাত, একটু গলা-গলা, দুটো কাঁচা লঙ্কা, দুটো পেঁয়াজ, একটু কাঁচা সর্ষের তেল ঢেলে নিলেন।

আমাকে মা দেখতে পাননি। চুপচাপ ওপরে চলে এলুম। পর দিন খাবার সময়ে বললুম—মা, আমার একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে করছে, দেবে? মা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, মুখটাতে কালি নামছে, ছেলে কী চাইছে, তিনি দিতে পারবেন কি না। আমি বললুম— দুটো কাঁচা লঙ্কা, দুটো কাঁচা পেঁয়াজ যদি থাকে, আর একটু কাঁচা সর্ষের তেল।

মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না যে আমি মাকে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বকাবকি করি বা মা তা নিয়ে আর কিছু বলেন।—যা দিচ্ছি এখন খাও তো! পাকামি করতে হবে না-গোছের। মাছ খাওয়াও আমি ছেড়ে দিলুম। বললুম— ওয়াক ওঠে।

এরপর দাদু একদিন খাওয়ার পরে ডাকলেন— সমু। তুমি আজকাল মাছ খাচ্ছ না। ওয়াক ওঠে তোমার মা বলছিলেন। এ তো মুশকিলের কথা, ডাক্তার দেখাতে হয়, জনডিস-টিস হল না কি? তুমি না কি সর্ষের তেল দিয়ে ভাত মেখে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে খাচ্ছ!

আমি বললুম— গরিব লোকেরা তো এ রকমই খায় দাদু।

দাদু বললেন— তুমি অনর্থক আমার অবস্থাটাকে বড্ড বেশি খারাপ মনে করছ ভাই, এতটা দরিদ্র হইনি যে তোমাকে পেঁয়াজ লংকা দিয়ে ভাত খেতে হবে। ওসব কথা তোমাকে বলা বোধহয় আমার ঠিক হয়নি।

আমি বললুম— মা'র রেগুলার এই-ই ডায়েট আজকাল, যতদিন মা খাবেন আমিও ওই-ই খাব। আমার কোনও অসুবিধে নেই।

দাদুর মাথা ঝুঁলে গেল। কোনও কারণে খুব দুঃখ পেলে, লজ্জা পেলে দাদুর এটাই ছিল ভঙ্গি।

আমি বারবার ফেল করছি— উনি বললেন— তোমার মা সারাদিন শরীর পাত করে আমাদের সেবা করছেন। আমি ওঁর কোনও খোঁজ রাখিনি, ছিঃ! তুমি আমায় মাফ করো সমু।

মাকে উনি কী বলেছিলেন জানি না, পরদিন মা দুপুর দুটোর সময়ে আমাকে ডাকলেন। নীচে নামতে বললেন— কী খাচ্ছি দেখে যাও সমু। এই দ্যাখো আমার ডাল, মাছ, তরকারি। আশা করি কাল থেকে আর আমায় জ্বালাবে না।

—আমি তো রোজ রোজ ইন্‌স্‌পেকশনে আসতে পারব না!

—আচ্ছা, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

—আশা করি, তোমার মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বললেন— না।

—মা আমি কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করছি।

৩

বাড়ির জীবন নিস্তরঙ্গ নিরাপদ। হস্টেল যে তা হয় না, হতে পারে না সেখানে যে প্রতিপদে বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হবে এ সব কথা আমি ভাবিনি। জানতুমই না। পুলু একবার যেন বলেছিল, আমি খেয়াল করিনি। বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আসবার পরের দিনই সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের কিছু দাদা আমাকে ডেকে পাঠাল। কী নাকি ভীষণ দরকার আছে।

কথাবার্তা হল খুব অদ্ভুত। ওদের প্রশ্ন আর আমার উত্তর। কোনওটার জন্যেই আমি প্রস্তুত ছিলুম না।

—এই তোর ফ্যামিলি স্ট্রাকচার কী রে?

—যেমন হয়। মা-বাবা-ভাই-বোন-দাদু-ঠাকুমা-দাদা-বউদি-ভাইপো-ভাইঝি-মেজদা-মেজবউদি-সেজদা-সেজবউদি-জ্যাঠা-জেঠি-কাকা-কাকিমা-জেঠতুতো-ভাই-বোন-দাদা-বউদি-খুড়তুতো।

—মারব এক থাবড়া, ইয়ার্কি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? তোর জ্ঞাতিগুষ্টির কথা কে জানতে চেয়েছে? তুই যে বাড়িতে থাকিস সেইখানে।

আমি অবাক হয়ে বলি— সেই বাড়ির কথাই তো বলছি!

—এত বড় জয়েন্ট ফ্যামিলি তোদের?

—ইয়েস।

—তোরা কটা ভাই কটা বোন?

—বড়দা-মেজদা-সেজদা-ন'দা-ক'নেদা-নতুনদা-রাঙাদা-ফুলদা...

—বাস বাস বুঝতে পেরেছি। এতগুলো কি তোর নিজের মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছে?

—কেউ কেউ জেঠিমা কাকিমাদেরও, তবে আমরা এইভাবেই নিজেদের কাউন্ট করি।

—বোন ক'টা, সাফ বলবি?

—এই অচিন্ত্য এক্ষুনি নামতা পড়বে রে। অন্য কোয়েশ্চন কর?

—সবচেয়ে সুন্দর বোন কোনটা!

—আমার নিজের ছোট বোন।

—চিয়ার্স চিয়ার্স হিপ হিপ হুররে। বোনটার সঙ্গে শুতে দিবি? ক'জনের সঙ্গে দিবি সেটাও ঠিক করে নে, রাইট?

—গ্ল্যাডলি। হিসি করবে, কাঁথা পাল্টাতে যতজন থাকে ততই ভাল, একজনের ওপর চাপটা বেশি পড়ে যাবে।

—রাম রাম, কত বয়স তোর বোনটার?

—মাস পাঁচেক হবে।

—বাপ রে, দাদা এঞ্জিনিয়ার হতে এয়েছে। বোন পাঁচ মাস? তোর বাবা-মা তো এখনও দিব্যি চালু রে! বয়স কত তোর মায়ের?

—মা? ...আমি চোখ কপালে তুলে একটু ভাবি— ঠিকঠাক বলতে পারছি কিনা জানি না। চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে বোধহয়।

—ইয়ার্কি পেয়েছিস? মাত্র সতেরো বছরের বড় তোর থেকে?

নিষ্পাপ মুখ করে আমি বলি— কেন, সতেরো বছরে বুঝি ছেলে হয় না?

অ্যাকশন— আড়াল থেকে কে বলল।

অমনি আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল ক'জন। তারপর কয়েকবার দুলিয়ে ছুড়ে দিল। আর কয়েকজন আমাকে লুফে নিল।

মাথাটা ঝুলে পড়ল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। মুখটা অল্প হাঁ, আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়ছে।

পুলুর গলা শুনতে পেলুম— সর্বনাশ। ওর যে হার্টের একটু গোল.. আছে। শিগগির ডাক্তার ডাকুন।

—এই খবর্দার। ঢপ অনেক দেখেছি, হেল্‌থ এগজামিন হয়নি? হার্টের গোল! এই কাতুকুতু দে তো রে!

যে কোনও কারণেই হোক, আমার কাতুকুতু লাগে না। মাথা একদিকে নেতিয়ে গেছে। চার হাত পা ছেতরে মড়ার মতো পড়ে আছি।

—জল ঢাল মাথায় জল ঢাল।

পুলু বলল সাবধানে ঢালবেন। নাকে মুখে ঢুকে গেলে চোক করে যাবে। দাঁড়ান আমি দেখছি—সমুদ্র, এই সমুদ্র। চোখ মেলে দ্যাখ আমি পুলু রে। আর আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের দাদারা। —সারা মাথা ভিজে, শার্টের ভেতর দিয়ে জল গলে যাচ্ছে, আমি বেশ পাঁচ মিনিট পরে চোখ একটু খুলি....

—আরেকটু হলে খুনের দায়ে পড়ে যাচ্ছিলেন ইশ্‌শ্‌... পুলু বলল,— আমাকে যা করার কালকে করবেন। আজ ওকে নার্স করতে হবে। একজন কেউ কাইন্ডলি ডাক্তার ডেকে আনুন।

—এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাব! মালকে ঘরে নিয়ে যা।

কয়েকজন কাঁধে পিঠে করে আমাকে বয়ে নিয়ে গেল। পুলু জামা-কাপড় পাল্টে দিল, পাজামা সুদ্ধু।

ঘর নিশ্চয় ফাঁকা হয়ে গেছে। কেন না পুলু বলল— এই সমু এবার চোখ খোল। তুই যে এত ভাল অ্যাক্টিং করতে পারিস আমি জানতুম না।

কথাগুলো ক্ষীণভাবে আমার কানে এল। যেমন আরও কিছু-কিছু কথাও আমি শুনতে পেয়েছিলুম। আমি কিন্তু সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। একটা ঝাঁকুনি, তারপরে আর কিছু মনে নেই। অন্ধকার। একটা বিশাল পরিত্যক্ত বাড়ি। ঘরদোর হাঁ হাঁ করছে। অন্ধকারের মধ্যে থেকে কয়েকটা দূরবর্তী স্বর, তারপরে জল থাবড়া পড়তে

আস্তে আস্তে আবার ঘরটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। দূরে জানলা, বাইরে অন্ধকার, গাছপালার মধ্যে দিয়ে একফালি চাঁদের আধখানা। চতুর্দিকে ঝিঝি ডাকছে। খুব আর্তস্বরে কে কী বলছে, কারা কী সব বলছে, আর্ত গলা, কড়া গলা, আর্ত, কড়া, কড়া, আর্ত।

—তুই কথা বলতে পারছিস না কেন? কী রে সমু?

—আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম পুলু— আমি খুব কষ্ট করে বলি।

—বলিস কী রে! কাল সকাল হলেই দাদুকে ফোন করব। কী কাণ্ড!

আমি বলি— সকালের কথা পরে। এখন শোন চুপ করে। কিছুক্ষণ চুপ করে শুনল পুলু। তারপর বলল— কী শুনব, কিছু তো শুনতে পাচ্ছি না!

—অনেক গলা, কাঁদছে, অনুনয় করছে, অন্য পক্ষ ধমক দিচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে, কত কত দিন এই ঘরে কত ছেলেদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, ঘরটা সব রেকর্ড করে রেখেছে।

—তুই একটা পাগল!

আমি হাসি। দেখাই যাচ্ছে আমার শোনা সবাই শুনতে পায় না, আমার দেখা সবাই দেখতে পায় না। সুতরাং আমি পাগল। আমি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙতে দেখি ঘর রোদে ভেসে যাচ্ছে, সুপার দাঁড়িয়ে, তাঁর পাশে স্টেথো হাতে ডাক্তার। বললেন— নিশ্বাস নাও জোরে জোরে।

পরীক্ষা শেষ হলে বললেন— এর কয়েকটা পরীক্ষা করাতে হবে। আমি লিখে দিচ্ছি। তোমার আগে কখনও এমন হয়েছে?

আমি মাথা নাড়ি। না।

—স্বাস্থ্য তো চমৎকার।

আমি চেয়ে আছি।

উনি বললেন— এর বাড়িতে খবর দিন। ইনভেস্টিগেশনগুলো করিয়ে নিতে হবে।

আমি এবার আস্তে বলি— বাড়িতে খবর দেবেন না। ওঁদের ডিস্টার্ব করার দরকার নেই।

—তার মানে? বিনা চিকিৎসায়...?

—হ্যাঁ। আমার তাতে কোনও অসুবিধে নেই। অচিন্ত্যদা, সুব্রতদাদের জন্যে যখন হয়েছে... হস্টেলের ঘরে, তখন হস্টেলেরই দায়িত্ব...। আমার বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। এসব ঝামেলা পোয়াবার ক্ষমতা নেই।

সুপার বললেন— এগুলো তো আমাদের করবার কথা নয়। এমার্জেন্সি হলে আলাদা কথা।

—মানুষ ছোড়াছুড়িটা তা হলে আপনাদের করবার কথা, কিন্তু তার ফলগুলোর দায়িত্ব নেবার কথা নয়। আমি ক্ষীণ গলায়, কোনও রাগ ছাড়া শান্ত ভাবে বলি।

ডাক্তার বললেন— সিচ্যুয়েশন এ রকম হলে আমি আপনাদের হায়ার অথরিটিকে জানাব। তাতেও কাজ না হলে পুলিশ। ইন এনি কেস— এ ছেলেটির যদি কোনও ইনজুরি হয়ে থাকে, তাতেও প্রসিডিওরটা একই থেকে যাচ্ছে। এর বাড়িতে জানালেও...

সুপার বললেন— তোমরা সবাই চাঁদা তুলে ফেলো, দ্যাখা যাক কী হয়। সুব্রত অধিকারীর চোখে ভয়ের ছায়া দেখে আমি আবার চোখ বুজলুম।

নিজের সম্পর্কে এই কথাগুলো আমার জানা ছিল না। সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আমার মন যে আপনাআপনি এরকম একটা নীতি ঠিক করে নিতে পারে, শরীর তাতে সাহায্যও করে,—এটা নতুন খবর। খবরটাকে আমি শান্ত ভাবে হজম করি। পুলু অনেকবার বলে তোর বাড়িতে জানাই। আমি না করি। একজন বৃদ্ধ, একজন ভিতু, আর একজন অনুপস্থিত, এই তো আমার বাড়ির সত্যিকার স্ট্রাকচার। নিজেই যতটা পারি নিজেকে দেখব। চিরকালই সম্ভবত এমনটাই করে এসেছি। এখনও না করার কোনও কারণ নেই।

ইনভেস্টিগেশনে অবশ্য তেমন কিছু বার হল না। স্নায়বিক

ব্যাপার— ডাক্তার বললেন। নিউরোলজিস্ট দেখাতে বললেন। আমার নিউরোলজিস্ট দেখাবার সময় নেই।

সুব্রতদা বলল— দেখিয়ে নে সমু, আমরা টাকা দিচ্ছি। সত্যি যদি কোনও গণ্ডগোল হয়ে যায় তা হলে বাড়ির লোকেদের জানা দরকার।

আমি রাজি হইনি।

সত্যি কথা বলতে কি সুব্রত অ্যান্ড কোং যখন আমাকে অকথ্য অশ্লীল কথাগুলো বলছিল, আমার কিচ্ছু মনে হয়নি। কথার পিঠে শুধু কথা সাজিয়ে দিয়েছিলুম। মিথ্যার পিঠে মিথ্যা। শারীরিক আক্রমণটা যতটা লেগেছিল মানসিক আক্রমণটা তার দশ শতাংশও না। অথচ এসব কথা আমি কখনও শুনিনি। আর হস্টেলে আসবার আগে কেউ আমাকে সাবধানও করেনি। কিন্তু আমার অসুবিধে হয়নি। কার কথা ওরা বলছে— মা, বাবা, ভাই, বোন... কতগুলো শব্দ শুধু। তার পেছনে যদি অনুভূতি ও আবেগ থাকে তা হলেই শব্দগুলো অর্থপূর্ণ। নাহলে তো নয়। সুব্রতদাদের মুখে ওই শব্দগুলো শুধু শব্দই ছিল। প্রাণহীন অর্থহীন শব্দ। পরে যখন পুলু বলল— 'সমু তোর রাগ হয়নি? আমাকে ও রকম বললে আমি তো লাফিয়ে পড়ে ওদের আঁচড়ে কামড়ে দিতুম...' আমি বললুম— না রে কিচ্ছু মনে হল না। যে মুহূর্তে ওরা দল বেঁধে ঘরে ঢুকল আমার মনে হল একদল ছায়া মানুষ ঢুকল, যারা কিছু না কিছু অত্যাচার করে যাবে, আমার লাগবে না, কেন না সবটারই ভিত্তি মিথ্যে। মিথ্যেটাকে মিথ্যে দিয়ে আটকাতে তাই আমার অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু মনটা আমার আয়ত্তে হলেও শরীরটা তো নয়। ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যখন আমাকে ছুড়ে দেওয়া হল তখন একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, একটা মারাত্মক স্নায়বিক ভয়। এক্ষুনি মাটির ওপর আছড়ে পড়ব। থেঁতলে যাব। শরীরটা কুঁকড়ে ঠান্ডা হয়ে গেল, কালঘাম ছুটতে লাগল, বেগতিক বুঝে সেই কটা মুহূর্তের জন্যে শরীরটা মরে গেল। ওটা শরীরের নিজস্ব ডিফেন্স মেকানিজ্‌ম্‌।

পুলক বলল— কিন্তু তুই তো পুরো অজ্ঞানও হোসনি। আমাদের কথাগুলো তো শুনতে পাচ্ছিলি!

—হ্যাঁ, কিন্তু কেমন যেন অনেকে দূর থেকে। খুব হালকা গলা, যেন অনেক কুয়াশা ভেদ করে আসছে দু'চার ছিটে রোদের কণা। তবে সেটা ঠিক কী, কেন ও রকম হল পুলু আমি বলতে পারব না। আমি তো ডাক্তার নই। তা ছাড়া ধর মৃত্যুর সময়ে কী হয়? চারপাশের কান্না, হাহাকার তো এমনই দূর থেকে চেতনায় এসে পৌঁছয়, তাই না?

—মৃত্যুর সময়ে কী হয় আমি কী করে জানব? পুলক অবাক হয়ে বলল, তুই-ই বা কী করে শিওর হচ্ছিস যে ও রকমই হয়?

—জানি না, কেমন মনে হল।

—তুই একটা কিম্ভূত।

পুলু বা পুলক আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। পাড়ার বন্ধু, স্কুলের আবার ক্লাবেরও বন্ধু। একদম ছোট্ট থেকে যেহেতু দু'জনে সর্বত্র একসঙ্গে একই জায়গায় যাওয়া আসা করেছি সেইজন্যেই প্রধানত ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা। ও যে আমাকে সব সময়ে বোঝে তা না। কিন্তু কখনও আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করে না, বিশেষত অন্য কারও সামনে। কেমন একটা টানও ওর আছে আমার ওপর।

বয়-স্কাউটের দলে সেবার আমরা জাম্বোরিতে গেছি গিরিডি। দিন সাতেকের ক্যাম্প। খাণ্ডোলি পাহাড়ের কাছাকাছি ক্যাম্প পড়েছে। একটু দূরে তিরতির করে বইছে উশ্রী নদী। খুব সরু, জল কম। সন্ধেবেলায় ক্যাম্প ফায়ার ঘিরে প্রতিদিনই আমাদের নানা রকম আনন্দ অনুষ্ঠান হত। গান হচ্ছে আবৃত্তি হচ্ছে। সুকুমার ছিল হরবোলা। পশুপাখির ডাক তো নকল করতে পারতই। নানান মানুষের গলা অবিকল তুলে নিতে পারত নিজের গলায়। আমাদের, স্কাউট মাস্টারদের— সবার।

*সেদিন ওই রকম অনুষ্ঠান হচ্ছে। কেউ করছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কেউ* নজরুল, বেশ গরম গরম কবিতাও আবৃত্তি হচ্ছে। সুকান্ত, নজরুল। হঠাৎ আধো-অন্ধকার থেকে শম্ভুদার গলা এসে আমাকে বিঁধল—

সকলেই কিছু না কিছু করছে, তুই কেন চুপ করে বসে আছিস সমুদ্র? কিছু বল! কর!

আমি কিছুই পারি না। অন্যরা যেটা করে আমার ভাল লাগে।

গানের সুরটা জানা থাকলে বা কবিতাটা মুখস্থ থাকলে গলা মেলাবার চেষ্টা করি। কিন্তু নিজে না পারি সে ভাবে গান করতে, কবিতা-টবিতা আওড়াতে, কমিক-টমিক তো আমার একেবারেই আসে না। এ-ও জানি এখানে সবাই কিছু না কিছু করতে বাধ্য। না করলে পুরো মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়াও 'আমি কিছু জানি না পারব না' এ সব বলাও আমার কেমন ন্যাকামি মনে হত।

বিনা ভূমিকায় ছাই-পাঁশ যা মনে হল বলে গেলুম অতএব— দেখ স্কাউট ভাইরা, মালদা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, শিলিগুড়ি, কলকাতা, হুগলি, নদিয়া আরও কত জায়গা থেকে আমরা এখানে এসে মিলেছি। আমাদের জীবনযাত্রা, পরিবার, ভাল-লাগার জিনিস, আলাদা আলাদা। দক্ষতাও সব বিষয়ে সবাইকার একরকমের নয়। কিন্তু এক জায়গায় আমরা সবাই এক। এই জাম্বোরিতে। একদিকে দেখ ওই ঝিরঝিরে নদী, আর একদিকে পাহাড় দিয়ে আমরা ঘেরা। নদী যদি শুরু হয় তো পাহাড় দাঁড়ি। মাঝের ফাঁকটায় ক্যাম্প পড়েছে আমাদের; আগুন জ্বেলেছি, হাত-পা সেঁকে নিচ্ছি শীতের রাতে, গ্রীষ্মে ওই নদীর জল যত কমই হোক ঝাঁপিয়ে স্নান করব। আমাদের সারা জীবনের যা কিছু জানা বোঝা সব আমরা অন্যদের কাছে উজাড় করে দিচ্ছি। এর পর আগুন নিবে যাবে, জাম্বোরি শেষ। সব গান কবিতা, অভিনয় সব রকমের খেলাধুলো, একসঙ্গে কাজ-কর্মের দিন, বক্তৃতা, নির্দেশ ডুবে যাবে, জেগে থাকবে শুধু পাহাড়। এসো আমরা পাহাড়ের কথা ভাবি।

কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর সুকুমার চেঁচিয়ে উঠল— জল ঢেলে দিলি সমুদ্র। একেবারে বালতি বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিলি। তোকে কিছু করতে বলাই আমার ভুল হয়েছে। ধুস্।

তখন বুঝতে পারলুম শম্ভুদার গলা নকল করে সুকুমারই ফরমাশটা আমাকে করেছিল। শম্ভুদা ওখানে নেই-ই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা অন্য কেউ কোনও শব্দ উচ্চারণ করল না। আমরাই তখন সবচেয়ে সিনিয়র। আমাদের থেকে ছোটও অনেক ছিল। কেউ কিছু বলল না।

শুধু পুলু বলে উঠল— যার যা মনে হয়েছে করেছে, বলেছে, সমুকে বলতে বলেছিলি ও ওর মতো বলেছে। সুকুমার তুই যা করছিস সেটা ক্যাম্পের স্পিরিট নয়। চুপ করে যা।

আমিই ছিলুম শেষ বক্তা। তখনও আগুন জ্বলছে। ছোট ছোট শিখা মাঝে মাঝে হুস করে জ্বলে উঠছে। তলায় কাঠগুলোর ধিকি ধিকি দেখা যাচ্ছে, একটা ঠান্ডা হাওয়া উঠল, শিরশির করছে গা, সেই নিবন্ত আগুন মাঝখানে নিয়ে আমরা বসে আছি সব্বাই সুকুমার সুদ্ধু। যতই রাত বাড়ছে অন্ধকার আকাশের পটে আরও জমাট অন্ধকার হয়ে ফুটে উঠছে ধূম্র পাহাড়। কতক্ষণ বসেছিলুম কে জানে, শম্ভুদা বিপ্লবদারা এসে ডাকলেন। 'খাবার রেডি। দেখি আজ কে ক'টা রুটি খেতে পারিস।' আসলে অন্যান্য দিন রান্না ওঁদের সাহায্য নিয়ে আমরাই করতুম। আজকে ওঁরা করেছেন।

আমাদের চুপচাপ দেখে বিপ্লবদা বললেন— 'কী রে তোরা কি মেডিটেশন করছিস?' প্রসঙ্গত, ধ্যানও আমাদের ক্যাম্প-জীবনের একটা প্রাত্যহিক করণীয় ছিল। তবে বিপ্লবদা ক্যাম্প-জীবনে বৈচিত্র্য আনতে পুরো রুটিনটাকে একেক দিন ওলোটপালোট করে দিতেন। ধ্যান যে কখন হবে তা কেউ বলতে পারত না। একদিন সকালবেলা আমরা অনেকে মিলে ডিমসেদ্ধ, পাউরুটি টোস্ট করলুম। কয়েকজন মাখন লাগাল, কয়েকজন চা তৈরি করল। কয়েকটা শালপাতার থালায় খাবারগুলো রাখা হল রোজকার মতো, মাটির ভাঁড়ে চা, কয়েকজন মিলে একসঙ্গে গোল হয়ে বসা একটা থালায় দিস্তে দিস্তে টোস্ট, আরেকটাতে ডিম, এরকম অন্তত দশটা দল তো থাকতই।

খাওয়া শেষ? বিপ্লবদা আধঘণ্টা সময় দিয়ে হাঁকলেন— ব্যস হাত মুখ ধুয়ে সমবেত হও বৎসগণ।

আমরা এঁটো শালপাতা মাটির ভাঁড় জড়ো করে ফিরে এলুম। বিপ্লবদা বললেন— মেডিটেশন, গেট সেট গো...।

ব্যস সব্বাইকে যে যেখানে আছে পদ্মাসনে বসে পড়তে হবে। তারপর ধ্যান। চোখ বুজে। বিপ্লবদা স্টপওয়াচ দেখে ঠিক দশ মিনিট পরে মিলিটারি গলায় বলবেন— ওভার।

এইরকম।

সে রাতে কি তারা-জ্বলা, নিচাঁদ আকাশের তলায় পাহাড়ের নিশ্চলতা গাম্ভীর্য, অবশ্যম্ভাবিতা... প্রাকৃতিক বস্তুর এবং মৃত্যুর... আমরা সবাই-ই কিছুক্ষণের জন্যে অনুভব করেছিলুম? তাতে আমার উল্টোপাল্টা কথাগুলোর কি সত্যি কোনও ভূমিকা ছিল?

টেন্টগুলো ছিল ছোট ছোট। বদলে বদলে থাকতে হত আমাদের, যাতে সবাই সবাইকার সঙ্গে থাকার সুযোগ পায়। সে রাতে আমার সঙ্গে ছিল দুটি জুনিয়র ছেলে— হাফিজ আর মাইকেল। এটাও স্কাউটমাস্টারদের প্ল্যানের অন্তর্গত। নানা ধর্মের ছেলেদের পারস্পরিক মেলামেশা, যৌথ জীবন। শুয়ে শুয়ে গল্প করাটাকে খুব একটা উৎসাহ দেওয়া হত না। তবে সারাদিন খেলাধুলো, সাঁতার এবং অত রকম কাজ-কর্ম করে বিছানায় শোওয়ামাত্র আমরা ঘুমিয়েই পড়তুম। দূর থেকে বিপ্লবদার হুইসলের শিস্, সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে ঘুম।

হয়তো সেদিন রাত্রের রান্নাটা মাস্টারমশাইরা করায় আমাদের ক্লান্তি একটু কম ছিল, হাফিজ বলল,— সমুদা ঘুমোলে?

—না।

—মাইক্‌ল ঘুমিয়েছিস?

—উঁহু।

আমারও ঘুম আসছে না। —তারপরে কেমন কাঁপা-কাঁপা গলায় হাফিজ বলল— আমি চিতাকে ভয় পাই।

—চিতাকে আবার কে না ভয় পায়? বিশ্বের দ্রুততম হিংস্র প্রাণী। তবে এখানে চিতা-টিতা নেই। —আমি আশ্বাস দিই।

—জানোয়ার চিতার কথা বলিনি। ওই মড়া পোড়ানোর কথা বলছি।

—তোরা হঠাৎ চিতা-টিতার কথা ভাবছিস কেন?

—তুমি যে বললে পাহাড়ের কথা ভাব।

আমি চুপ করে যাই। সেই মুহূর্তের একটা নিজস্ব অনুভবের কথাই তো আমি বলেছি, সমস্ত আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে প্রকৃতি আমাকে এমন একটা এক্স-ফ্যাক্টরের উপমা দেখিয়েছিল যেটা নাকি সনাতন।

—মৃত্যুর সঙ্গেও চিতা বা কবরের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। মৃত্যু একটা অজানা দিগন্ত, পাহাড় যেমন রহস্যময়, তেমনই। তাই থেকেই তুলনাটা এল। মৃতদেহের তো নানা জনে নানারকম সৎকার করে। মৃত্যু একটা অন্য অভিজ্ঞতা।

—তোমার কথা বুঝতে পারলুম না।

আমি নিজেই কি বুঝি? তাই হেসে বললুম— বুঝতে হবে না। কী করব, বলব ভেবে না পেয়ে ওই সব উল্টোপাল্টা বকেছি।

দূর থেকে হুইসল বেজে উঠল। বিপ্লবদা বোধহয় কোনও কোনও টেন্টে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। তাই দ্বিতীয়বার হুইসল।

—ঘুমিয়ে পড়। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

পরদিন দুপুরবেলা। তখন আমরা বাসন মাজছি। বড় ছেলেরা কড়া হাঁড়ি ডেকচি এইসব নিয়ে বসেছি। ছোটরা জল ঢেলে দিচ্ছে। কেউ কেউ দূরে শালপাতা মাটির খুরি গেলাস ফেলে আসছে, সুকুমার চাপা রাগত গলায় বলল— তোকে আমি দেখে নেব সমুদ্র। বাড়ি ফিরি। তোকে আমি ছাড়ব না।

আমি অবাক।

—আমার ওপর রাগ করে আছিস এখনও? শুধু কালকের ওই কথাগুলোর জন্যে?

—আমার বাবা-মা ক'দিনের মধ্যে মারা গেছে, আমি মামার বাড়িতে থাকি তুই জানিস না? সবে ভুলতে শুরু করেছি, ক'দিন একটু আনন্দ করছি, মজায় আছি, তোর সেটা সইছে না, কেমন? মীন। মীন একটা...

—আমি সত্যি জানতুম না সুকুমার। কী করে জানব, বল।

—কোথাও থেকে জেনেছিস। বেস্ট স্কাউটের দৌড়ে আমি এগিয়ে আছি। জেনে বুঝে তুই আমাকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করছিস, তোর ওই চামচা পুলকটা সেকেন্ড প্লেস পাচ্ছে বলে!

এত অবাক হয়ে গেছি যে মুখ দিয়ে কথা সরছে না আমার।

বলি— আমায় বিশ্বাস কর, আমি কিছু জানতুম না। এভাবে কাউকে দমিয়ে দেওয়া যায়, তা-ও আমার ধারণায় নেই। ওটা একটা কী বলব...যে মুহূর্তে বললুম সেই মুহূর্তের ভাবনা। আমার তো তোদের মতো কোনও গুণ নেই। যা মনে হল তাই বলে ফেলেছি। তুই ওসব আজে-বাজে কথা ভাবিসনি।

সুকুমার অতবড় শক্তপোক্ত ছেলেটা হঠাৎ মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ কাঁদবার পর যখন একটু শান্ত হয়েছে তখন সাহস করে ওর কাঁধে একটা হাত রাখি। —সুকুমার, আমি বুঝতে পারছি। তোর কষ্টটা ঠিকঠাক বুঝতে পারছি। ভুলে যা। কালকের কথা ভুলে যা। আজ খুব দারুণ কিছু একটা করবি। আজ শেষ।

—আমি আর কিছুই করতে পারব না, সমুদ্র। আমার বাবা মা ওই পাহাড় থেকে আমায় ডাকছে। কী জোর সেই ডাকের তুই বুঝবি না। কান্না ভেজা ফুলো লাল চোখমুখ নিয়ে সুকুমার বেরিয়ে গেল।

পুলুকে জিজ্ঞেস করি— কী করব? এই ব্যাপার।

—অদ্ভুত তো! —পুলু অবাক, এরকম হয়?

আমরা দুজন পরামর্শ করে সেদিন টেন্টগুলোর পেছনে একেবারে তিরতিরে নদীটার ধারে বন ফায়ার জ্বালালুম। সারেরা বললেন— কী একটা স্পট বাছলে?

—রোজ রোজ এক জায়গায় ভাল লাগে না সার।

পাহাড়ের দিকে মুখ জায়গাটা পুরো ভর্তি। সুকুমারকে বসতে হল নদীর দিকে মুখ করে।

ক্রমশ ক্রমশ জমে উঠতে লাগল আমাদের জাম্বোরিির শেষ রাত। হই-হল্লা। এক সারের বাকসো থেকে বেরোল একটা লজঝড়ে স্প্যানিশ গিটার। একজন বার করল মাউথ অরগ্যান। স্টিলের থালা

আর লম্বা হাতা নিয়ে রেডি আরও একজন। নাচবে বলে কয়েকজন দাঁড়িয়ে উঠল, মুখে মুখে গান তৈরি, হাতে হাতে বাজনা... একেবারে যাকে বলে আবোল-তাবোল। বিপ্লবদা ধরলেন— হেই হেই আশিয়ানা ট্যাংগো

পুলু পরের লাইন— যত পারো করে নাও ব্যঙ্গ

সমীরদার লিডে সবাই— কেউ থামাবে না গান, কেউ থামাবে না নাচ

কেউ দিচ্ছে না রণে ভঙ্গ, ভ্যাংগো—ও-ও।

হাফিজ— হো হো আমাদের ট্যাংগো

তপন— আমাদের দেশিয়ানা ম্যাঙ্গো

সবাই— চেখে দ্যাখো সয়ে যাবে, না চাখলে বয়ে যাবে

এর নাম রঙ্গ, র‍্যাংগো...

## ৪

সেই থেকে আমি সতর্ক হয়ে যাই। যে সব কথা আমার মনে হয়, তা আমারই কথা। আর কাউকে বলার নয়। বললে তার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এমনিতেই চুপচাপ। আমি আরও চুপ হয়ে যাই। ক্লাস করি, ওয়ার্কশপ করি, ল্যাবের সময়ে ল্যাব, রাত্তির অবধি পড়ি। বটানিকসে গিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াই, যখন দলের সঙ্গে তখন দলের মতো। যখন একলা তখন নিজের মতো। বটানিক্যাল গার্ডেনটাই আমার ঘরবাড়ি হয়ে ওঠে এক এক সময়ে। নদী সামনে নিয়ে বসতে আমার কেমন একটা স্বস্তি হয় আসলে। হস্টেলের ঘর বড় ছোট মনে হয়। নিজেকে ছড়াতে পারি না। ফার্স্ট ইয়ারে পুরনো বাড়িতে থাকতুম। সেগুলো অনেক উঁচু ছিল। এক এক সময়ে মনে হয়, এত ছাত কেন? এত দেয়াল কেন? ওপর থেকে একটা বোমা-টোমা পড়ে যদি ছাতটা ভেঙে যায় তো বেশ হয়। ঠিক একটা পুরনো অব্যবহৃত কুয়োর মতো ছন্ন দেখতে হবে ঘরখানা! নিজের

ভাবনায় নিজেই এক এক সময়ে বিরক্ত হই। এরকম ধ্বংসাত্মক ভাবনা-চিন্তা কেন আমার? এদিকে তো আমি গড়তে শিখছি। তবে এ কেমন বিপ্রতীপ আচরণ মনের?

সকলে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যায় না। এগুলো ওদের নানা রকম মজার সময়। কী মজা আমি জানতে চাই না। ঠারে-ঠোরে যেটুকু শুনি। বাড়ি চলে যাই, সবাই খুব স্বস্তি পান, দাদুর মুখটা আলো হয়ে যায়। আর ফিনকির তো কথাই নেই। সারা সপ্তাহ কী কী কৌতুকজনক ঘটনা ঘটল, বাবা কতবার শুধু শুধু চেঁচালেন, দাদা চিঠিতে কী লিখেছে সব তার বলা চাই। সবচেয়ে কম সময়টা সে দেয় পড়াশোনাতে যার জন্য না কি প্রতি সপ্তাহে আমার আসাটা বাধ্যতামূলক।

—কী রে ফিনকি? তোর জোমেট্রি আজ? রাইডারগুলো পেরেছিস? —শোন না— ফিনকি এক পাক নেচে নিল, —দাদা না প্রেম করছে।

—কী?

—হ্যাঁরে! বউদিটার নাম সন্তোষ, হি হি মেয়েদের এ রকম নাম শুনেছিস?

—সন্তোষ?

—তুই কী করে জানলি প্রেম?

দাদু মাকে বলছিলেন— বউমা, সাগর প্রতি চিঠিতেই এই পঞ্জাবি মেয়েটির কথা লিখছে। মনে হচ্ছে হি ইজ ইন লাভ।

—মা কী বললেন?

—কিচ্ছু বলল না। কিন্তু মা কাঁদছিল।

—কাঁদছিলেন? কেন? তুই কী করে বুঝলি?

—মা দাদুর ঘরের বাইরে এসে চোখ মুছছিল ।

খবরটা নতুন। মায়ের কোনও আলাদা সুখ-দুঃখ আছে বলে আমি জানতুম না। মা যেন এক কর্তব্যপুতলি। কারও কোনও ব্যবহারেই মায়ের কোনও বিকার দেখিনি। কথা দরকারের বেশি বলতেন না। নানা জনের সেবা করতে করতে, ফরমাশ খাটতে খাটতে নিজের

ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাই মা করে উঠতে পারেননি। মায়ের অভাব আমরা তেমন করে বুঝিওনি। দুই ঠাকুমারই তখন আর একটু কম বয়স ছিল। ভাত মেখে, গল্প বলতে বলতে খাইয়ে দিচ্ছেন এরকম একটা দৃশ্য আবছা মনে পড়ে। তারপর একটু বড় হতেই তো দাদুর আওতায়। দাদার এ নিয়ে বোধহয় একটু ক্ষোভ থেকে থাকবে। মাঝে মাঝে বলত— সবাইমিলে মাকে কেটেকুটে ভাগ করে নিয়েছে। আমাদের ভাঁড়ে মা ভবানী।

যখন কোনও জিনিস খুঁজে পেত না, বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করত, কিংবা অসুখবিসুখ করত, তখন এই ক্ষোভগুলো ওর চেগে উঠত। সেবার জল-বসন্ত হল। খুব গুটি বেরিয়েছে। দাদা মশারির মধ্যে শুয়ে থাকত একা। আমাকে দাদুর ঘরে শুতে দেওয়া হত তখন। দাদার ঘরের পাশেই অবশ্য মায়ের ঘর। মাঝখানের দরজা মা রাতে খুলে রাখতেন। কিন্তু একদিন শেষ রাত্তিরে কেমন হাউমাউ করে দাদা মশারি ছিঁড়ে, ঘর থেকে দালানে এসে রাগ আর কান্না মিশিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

—বেশ, বেশ, বাঃ, বাঃ একটা রুগ্‌ণ ছেলেকে একা ফেলে নিজেরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কেমন মা, কেমন বাবা? এরা কেমন?

মা ঘুম চোখে বেরিয়ে এলেন— কী হয়েছে বাবলা?

—হ্যাঁ এখন বাবলা!— দাদা ভ্যাঙাল— চুলকোনিতে সারারাত বলে ঘুম নেই!

—আমি যে চন্দন লাগিয়ে দিলুম, নিমের পাতাসুদ্ধু ডাল দিলুম? চুলকোলেই বুলোতে হবে বলে দিলুম যে!

—ঘুমোব? না নিম বুলোব? জলপটিটাও নিজে দিয়ে নেব! থার্মোমিটারটাও নিজে নিজেই লাগিয়ে টেম্পারেচার দেখব! এবার এ ঘরে একটা স্টোভও রেখে যেয়ো, নিজের হরলিক্স-টিকসগুলো নিজেই করে নেব। চমৎকার।

বাবাও বেরিয়ে এসেছিলেন চেঁচামেচিতে।

—কী হল? জ্বর বেড়েছে, না কী?

—তোমাকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। যাও যাও লুচি মাংস খেয়ে আড্ডা দিগে যাও। —দাদা চেঁচিয়ে উঠল।

—কী? আমাকে এত বড় কথা, এত্ত বড়! রুচি কাল থেকে আমাকে আর লুচি-মাংস দেবে না...কাল থেকে আমাকে...

দাদু উঠে এসেছেন নীচ থেকে।

—খোকা কী হচ্ছে? ছেলেটা অসুস্থ।

দাদা আবার হাইমাই করে উঠল— আমার মাথার কাছে রোজ পেতনি দাঁড়িয়ে থাকে জানো? আজকে গলা টিপে ধরবে বলে হাত বাড়িয়েছিল।

মা বললেন— ঠিক আছে, আজ থেকে আমি তোমার ঘরে থাকব, ব্যস আর কান্নাকাটি কোরো না।

দাদু বললেন,— এই রোগে এটা একটা খুব কমন হ্যালুসিনেশন বাবুভাই। মাথার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। যারা জানে না তারা বলে মা শীতলা।

তা যেন হল। কিন্তু আমার যেটা খারাপ লাগল মা সারাদিন ঠিক তেমনই উদয়াস্ত খেটে সারা রাত দাদার পাশে বসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, ছটফট করলে জল। সারাদিন তো সবকিছু করছেনই, সাবান, অ্যান্টিসেপটিক কাপড় পাল্টানো। কেউ নেই বলবার যে এটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। শেষ কালে আমি বলি— দাদু, আমিই দাদার ঘরে থাকব।

দাদু আকাশ থেকে পড়লেন— তুমি? তুমি সেবার কী জান? এইটুকু ছেলে?

—এত মা কেমন করে পারবেন? সারা দিন...তারপর সারা রাত...

দাদু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন— তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা তোমার মায়ের কাছ থেকে বড্ড বেশি ডিমান্ড করি। আমি, আমিই বরং বাবুর কাছে থাকব।

—তুমি?

—তুমি জানো না সমু। তোমার তিন বছর বয়সে টাইফয়েড হয়েছিল। এই ঘরে রেখে তোমার সেবা আমিই করেছি।

—কিন্তু এখন তোমার...তুমি তো এখন...

—বুড়ো হয়েছি? ঠিক কথা। কিন্তু মানুষ একবার যেটা শেখে সেটা

আর ভোলে না। সাঁতারই বল আর সেবাই বল। এ রকম সঙ্কটের সময়েও আমি নিজের রুটিন নিয়ে আছি। আমার শেয়ার করা উচিত ছিল।

—আমি তা বলিনি দাদু। মা তোমাকে করতে দেবেনও না।

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাতে দাদার বিছানায় মশারি ফেলে জল, নিমডাল সব গুছিয়ে রেখে মা যেমনি বেরিয়ে গেছেন অমনি আমি দরজা বন্ধ করে দাদার পাশে নিজের তক্তপোশে শুয়ে পড়লুম।

—তুই শুলি যে? —দাদা অবাক।

—আজ থেকে তোর কাছে আমি থাকব।

—কে বলেছে? দাদু?

—না।

—তবে কে ঠিক করল?

—কেউ না, আমি নিজে।

—কিন্তু তোর তো একবারও হয়নি। ছোঁয়াচ লাগলে?

—লাগবে, কী করা যাবে! তুই ভাবিস না, যেই দরকার হবে ডাক দিবি, আমি ঠিক উঠে পড়ব।

মা আরও রাত্তিরে এসে দরজার কড়া নাড়লে, আমি জানলা দিয়ে বললুম— দাদার কাছে আমি থাকছি। নিজের ঘরে ছাড়া আমার ঘুম হচ্ছে না।

—ওর অসুবিধে হবে সমু।

—হবে না। আমার ঘুম খুব পাতলা। তুমি যাও শুয়ে পড়ো গে।

মা আর কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক করলেন। কিন্তু মায়ের চিরকালই কথা কম, কাজ বেশি। শেষে রণে ভঙ্গ দিলেন।

আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করি— তোর কি মাকেই বিশেষ করে দরকার? বাচ্চারা অসুখ করলে বেশি-বেশি মা-মা করে, সেই রকম?

দাদা বলল— একটা সত্যি কথা বলব?

—বল।

—তুই থাকলেই আমার বেশি সোয়াস্তি হবে। মা সারা রাত জেগে বসে থাকবেন। বললেও কিছুতেই শোবেন না। মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ে

যাচ্ছেন তার পরেই আবার চমকে জেগে উঠে হাতে পায়ে নিম ডাল বুলোতে থাকছেন। যেন কী রকম নিঃশব্দে স্যাক্রিফাইস করে চলেছেন বাবার জন্যে, দাদুর জন্যে, এবার আমার জন্যে। আই ডোন্ট লাইক ইট। আনইজি লাগে।

রাত ছমছম করছে। খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার আলো ঢুকছে ঘরে। আমার মশারি, তার বাইরে খালি স্পেস। তারপরে দাদার মশারি, ভেতরে দাদার বিছানা। দাদার শরীরভরা জলবসন্তের ফোস্কা ফোস্কা গুটি, শরীরের দাদা এক, ভেতরে আর একটা দাদা, অভিমান, রাগ আবার অস্বস্তিতে ভুগছে, ভয়েও। তারও ভেতরে আর একটা দাদা যে পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে। যে হৃদয়ঙ্গম করেছে মায়ের শ্রান্তি। আমার আন্তরিক ইচ্ছার সেবা, সে এখন স্বস্তিতে। শান্তিতে। তারও ভেতরে আছে এই সাময়িক অসুস্থতা ও বিকারের বাইরের অন্য দাদা, যে টেবিলের ওপর কনুই রেখে অনন্য মনে পড়ে যায়, খালি পড়ে যায়, লেখে, অঙ্ক কষে, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, বি বি সি শোনে, কদাচিৎ কদাচিৎ একদম একা একা সিনেমা দেখে আসে, কী সিনেমা জিজ্ঞেস করলে শুধু মিটিমিটি হাসে। আমরা দুজন মানুষ এক ঘরের দুই প্রান্তে। এক বাড়ি এক পরিবার। একই বাবা-মা'র রক্ত, বংশের জিন আমাদের শরীরে, এই তো দাদাকে জল এগিয়ে দিচ্ছি। হরলিক্স দিলুম, ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে, টেম্পারেচার দেখলুম, খুব কম, নিরানব্বুই মতো... সবই... কিন্তু কোনওদিনই আমাদের চেনাশোনা হবে না। একজন আলাস্কান কিংবা জাপানি আমার কাছে যেমন অচেনা তেমনই থেকে যাবে। অথচ একই মনুষ্য লক্ষণ, রক্ত, একই জৈবনিক ওঠাপড়া। মস্তিষ্কের গঠন, কোষ সমূহ।

—সমু! সমু! দাদা চাপা ভিতু গলায় চিৎকার করছে। হ্যাঁ। চাপা কিন্তু চিৎকারই।

—সমু আমাকে তোর পাশে শুতে দে। সেই সাদা কাপড় মহিলা— যেই ঘুম আসছে অমনি।

আমি বললুম— তুই শুয়ে পড়, আমি যাচ্ছি। তখন রাত পাতলা

হয়ে এসেছে। দপদপ করছে শুকতারা একটা স্টেনলেস স্টিলের টিপের মতো। একটু পরেই প্রথম ভোরের আলো ইরেজার দিয়ে ঘষে মুছে দেবে ওকে। দাদার বিছানার পাশে বসে কপালে আলতো হাত রাখি। এখন ওর সারা শরীরের অগুনতি গুটি শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু মুখেরগুলো বেশির ভাগই দগদগে।

আধো ঘুমের ঘোরে দাদা বলল— কে হাত রাখল রে মাথায়? ওই সাদা কাপড় নয় তো! দেখিস।

শেষ রাত বড় অদ্ভুত সময়। অপার্থিব। মনে হয় এক মহাজাগতিক অনন্তে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছি। আমার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব দুটোই সমান সত্য। পৃথিবীতে যেমন একটা সত্যি হলে অন্যটা মিথ্যে হয় তেমন নয়। খুব অদ্ভুত জায়গা, যদি জায়গাই বলা যায় ওটাকে, যেখানে সব বিপ্রতীপ সমান ঔদাসীন্যে অবস্থান করে। খুব বেশিক্ষণ এই অনুভবের মধ্যে থাকলে জীবনের সব কিছু খুঁটিনাটি কী রকম যেন অবান্তর হয়ে যায়। ঠিক ভয় করে না, কিন্তু আস্তে আস্তে আমি ওই মেজাজের বাইরে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করি। খুব বেশি জোর নয়। সামান্য চাপ দিলে যেমন কোনও কোনও বাক্সের ডালা খুলে যাবার একটা ব্যবস্থা থাকে সেই রকম! সামান্য চাপ। ধীরে ধীরে অনন্তর ভেতরের ঢাকনা খুলে যায়, সেই স্বল্প, অভ্যস্ত স্পেসের মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং ঘুম এসে যায়। বুঝিওনি যে ঘুমিয়ে পড়েছি। ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে দাঁড়ান একজন— সাদা কাপড় পরা, মাথায় ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না, শেষ রাতের আবছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। তিনি হাত বার করেছিলেন কি না বুঝিনি। কিন্তু স্পষ্টই দেখলুম দাদার মাথার ওপর একটা হাত। সেই হাতটার শীতল শুশ্রূষা আমার মাথাও ছুঁয়ে গেল মৃদু এক ঝলক হাওয়ার মতো।

আমি পুরোটাকেই সত্যি ভেবেছি। ঘুমের মধ্যেই ডেকেছি— মা? মা নাকি? কোনও উত্তর নেই।

ঝলমলে রোদে ঘর ভেসে যাচ্ছে। চোখের ওপর জ্বালা ধরানো সূর্যশলাকা। জেগে উঠে দেখি, বহু বেলা পর্যন্ত দুজনে ঘুমিয়েছি।

জানলার কাছ থেকে মা আস্তে ডাকছেন সমু, সমু, এবার ওঠো, দরজাটা খুলে দাও।

দরজাটা খুলে দিতে মা খুব মৃদু গলায় বললেন— দেখেছ তো, রাত জাগার ফল কী! এখন তো স্কুলে যেতে হবে। চান করে নাও। একেবারে ভাত খাবে।

উঁকি মেরে দেখলেন— বাবলা ঘুমোচ্ছে? খুব, না?

—হ্যাঁ, ওর জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে।

৫

সেই দাদা প্রেম করছে? ভিন্ন প্রদেশীয় মেয়ের সঙ্গে? আমার কী রকম অদ্ভুত লাগল। দাদা আমাদের বাড়িতে আলগা। সেভাবে দেখতে গেলে আমিও আলগা। মা-ই কি আলগা নয়? বাবা তো বাড়িটাকে হোটেলের মতোই ব্যবহার করেন। বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একমাত্র দাদু আর ফিনকির। কিন্তু যারা আলগা তারা স্বভাবেও আলগা, একা বলে আমার ধারণা ছিল। দাদা এই বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে তার একাকিত্ব ঘোচাবার চেষ্টা করছে? যে দাদা সিনেমা পর্যন্ত একা-একা যেত, তার প্রথম বন্ধুই একজন মেয়ে, ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন আচার-আচরণের মেয়ে! তা ছাড়া, দাদা যতই যা-ই হোক, যেটুকু ভরসা করে আমাকেই করে, আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাল না! তবে কি যেটুকু বাঁধন ছিল সেটুকুও এবার ছিঁড়ল। আমাকে খুব আশ্চর্য করে আমার বুকের পেশিতে একটা টান ধরল। দাদা চলে যাচ্ছে। দাদা চলে যাচ্ছে। অথচ দাদার কত ডায়াগ্রাম এঁকে দিয়েছি, দাদা আমার কত প্রবলেম দেখে দিয়েছে। এক ঘরে থাকতুম, পাশাপাশি তক্তপোশে শোওয়া, মাঝখানে জানলা ঘেঁষে বড় টেবিল। তার একদিকে আমি আর একদিকে দাদা। জলবসন্তের রাত আমি দাদার পাশে। দুজনের কপালে একই স্পর্শ। 'তুই থাকলেই আমার বেশি সোয়াস্তি' দাদা বলছে। অথচ দাদা আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে চলে যাচ্ছে।

যথেষ্ট আলোড়ন ভেতরে। আমি আমার নিশ্চিন্ত রুটিন মানতে পারছি না। এতই উদ্বেগ যে পুলক লক্ষ করেছে।

—কী হয়েছে রে তোর, সমু?

—কিছু না তো!

—ঠিক জানতুম এই কথাই বলবি। থাক, আমাকে কিছু বলতে হবে না তোর।

রাগ করে পুলু চলে যায়।

তখন বুঝতে পারি, হঠাৎ-ই, যে একটা মানুষের আর একটা মানুষের যতখানি কাছে আসা সম্ভব, পুলক আমার কাছে এসেছে। এর কারণ কী আমি জানি না। কেন না আমাদের রুচি, স্বভাব কিছুই এক রকমের নয়। এক স্কুলে পড়েছি, এক ক্লাবে ব্যায়াম করেছি, দুজনেই এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। যদিও আলাদা আলাদা বিষয়। তো কী? এইগুলোই যদি ঘনিষ্ঠতার কারণ হয়ে থাকে তা হলে তার গভীরতা বেশি নয়। আমি কোনও হিরো নই। তবু পুলক আমার শাগরেদ। আমাকে ও সমর্থন করে, কতবার বাঁচিয়েছে, কেন না সমবয়সিরা আমাকে বড্ড ভুল বোঝে।

—এই পুলু শোন।

চৌকাঠে পা দিয়েছিল, বলল— বল শুনছি, এ ঘরে আবার বহু দূর অতীতের কোনও ক্ষুধিত পাষাণটাষাণ শুনতে পাচ্ছিস, না কী?

—নাহ্। চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কাছ থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে পায়ের শব্দ।

—অনেক পা! না এক জোড়া? এক জোড়া যদি হয় তো সেটা আমার। আর অনেকের যদি হয় তা হলে নতুন ফার্স্ট ইয়ারের। করিডর দিয়ে এক্ষুনি চলে গেল।

—ঠাট্টা নয়, শোন না।

—বল। পুলু উৎসাহিত হয়েছে খুব কিন্তু সেটা দেখাবে না।

—পুলু। দাদা বোধহয় বিয়ে করছে।

—বলিস কী রে? পুলু লম্ফ দিয়ে উঠল— তবে তো ভোজ ভোজ মহাভোজ।

আমার মুখে ফিকে হাসি দেখে ও রেগে উঠল— দাদা কি তোর প্রেমিকা? যে দাদার বিয়ে হচ্ছে বলে কাঁদতে বসেছিস?

—কাঁদলুম আবার কই? কী যে বলিস! দাদা তো দূরেই থাকে, আরও দূরে চলে যাবে। এই!

—দূরে মানে? দিল্লিতে চাকরি, যাবে না? তুই যদি এখন তিরুবনন্তপুরমে চাকরি পাস— যাবি না? আরও দূরে মানে? তোর দাদার শ্বশুর কি জামাইকে বিলেত পাঠাচ্ছে? বিলেত একবার গেলে অবশ্য ফেরা শক্ত। আমাদের যে যেখানে বিলেত-আমেরিকা গেছে আর ফিরে আসেনি, মায়াবিনীর দেশ মাইরি। থাক ডিটেল বল।

—ডিটেল কিছু নেই। অন্তত জানি না।

—কবে, কার সঙ্গে, কী দিচ্ছে থুচ্ছে...

আমি হাসি— কিছুই জানি না।

—এই যে বললি বিলেত যাচ্ছে।

—ওটা তুই বলেছিস পুলু, আমি নই।

—তো আমি যেগুলো বলিনি সেগুলো বল। কবে ডেট ঠিক হল!

—কিছুই হয়নি। দাদার চিঠি পড়ে দাদুর মনে হয়েছে, দাদা বিয়ে-টিয়ে করতে চায়।

—এই, ব্যস? তুই দেখালি একখানা সমু। চাকরি-বাকরি করছে। সোমত্থ ছেলে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হচ্ছে। বিয়ে করতে চাইবে না?

আমি চুপ করে যাই। বীজ থেকে গাছ হল, গাছ থেকে ডালপালা, পাতাপুতি, ফুলফল, বনস্পতি হলে তার আর ফুল নেই শুধু ফল। ফুলন্ত বৃক্ষের শোভা কি কোনওদিন আমার দাদুর বাড়িতে ছিল? দাদুর বড় দুই ভাই ঝরে গেছেন, দুই ঠাকুমা দুটো অর্ধছিন্ন শাখা, দাদুর ছোট ছেলে কতদিন মাদ্রাজ-প্রবাসী। আগে আসতেন, ফিনকিকে জন্ম দিয়ে কাকিমা মারা গেলেন তখন সেই শিশুকে আমার মায়ের কাছে জমা রেখে তিনি ফিরে গেলেন, ওখানকারই একজন মেয়েকে বিয়ে করলেন। আর এলেন না। ফিনকি জানেই না কাকা ওর বাবা। পাছে ওকে নিতে হয়, চেনা দিতে হয় তাই-ই হয়তো কাকা... একপক্ষে

ভালই। কিন্তু সেই কাকিমা আর তাঁর ছেলেমেয়েরা যদি এখানে মাঝে মাঝে আসত আমরা যেতুম, ফিনকি যদি ছোট্ট থেকেই জানত যাকে মা বলে ডাকে তিনি ওর জ্যাঠাইমা, তবে কী ক্ষতি হত? এত লুকোছাপা কীসের?

আর জ্যাঠামশাই? খুব রেগে যেতেন, লাল চোখ ঘুরত, যেটুকু মনে আছে, জ্যাঠামশাই আছেন আছেন বেশ আছেন, হঠাৎ প্রচণ্ড হয়ে উঠতেন, জিনিসপত্র ভাঙচুর, সে এক ভীষণ কাণ্ড। এখন শুনতে পাই জ্যাঠামশাইকে কোনও মানসিক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। দাদু দেখতে যান খুব মাঝে মাঝে। আর কেউ না, কখনও না। আমার খুব ছোটবেলার স্মৃতিতে ছাড়া জ্যাঠামশাই আর কোথাও নেই। অথচ জ্যাঠামশাই ছিলেন দাদুর ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী।

এত কথা তো পুলু জানে না, জানার দরকারই বা কী! কিন্তু আমার সেই ভগ্নশাখা বনস্পতির কথা মনে হয় যার ডালের পর ডাল ভেঙে পড়ছে। সব সময়ে যে কালের প্রকোপে তাও নয়। কোথা থেকে কুঠার চালাচ্ছে কেউ।

অবশেষে একদিন চিঠি পাই। দাদার।

সমু,

কেমন আছ? ভালই করছ শুনছি। আমার পিএইচ. ডি গতকাল পেলুম। থিসিস উচ্চ-প্রশংসিত। প্রকাশ করবার চেষ্টা চলছে। রীডার হয়ে গেছি। এখানে ক্যাম্পাসে আঁতেল স্নবারি খুব। মেলামেশা করতে গেলে লাইফ-স্টাইল মেনটেন করতে হয়। খরচে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। তোমার আর এক বছর এটাই ভরসা। আমার গাইড দলজিৎ অরোরা খুব বিবেচক। একলা কিছুই চালিয়ে উঠতে পারছিলুম না। টাকাপয়সা, জিনিসপত্র সব চুরি হয়ে যাচ্ছিল। এখন পেয়িং গেস্ট হয়ে আছি অরোরাজির বাড়িতেই। ওঁর কেউ নেই এক মেয়ে আর স্ত্রী ছাড়া। ভদ্রমহিলা খুব স্নেহময়ী। পঞ্জাবি রুটি খেলে তুমি আর ভুলতে পারবে না। এখানে চলে এসো একবার। ছুটিতে। সিরিয়াসলি বলছি। আমার পি জি অ্যাকমোডেশন ঠিকই, কিন্তু কুল্যে দু'খানা ঘর, একটা টয়লেট, একটু বারান্দা। ভদ্রমহিলা আর তাঁর মেয়ে

সবই টিপটপ রাখেন, আমি শুধু মাসান্তে টাকাটা দিয়ে খালাস। দ্বিতীয় ঘরটাতে একজন গেস্ট রাখতেই পারি। কোনও অসুবিধে নেই।

চিঠিটা এইটুকুই। কিন্তু চিঠির লাইনের মাঝে মাঝে আরও অনেক না-বলা কথা উঁকিঝুঁকি মারছে। যেমন, তুমি তাড়াতাড়ি পাশ-টাশ করে সংসারের দায়িত্ব নাও। আমি পেরে উঠছি না। যেমন, আমার লাইফ-স্টাইল অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। তার যা যা ফলাফল তা-ও ক্রমশ প্রকাশ্য। যেমন, বাড়িতে আমি যে স্নেহ-যত্ন পাইনি, এখানে তা পাচ্ছি। এবং সমু একবার এসো, মুখোমুখি তোমার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা বলা দরকার, যে কথাগুলো দাদুকে লিখতে পারছি না।

সেই রবিবার আমি বাড়ি গেলুম না। ফোন করে দিলুম। কাজ জমে গেছে বাজে কথা। আমার কাজ কোনওদিনও জমে না। আসলে দাদার চিঠি পাবার পর থেকে একটা ভীষণ মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য শুরু হয়, যার পরিণতি হয় এক প্রবল শরীরী আলোড়নে। ঘুমের মধ্যে নিম্নাঙ্গের এই কঠিনতা এই প্রবল আবেগ যে জানিনি তা তো নয়! কিন্তু এ ক'দিন যা হচ্ছে তা অসহ্য। শরীর গরম। এখুনি কাউকে আক্রমণ করতে না পারলে যেন শান্ত হতে পারব না। হস্টেলের সবচেয়ে তুখোড় ছেলে মৃণাল। ওদের ঘরে গেলাম।

—কী রে ভাল ছেলে? বাড়ি যাসনি?

—নাঃ, তোদের সঙ্গে বেরোব।

—আমাদের সঙ্গে? —ওরা মৃণাল, সুজন, নৃপেশ চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—পুলককে ডেকে নে, তোর বডিগার্ড!

—পুলক বাড়ি গেছে।

—ভাল ছেলে ডুডু খাবে।

—বাজে কথা রেখে চল—বেরো।

সুজন বলল মৃণালকে, মদনার ঠেকে যাবি? না গোবরদার!

কার ঠেক নিয়ে বেশ মতবিরোধ হল ওদের।

মদনার ঠেকে মাল্লু ভাল, না গোবরদার, এই নিয়ে বিতণ্ডা হল। নতুন শিক্ষানবিশকে নিয়ে যেতে হবে তো!

—পয়লে তো মদনার ঠেকে চল, আড় ভাঙতে হবে না?

—হ্যাঁ, আড়মোড়া।

আমি বললুম— আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি-ফিয়ার্কি মারিসনি। কোথায় যাস চল।

একটা ছোট দোকান। পেছন দিকে লম্বা। অর্থাৎ ঢোকবার দরজাটা ছোট। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

আমরা কয়েকজন গোল হয়ে মেঝেতে বসেছি। কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। প্রচণ্ড গন্ধ। তার সঙ্গে চোখ জ্বালা করা ধোঁয়া। ওরা প্রত্যেকে সিগারেট ধরাল। আমাকেও একটা দিল।

মৃণাল বলল— লেসন ওয়ান।

—কী আছে এতে? কী ভরেছিস?

—কী আবার? গঞ্জিকা? সাধু-মহাত্মারা খেয়ে থাকে। আস্তে টান দিবি।

টান দিই আস্তে। মাথাটায় ঝিম ধরে যায়। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঝিমুনিটা। সব ভুলে যাচ্ছি। দাদা, সন্তোষ অরোরা, ফিনকি, দাদু, বাড়ি, বাড়ির পেছনে বাড়ি, আরও বাড়ি, ঘরের শেষ নেই। অফুরন্ত বারান্দা। হঠাৎ খেয়াল করি আমি আসলে ভুলতে ভুলতে ফিরে গেছি সেই বারান্দাতেই। ছাতিম ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে। আমি হাঁটতে পারছি না, গড়িয়ে যাচ্ছি, গোল একটা বেলনের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে...।

চোখ লাল, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াই। ওরা আমাকে ধরে ধরে হস্টেলে নিয়ে আসে। সারারাত মড়ার মতো ঘুমোই। সকালে ওরা এসে জিজ্ঞেস করে —কেমন আছিস?

—ভাল।

—কেমন লাগল?

—ভাল।

—আজ যাবি?

—যাওয়া যায়।

এইভাবে আস্তে আস্তে আমার প্রোমোশন হয়। দ্রুত শিখে ফেলি। বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। সিগারেট প্যাকেটের রাংতার ওপর সাদা সাদা গুঁড়ো। সরু চোঙানল দিয়ে হুস করে টেনে নিই। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, মাথাটা ফেটে যায়। তারপর শূন্যে সাঁতার কাটতে থাকি।

শনি রবি এইভাবেই কেটে যায়। বাড়ি যাওয়া হয় না। খচ খচ করে মনের মধ্যে। দাদু বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ফিনকি ঠোঁট ফোলাচ্ছে। ফোন করে দিই। বড্ড বেশি কাজের চাপ পড়েছে। দু' তিন সপ্তাহ যেতে পারব না।

পুলু বলল —তোর কী হয়েছে রে?

—কী আবার হবে? তুই তো সব সময়েই আমার কিছু না কিছু হতে দেখছিস।

—হয়েছে বলেই দেখছি। দেখছি বলেই বলছি। চোখ লাল, বিড়বিড় করে বকিস। বাড়ি যাসনি কেন?

—কাজ পড়েছে।

—কাজ তো আমারও। ভাল লাগে উইক-এন্ডে হস্টেলে থাকতে? জঘন্য খাওয়া!

পুলু চলে যায়। আমি মৃণালদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। বাসে চড়ে একবার বদল করে চলে আসি। ওরা টেপা হেসে বলে— এ জায়গাটার নাম বাঁধাঘাট। ওদিকে গঙ্গা, ফেরিঘাট, স্টিমার চলছে, কিন্তু বাঁধাঘাটে একবার এলে বাঁধা পড়তে হবে।

কাছেই একটা সিনেমা হলে আমরা ছবি দেখি। মাঝ-সময়ে ওরা আমাকে টেপে, উঠে পড়ি।

সরু গলি, কাদা-কাদা, ভাঙা ভাঙা বাড়ি, দরজায় একজন নথ পরা গিন্নিবান্নি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলে —এসো খোকাবাবুরা—

—এই খবর্দার খোকাবাবু বলবে না।

—আচ্ছা আচ্ছা মরদের বাচ্চা সব, এ বাবুকে নতুন দেখছি!

—আজ ওর হাতেখড়ি। এই সমু যা! মাসির সঙ্গে যা!

একটা নিচু মতো ভাঙা ভাঙা ঘরে মাথা নিচু করে ঢুকি। কড়া দেশি মদ এক গেলাস রাখে মাসি।

—ওব্যেস আচে নিশ্চয়ই। দেখো বাপু, ঘরদোর ভাসিও না। মাসি চলে যায়। আমি গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখি। তার পরেই ভেতরের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায় নাঙ্গা এক দুঃস্বপ্ন। ডাকিনী যোগিনী ঘিরে আছে কালীমূর্তিকে। গলায় নরমুণ্ডের মালা। আমি কোনওক্রমে বেরিয়ে আসি। টেনে এক চড় মারি মৃণালকে তারপরে ওইভাবেই টলতে টলতে একলা ফিরে আসি হস্টেলে।

৬

কোথা থেকে টাকা জোগাড় করি! দিল্লি যাওয়া-আসার, এবং যদি কোথাও নিজের থাকবার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়, বলা তো যায় না। দাদা যখন দরকারি কথা বলতে চাইছে, তখন কথাটা শোনা দরকার। কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে কিছু ধার নিলুম। বাড়ি। ফিনকির ছুটে আসা। মায়ের মাথার আঁচল খসে পড়ে যাওয়া। দুই ঠাকুমার নিদন্ত মুখে ছেলেমানুষি হাসি। বাবা পিকনিকে গেছেন। এবার গিয়ে দেখলুম দাদু বুড়ো হয়ে গেছেন। এত দিন একমাথা পাকা চুল সত্ত্বেও, 'বুড়ো মানুষ বুড়ো মানুষ' বলা সত্ত্বেও দাদুকে বুড়ো ভাবা যেত না। এখনও, চুল একটু পাতলা হয়ে গেলেও দাদুর দাঁত অটুট, একটুও ঝুঁকে পড়তে দেখলুম না। তবু যেন স্বাস্থ্যের মধ্যে সেই ইস্পাত নেই, কোথাও একটা শীর্ণতা, শুষ্কতা। আমাকে দেখে দাদু তেমন কিছু বললেন না। কেন দু সপ্তাহ আসিনি, জিজ্ঞেসও করলেন না। আমিই ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলি— দাদু কেমন আছ?

দাদু উত্তর দিলেন না। অভিমান হয়েছে না কি? দাদু এত প্র্যাক্টিক্যাল চরিত্রের মানুষ যে মান-অভিমানে তাঁকে খুব বেশি বিচলিত হতে দেখিনি।

—দাদা আমাকে একটা চিঠি লিখেছে, যেতে বলছে খুব করে।

—যাও। থাকবে কোথায়?

—দাদা ব্যবস্থা করবে বলছে।

—তা হলে শুধু গাড়ি-ভাড়া আর কিছু হাত-খরচ?

—হ্যাঁ, সেটা আমি জোগাড় করে নিয়েছি।

—ধার?

—হ্যাঁ।

—বেশ।

—দাদার পিএইচ. ডি হয়ে গেল, রীডার হয়ে গেছে, তোমায় লিখেছে নিশ্চয়।

—এখনও না। লিখবে... হয়তো।

—নিশ্চয়। এতদিন তো আমাকে একটা চিঠিও লেখেনি। এই প্রথম। বোধহয় মনে করে একজনকে খবরটা দিলেই সবাই পেয়ে যাবে।

—হতে পারে। দাদু চুপ করে রইলেন। আমি একই ভাবে বসে থাকি। আমার মনে হল দাদুর আর আমার মাঝখানে একটা ভ্যাকুয়াম। শব্দ পৌঁছয় না, চিন্তাতরঙ্গও না। শুধু আলো কখনও হার মানে না। জানলা দিয়ে বেলা ন'টার ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে দাদুর সাদা চুলে। ফতুয়ার বাঁ কাঁধে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে আছেন, বাহু পেরিয়ে গিঁটবহুল আলগা চামড়ার হাতে পাতার উল্টো পিঠে। সেই একই আলো এক ছিট ছিটকে এসে পড়ে আছে আমার হাঁটুতে।

—আমি জাস্ট যাব আর আসব।

—কেন? জীবনে প্রথমবার দিল্লি যাচ্ছ, ভারতের বহু শতাব্দীর রাজধানী। ইতিহাস দেখে এসো। শুনে এসো। তোমার দাদার কথা বিশেষ কিছু শোনবার নেই।

আমি চমকে দাদুর দিকে চাই, মাথাটা ঝুলে গেছে। দাদুর সেই বহুদিনের পরাজিতের ভঙ্গি।

কেন জানি না আর কোনও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল না। কেন ও কথা বললেন, তার কিছুটা তো আন্দাজ করতে পারিই। দাদুর ওই

ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা দাঁড়ি টেনে দেওয়া সমাপ্তি আছে, যার পর যে কোনও সান্ত্বনাই স্তোক বচনের মতো শোনায়।

—যাও, চান-টান করে ফেলো, একটু থামলেন— তারপর বললেন— তুমি বড় হয়ে গেছ।

এক পক্ষকালের মধ্যে কী এমন বড় হয়ে গেলুম। ভেতর থেকে একটা লজ্জা উঠে আসে। এই দু সপ্তাহের মিথ্যে, অনাচার কি দাদু ধরতে পেরে গেছেন? কী করে? আমার চেহারায়, ব্যবহারে কি কোনও ছাপ পড়েছে? হ্যাঁ, মৃণালের চেহারায় একটা চোয়াড়েমি, চোখের চাউনিতে কেমন একটা অশ্লীলতার ছাপ পড়েছে নিশ্চিত। কিন্তু নৃপেশ নিয়মিত পাতাখোর, ওর চোখে একটা রোম্যান্টিক ভাবালুতা ছাড়া কিছু বোঝা যায় না তো! দু-চার দিন অনিয়ম করেই আমার কী এমন পরিবর্তন হল? চান করি অনেকক্ষণ ধরে, ঘরে আসি। এ ঘরে এখন দাদার ভাগ নেই। আমি সাত দিন গেলে তবে আসি। কখনও কখনও আসিও না। কেমন একটা অব্যবহারের ছাপ পড়েছে ঘরখানায়। যেন ঝাঁট দেওয়া হয়, অথচ মোছা হয় না, একই চাদর, বেড কভার, বালিশের ওয়াড় যেন পরানো অনেকদিন ধরে। অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করছিল, ঘরের মালিক আসেনি, নিশ্চেতন বস্তুর নিজেকে সাফ-সুতরো রাখার, নতুন করে নিজেকে পাওয়ার কোনও উপায় নেই, সচেতনের সাহায্য ছাড়া। দেয়ালে টাঙানো গোল আয়নাটার ওপরেও কেমন একটা ছ্যাৎলা। আমি আমার মুখ রাখি আয়নায়। একটু দাড়ি উঠেছে। ভিজে চুলগুলো একটু বড়। ঘাড়ের কাছে গুটিয়ে রয়েছে। আয়না বলল —আমি তোমাকে চিনি না।

—আমি সমুদ্র, বিশ্বাস কর আমি সমুদ্রই।

—হতে পারে, কিন্তু সমুদ্র তো একটা নয়। তুমিও অন্য। অন্য সমুদ্র। ও চলে গেছে।

আমিই আমাকে বলছি আমি চলে গেছি! বিশ্বাসও করছি কোথাও একটা সমূহ চলাচল চলছে।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। ফিনকি। এক মুখ হাসি। লুটিপুটি চুল। নরম

গালগুলো দেখা যায়। ফিনকির উচ্চ-মাধ্যমিক টেস্ট হয়ে গেছে। ওর উত্তরগুলো কষে দেখেছি ঠিকঠাক হয়েছে। ফিনকিকে দেখে আমি প্রাণপণে ফিরে আসার চেষ্টা করি।

—এতক্ষণ কী করছিলি রে?

—এ-ই। চান করে ঘরে এসে দেখি সব কেমন ধুলো পড়া। ভাবছিলুম পরিষ্কার করব কি না। একটা চাদর আর বালিশের ওয়াড় দিতে পারিস?

অবাক হয়ে ফিনকি বলল— কাল রাতেই তো পাল্টে দিলুম। সব ধোপার বাড়ির। ধোপার বাড়ি গিয়ে গিয়ে বোধহয় রংগুলো একটু কটে গেছে।

—তা হলে একটা ঝাড়ন দে। আয়নাটা মুছি।

—ঝাড়নে হবে না। দাঁড়া আমি ঠিক করে দিচ্ছি। —কোথা থেকে খবরের কাগজ আর এক মগ জল নিয়ে এল ফিনকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়না পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি চোরা চাউনি দিই আয়নাটার দিকে। চাউনিটা রিবাউন্ড করে আমার দিকে ফিরে আসে। আঘাত করে। আয়না আমার প্রতিবিম্ব নেবে না।

ঘরের মেঝেয় সাধারণ ছাইরঙা সিমেন্ট। খানিকটা মসৃণ, কিন্তু জায়গায় জায়গায় কেমন খরখরে হয়ে গেছে।

খেতে বসে দেখি দুই দিদাও এসে ঘুরে গেলেন। মেজদিদার খুব শুচিবাই। উনি এক ধারে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন— দাদুভাই, এক মাত্তর রোববারগুলোয় তোমার দেখা পাই। জানি কাজ পড়েছিল, তবু, বুড়োবুড়িগুলোকে মনে রেখো, হঠাৎ আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন উনি। আস্তে আস্তে চলে গেলেন। বড়দিদা বয়সে বড় কিন্তু শক্ত বেশি, বললেন— আর একটু মাছের তরকারি দাও দাদাভাইকে, ও বউমা। পার্শে মাছ আনিয়েছি দাদা, তুমি ভালবাস। খাও ভাল করে। হস্টেলে কী-ই বা খাও!

হারাই-হারাই ভয় যেন চোখে। এতদিন গেছে কখনও ওঁদের এভাবে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খোঁজ করতে দেখিনি। আমি হাত দিয়ে থালা ঢাকবার আগেই মা আর দুটো পার্শে মাছ আমার পাতে

ফেলে দিলেন। ফিনকিকে বললুম— তুই একটা তুলে নে তো। আমি খেতে পারব না।

—দে—ফিনকি থালা বাড়াল।

—তুই তুলে নে।

দিদারা চলে গেলে ফিনকি বলল, মাছটা দিদারা আনিয়েছেন, তোর জন্যে— বলে হাত চাটতে চাটতে নিগূঢ় হাসি হাসতে লাগল।

শেষ বেলায় আমরা তিনজন সিনেমা দেখতে গেলুম। আমি, ফিনকি আর মা। কোনওমতেই মাকে রাজি করানো যায় না। ফিনকি বলল— তা হলে আমিও যাব না। কতদিন থেকে 'বর্ন-ফ্রি' দেখব বলে বসে আছি।

আমি এভাবে জোর করতে পারতুম না। ফিনকি যা পারে আমি তা পারি না। শুধু ফিনকি কেন, অনেকেই যা পারে, আমি তা পারি না।

৭

নিউ দিল্লি স্টেশনে দাদার আসার কথা। দেখলুম না। নিজের ব্যাগটা দু পায়ের মধ্যে রেখে পকেট থেকে দাদার ঠিকানা বার করি। গ্রেটার কৈলাস। প্রথমে দাদা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকত। এখন গ্রেটার কৈলাস, মানে সেই অরোরাদের বাড়ি। স্টেশন থেকে কতটা দূর কোনও ধারণাই নেই আমার। এখানে শুনেছি ট্যাক্সি, অটো কিছুই মিটারে চলে না। চললেও টুপি পরাবার বন্দোবস্ত করে। একটু ভেবে নিতে হবে, কালীবাড়িটাড়ি গিয়ে আস্তানা নেওয়া ভাল। ওখানে মোটের ওপর সস্তা শুনেছি। তারপর ফোন করব। আমার পিঠে হাত পড়ল। দাদা।

—ভীষণ জ্যামে পড়েছিলুম। তুমি খুব ভাবছিলে?

—হ্যাঁ, ভাবছিলুম কোথায় যাই। কালীবাড়িটাড়ি...

—আরে! আমার একটা দায়িত্ব নেই।

—তুমি পুরো সাড়ে তিন বছর এসেছ দাদা। একবারও বাড়ি যাওনি।

—থিসিস শেষ করতেই তো তিন বছর চলে গেল! তার সঙ্গে চাকরি, খুব টাফ্। অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগে। দিজ পিপল আর সো স্মার্ট! আমাদের ঐতিহ্য তো... ভেতো আপ ব্রিঙ্গিং একেবারে!

দাদার পোশাক-আশাক চলন-বলন সত্যিই এখন খুব স্মার্ট। ইংরেজি সিনেমায় যেমন দেখা যায়। চেহারাটাও খুব ভরেছে। পুরো স্যুট পরনে। চকচকে জুতো মোজা। চশমার ফ্রেমটা পাল্টেছে।

বাইরে দেখলুম একটা কালো অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে।

—ওঠো। দাদা আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে পেছনের সিটে চালান করে দিল। তারপরে ড্রাইভিং সিটে বসল।

—তুমি গাড়ি কিনেছ?

—তুমিও যেমন! অরোরাজির গাড়ি। আমি ড্রাইভিং শিখে গেছি। ও বাড়ির সবাই-ই জানে। আর একটা ফিয়েটও আছে। যখন যার যেটা দরকার হয়...

দাদাকে দেখে আমার সম্ভ্রম জাগার কথা ছিল, কিন্তু আমার ঈষৎ মজাই লাগছিল। দাদা যেন বিশেষ ভাবে আমাকে অভিভূত করবার চেষ্টা করছিল। এর আগে দাদার সঙ্গে আমার দিনগুলো ছিল খুব চুপচাপ। একটা দুটো কথা, কাজ, দুজনের দুদিকে চলে যাওয়া। এত কম কথা বলত, এত একা-একা থাকতে পারত যে মনে হত দাদার পছন্দের মানদণ্ড এমনই যে হয় দাদার কাউকে পছন্দ হয় না, নয় দাদাকে কেউ পছন্দ করে না, এবং দাদা সেটা জানে। সেই চুপচাপ প্রায় ধ্যানস্থ মানুষটা যদি হঠাৎ খুব হাসি উপছে-পড়া, বাচাল মতো হয়ে যায়, তখন অনেকগুলো সম্ভাবনা মনে আসে। হয় তো বাইরের কর্মজগৎটা এতটাই ওর স্বভাবের বিপরীত এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া ওর এতই অসম্ভব যে সেই জগতের বাইরের পোশাকটা ও পরে ফেলেছে, এক রকম ঝাঁকের কই হবার মরিয়া চেষ্টা এটা। আবার এও হতে পারে, আমার কাছে ধরা পড়ে যাবার একটা শঙ্কা ওর মনে কাজ করে যাচ্ছে। ও কিছু লুকোতে চায়। এমন আমূল বদলে যাওয়া কি সম্ভব?

—মা কেমন আছে? কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল।

—যেমন থাকে।

—বোন?

—অনেক বড় হয়ে গেছে।

—দাদু?

—বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

—তুমি কি ভেবেছিলে, দাদু ইয়াং হয়ে যাবেন? দাদা ছোট্ট একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসল। আমি কিছু বললুম না। ভেবে দেখতে গেলে দাদুর বুড়ো হয়ে যাওয়ার তথ্য তো আমি দিইনি। দিতে চেয়েছি সম্পর্কের সুতো ধরে একটু টান, দাদার মধ্যে দাদুর লালিত যে বড় নাতি লুকিয়ে আছে তাকে। ভেবে দিইনি। তবে দাদা বুঝতে পেরেছে। না হলে ওই হাসি আর ওই মন্তব্যের আড়াল খুঁজত না।

গ্রেটার কৈলাসের প্রথম দিনটা ছিল নির্মল, স্বচ্ছ, স্ফটিকের একটা দানার মতো। খুব সুন্দর ডিজাইনের একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচুর লেভেল ব্যবহার করা হয়েছে বাড়িটিতে। যিনিই করে থাকুন অল্প জায়গাকে বেশি করবার মন্ত্র তিনি জানেন। একেবারে ডান দিকের দরজা চাবি দিয়ে খুলল দাদা। ভেতরে একটা দারুণ সাজানো ঘর। মোটা মোটা সোফা, তাতে ঝলমলে কভার। দেওয়াল থেকে নানা রকম জিনিস ঝুলছে। যিনিই সাজিয়ে থাকুন খালি দেওয়ালে তিনি বিশ্বাস করেন না।

—বোসো। দাদা সগর্বে চাবির রিংটা ঘোরাতে লাগল।

—তোমার ঘরে তুমি বাইরে থেকে যখন খুশি ঢুকতে পারো তা হলে?

—না হলে আর স্বাধীনতা কী?

—পুরো স্বাধীনতা নয়, তুমি অন্যের ওপর নির্ভরশীল তো বটেই।

—পার্টলি। বাট আ অ্যাম পেয়িং ফর ইট।

পাশের ঘরটা দাদার শোবার ঘর। এখানে কাজ করবার টেবিল-চেয়ার, পাতলা একটা খাট, দেয়ালের সঙ্গে আটকানো আলমারির পাল্লা। বইপত্রের জন্য তাক।

—তুই আমার খাটটায় শুবি, বুঝলি। আমি এই ঘরে ডিভানটা

পেতে নেব। নিশ্চয় চান করবি। চলে যা। শোবার ঘরের সঙ্গে টয়লেট, শাওয়ার অ্যান্ড এভরিথিং পাবি।

অনেকক্ষণ পরে দাদা আমাকে তুই বলল। অর্থাৎ আড়ষ্টতাটা একটু কেটেছে।

—কী খেতে চাস? ভাত না রুটি!

আমার মনে পড়ল দাদার চিঠির কথা। বললুম—রুটি। দাদার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল আয়।

একতলা থেকে একটা মেজানিনের মতো ঘরে গেলুম। এটা খাবার ঘর। দাদা হিটারে কিছু একটা গরম করল। একটা কৌটো রাখল টেবিলে।

—মাংস আর রুটি, এখানে নানান রকম চাটনি আছে। ক্ষীরা খাবি তো?

—ক্ষীরা?

—শসা, শসা।

আমি জানাই হ্যাঁ। তখন দাদা ফ্রিজ থেকে কাটা আধখানা করা তিন-চারটে শসার প্লেট মাঝখানে রাখল।

—অসুবিধে হবে?

—একেবারেই না।

আমি বয়-স্কাউটে ছিলুম বলে ঘর গোছানো, রান্না করা, বাসন মাজা, বিছানা করা সবই শিখে গেছি। কিন্তু দাদা ছিল মার্কামারা বাঙালি বাড়ির ছেলে। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতেও আপত্তি। মা ওর টেবিলে একটা ঘটিতে জল রেখে চাপা দিয়ে পাশে একটা গ্লাস উপুড় করে রেখে দিতেন। এখন দূর বিদেশে একলা চাকরি করতে এসে দাদাও দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু শিখে গেছে।

—ভাল না?

—ভাল, তবে একটু বেশি ঝাল। ঠিকই আছে।

—রুটিটা?

—খুব ভাল।

এই 'ভাল', 'খুব ভাল'গুলোও যেন দাদার যথেষ্ট বলে মনে হল না। মুখ দেখে একটু হতাশ মনে হল।

—এ বাড়ির লোকেরা কোথায়?

—অরোরাজি তো ইউনিভার্সিটিতে। মাম্মি সোশ্যাল সার্ভিস করেন, একটা সংস্থা আছে। এই ধর, গরিবের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, দুঃস্থ মেয়েদের স্বাবলম্বী হতে শেখানো। শি ইজ এ প্যারাগন অব ভার্চু। সবাইকার কাছেই একেবারে মায়ের মতো।

—আর?

দাদার মুখ একটু লাল হল, বলল— সোনু, মানে ওঁদের মেয়ে এয়ার লাইনস-এ কাজ করে। তাই...আমি তো ছুটি নিয়েছি।

আমি বললুম আমি কিন্তু কালই ফিরতি ট্রেনে চাপব দাদা।

—বলিস কী রে! দিল্লি দেখবি না?

—পরে, এখন না। দিল্লি দেখা পালিয়ে যাবে না।

—কলেজ?

—হ্যাঁ,— আমার অন্য কারণও ছিল, সেগুলো বলি না।

বসবার ঘরে— অলস ভাবে বসে দাদা একটা সিগারেট ধরাল। বলল —কী ওয়র্মথ আর কী লাইফ তুই কল্পনা করতে পারবি না।

কার আমি জিজ্ঞেস করি না।

—এরা জানে কীভাবে লাইফ এনজয় করতে হয়। বুঝলি? খোলামেলা, দরাজ হাসি। যেমন রোজগার করে তেমন খরচ করে। ফ্যান্টাস্টিক।

আমি চেয়ে থাকি।

—তুই চিন্তা করে দেখ, এরা কিন্তু লাহোরের উদ্বাস্তু। এরই মধ্যে পুরো দিল্লি শহর এদের দখলে। মানে, ডমিনেটেড বাই পঞ্জাবিজ। ড্যাশিং পিপল, অনেক কিছু শেখার আছে...

এতক্ষণে আমি বলি— এঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের ঢালাও সাহায্য পেয়েছিলেন দাদা। দিল্লির আশেপাশের অঞ্চল, প্রপার দিল্লিসুদ্ধু কলকাতার মতো ক্রাউডেডও ছিল না তখন।

—ইয়া, দে স্টার্টেড উইথ অ্যান অ্যাডভান্টেজ। রাইট।

একটু চুপ। তারপর সিগারেটে দুটো টান দিয়ে বলল— সমু, আমি কলকাতা ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারি না। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

আমি হেসে বলি— কে বলেছে ফিরে যেতে? যেখানে তোমার কর্মক্ষেত্র সেখানে তো থাকতেই হবে। আজ যদি তুমি ভারতের বাইরে ভাল সুযোগ পাও, যাবে না?

—ব্যাপারটা তা নয়, বুঝলি? এঁরা আমাকে জামাই করতে চাইছেন। সোনু মানে মেয়েটি, ডিভোর্সি। এখন এই পরিস্থিতিতে আমাদের রক্ষণশীল বাড়ি চাইবে না বিয়েটা, তাই না?

—আমার তা মনে হয় না।

—হয় না? সোনুর একটি বাচ্চাও আছে, ছেলে, স্কুলে যায়। পাবলিক স্কুল। ভেরি ব্রাইট। বুঝতে পারছিস সিচুয়েশনটা একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

আমি একটু ভাবিত হয়ে পড়েছিলুম ঠিকই। কিন্তু দাদাকে সেটা জানতে দেওয়া ঠিক মনে করলুম না।

দাদা বলল এই যে বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ওর বাবার, কিন্তু ওর ব্যবসায়ী স্বামীর কাছ থেকেও ও অ্যালিমনি বাবদ এককালীন থোক টাকা নিয়ে নিয়েছে বুদ্ধি করে। ইনভেস্ট করেছে। ভাল ভাল শেয়ার। শী ইজ কোয়াইট রিচ।

আমি চেয়ে আছি।

দাদা খুবই অস্বস্তিতে পড়ল। প্রশ্নের উত্তরে কথা বলা যত সহজ, প্রশ্নহীনতার মুখোমুখি ততটা নয়।

বলল— তুই কি রাগ করছিস?

—না তো! তুমি বলছ আমি শুনছি।

—আসলে ওদের একটা শর্ত আছে। ওরা চায় বিয়েটা কোয়ায়েটলি এখানেই হয়ে যাক। এবং এই বাড়িতেই আমাকে থাকতে হবে। কিন্তু বাড়ি বা সম্পত্তির ওপর সোনুরই অধিকার। আমি যেন না ভাবি এই বাড়িতে আমার আত্মীয়স্বজনকে... মানে...রাখতে-টাখতে পারব।

—বিয়ের সময়েও আমরা কেউ উপস্থিত থাকতে পারব না? — আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলি, —এ কেমন শর্ত!

—না না, বিয়েতে অবশ্যই যে যে পারবে উপস্থিত থাকবে। যার

যার সুবিধে হবে। ধর দাদু তো পারবেন না। মা-বাবা এঁদের পক্ষেও তো সম্ভব নয়। ধর তুই, ফিনকি। তোরা...

আমি দাদার সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। খোলামেলা কথা কোনওদিন দাদার সঙ্গে বলিনি। বাড়িতে টাকা-পয়সা পাঠাবে কি না, এটাও জিজ্ঞেস করতে পারলুম না।

—রাতে ঘুম হয়নি। আমি একটু ঘুমোতে চাই দাদা। এইখানে ডিভানেই আমার হয়ে যাবে।

—শিওর, একটু ঘুমিয়ে নে, তারপর বিকেলবেলা তোকে দিল্লি দেখিয়ে আনব। কালকেও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কিন্তু ওঁরা তো এটা চান না!

—কী?

—এই যে তোমার পরিবারের কেউ এখানে আসুক!

—ননসেন্স। এই স্পেসটার জন্যে আমি খরচ করছি। তা ছাড়া তোর কথা আলাদা।

—কেন?

—তুই একটা বাডিং এঞ্জিনিয়ার...

আমি একদম চুপ করে যাই।

—ওরা এমনিতে কিন্তু খুবই অতিথিবৎসল। সে সব না। একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে তো। তাই একটু সাবধান।

দাদা আমাকে কুতুবমিনার চত্বর হয়ে লাল কিল্লার সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো দেখাল। ইন্ডিয়া গেট যেতে আসতেই দেখা যায়। শহরের কেন্দ্রে পার্লামেন্ট হাউজ, রাষ্ট্রপতি ভবন হয়ে চাণক্যপুরী দেখে দাদা গ্রেটার কৈলাসের পথ ধরতে আমি বলি— দাদা, রাতের খাওয়াটা কোনও একটা ধাবা-টাবায় খেয়ে নিলে হত না? দিল্লির পরোটাগলির খুব নাম শুনেছি!

—সে তো অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। পুরনো দিল্লিতে। বলবি তো আগে? কিন্তু আজ ডিনারে ওঁরা তোর জন্যে অপেক্ষা করবেন, আলাপ করবেন।

—সো কাইন্ড অব দেম। কিন্তু আমি আর ওখানে ফিরতে চাইছি

না। এখানে কোথাও একটা থেকে নিতে পারব। তুমি যে এই আমাকে গাড়িতে এত ঘোরালে পেট্রলের দামটাও...

—কী বলছিস? পেট্রল আমি দিই! দে নো যে তুই আসছিস। আমাদের বাড়ির প্রতিনিধি। ওঁরা কথা বলবেন তোর সঙ্গে।

এত ক্রুদ্ধ যে আমি হতে পারি আমার জানা ছিল না। বললুম—আমি আমার বাড়ির প্রতিনিধি নই দাদা, হতে পারি না। আমি এসেছিলুম শুধু তোমার ভাই হিসেবে। তোমার কী সব বলবার কথা আছে...শুনতে। শোনা হয়ে গেছে। এবার ওখান থেকে ব্যাগটা নিয়ে আমি চলে যাব।

—সমু, তুই এত রাগ করবি— আমি বুঝতে পারিনি। প্লিজ বি রিজনেবল। আমার কথা থেকে যতটা তোর মনে হয়েছে ওঁরা অতটা ওরকম নন। তুই চলে গেলে ভীষণ ইনসাল্টেড ফিল করবেন!

—আমরা যে কতটা ইনসাল্টেড হচ্ছি সেটা তা হলে তুমি বুঝতে পারছ না! তাতে তোমার কিছু যায় আসে না!

—শোন শোন, তোকে যা-যা বললুম, মানে বাড়ির লোক আসা-যাওয়ার কথা, সে সব ওঁরা ইন সো মেনি ওয়র্ডস বলেননি কখনও। এগুলো আমি জাস্ট বুঝে নিয়েছি।

এত জোর করতে লাগল যে আমি যেতে বাধ্য হলুম। বেশি না না করা আমার কোনওদিনই আসে না।

দাদার ঘরে ঢুকে চান করে একটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরলুম। ভিজে চুল আঁচড়ালুম। বসার ঘরে ঢুকে দেখি এক বিশাল বপু সালোয়ার কামিজ পরা মহিলা খুব জমজমে গলায় কথা বলছেন, তাঁর পাশে একটি বছর আট-দশের ছেলে।

আমি নমস্কার করে দাঁড়িয়ে থাকি।

—বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। আপ তো মেরি বেটা জৈসা। সোনু সোনু! উনি গলা তোলেন, এবং একটি লম্বা-চওড়া লালচে ফর্সা মেয়ে ঘরে ঢোকে।

—নমস্তে।

আমি নমস্কার করি।

মেয়েটির কোনও জড়তা নেই। অভিজ্ঞতার ছাপ মুখটাতে, ব্যক্তিত্ব। এ আমার মেরুদণ্ডহীন দাদাকে চালিয়ে নিতে পারবে। আমার দাদা যোগ্য হাতে পড়ছে দেখে আমি নিশ্চিন্ত হই।

বিনা বাক্যব্যয়ে ডিনার সারতে যাই। দলজিৎজি স্ত্রীর মতো অতটা বেঢপ নন। দিল্লি ইউনিভার্সিটির সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন, একটু অহঙ্কার আছে বোধহয়। সরসোঁ কি শাক, দু তিন রকমের আচার, তরকা, শুকনো মাংস, ঘন ডাল। এত রকম পদ। আমার কথা ভেবে ওঁরা ভাতও রেখেছিলেন।

—আপ তো সাগর সে ভি হ্যান্ডসাম হ্যঁায়— সোনু বলল।

—রাইট — তার বাবা একমত হলেন।

দাদা জানাল আমি কীভাবে যোগ-ব্যায়াম করে আমার শরীর তৈরি করেছি।

ওঁরা জানতে চাইলেন— ওঁদের মেয়েকে আমার কেমন লেগেছে।

আমি জানাই খুব ভাল। ওঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করেন বিবাহ-প্রস্তাবে আমার সায় আছে কি না। আমি জানাই আমাদের নিয়ম বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠতম অর্থাৎ আমার গ্র্যান্ডফাদারকে ওঁদের লিখতে হবে। মনে হয় না কেউ আপত্তি করবেন। ওঁরা স্বস্তি পান।

তখন প্রায় ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। দাদা একটু কঠিন স্বরে বলল— তা যদি বলিস, আমরা কী পেয়েছি ওই বাড়ি থেকে? রাজকুমারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ওখানে জীবন। মায়ের মতো নির্লিপ্ত, ছেলেদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন মা আমি আর দেখিনি। পাগল জ্যাঠামশাইয়ের খরচ কেন আমাদেরই বইতে হবে? কাকার মেয়ের ভারই বা কেন আমাদের? দুই বুড়ি তো চিরটাকাল দাদুকে আর মাকে এক্সপ্লয়েট করে গেল। এখন আমাকেও করছে। দাদুকে বলিস টাকাপয়সার জন্যে কাকাকে ওঁর লেখা উচিত। কোনওক্রমে রান্না, একটা মুখে দেবার মতো জিনিস নেই, ওটা একটা হানাবাড়ি। তুই যা-ই-ই মনে করিস আমি ওখানে আর ফিরছি না। তুই-ও যত তাড়াতাড়ি পারিস কেটে পড়। রাজকুমার বুঝুক!

সারারাত ঝমাঝ ঝম করে গাড়ি চলে। বাইরে ভেতরে। একটু ঘুম আসে, আবার চলতি স্টেশনের আলো চোখে পড়ে, ভেঙে যায় ঘুম। তারপর শেষ রাতে ঘোর নিদ্রা আমায় অধিকার করে। ভাবনা, চিন্তা, রাগ, দুঃখ সমস্ত লয় পেয়ে যায়, এক সমৃদ্ধ প্রশান্তির মধ্যে আমি জেগে উঠি এবং মাটিতে পায়ের সামান্য ধাক্কা দিয়ে শূন্যে উঠে যাই। পাখা নেই, তবু মহানন্দে উড়তে থাকি। নীচে বাড়িঘর, ট্রেন, ট্রাম, বাস, মানুষের ভিড়, পুকুর, হ্রদ এবং সমুদ্র। আমার পায়ের সামান্য তলায় গজরাচ্ছে সমুদ্র। যেমনটা বয়স্কাউটের দলের সঙ্গে পুরী গিয়ে দেখেছি। ফুঁসে উঠছে ঢেউয়ের সাদা পাগড়ি। এক্ষুনি বুঝি ছুঁয়ে ফেলল। কিন্তু আমি শূন্যেই পায়ের একটা ধাক্কা মারি। গিয়ার বদলে উঠে যাই আর একটু ওপরে। চন্দ্রতারকাহীন মহাকাশ এবং অকূল সাগর। কোথা থেকে একটা আলো আসছে। মৃদু। এ কি আমাদের ঘরের রাত-আলো? জানলার বাইরে থেকে ঢুকে পড়া রাস্তার আলো? সূর্য গ্রহণের সময়ে একটা না-আলো না-আঁধার নেমে আসে চরাচরে। এ কি সেই? আকাশ এবং সাগর নিয়ে আমার কোনও প্রশ্ন নেই। তাদের অবস্থান এবং দুইয়ের মাঝখানে আমার ওড়া যেন একরকম স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আলোটার উৎস এবং প্রকৃতি নিয়ে আমি ভেবে চলেছি। উড়তে উড়তে ভেবে চলেছি। এমন একটা রহস্য এটা যা আমায় ভেদ করতে হবে।

বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত এই ঘোর আমার ছিল।

## ৮

বাড়িটা তিন রাস্তার মোড়ে অর্থাৎ কোণে। দুটো রাস্তা থেকে সোজা আমাদের কোনাচে বাইরের ঘরের অন্দর দেখা যায়। একজন বৃদ্ধ, সাদা ফতুয়া, সাদা লুঙ্গি পরে বসে রয়েছেন। বহুদূর পারাপার পার হয়ে একটা মহাজাগতিক ছবি এসে পৌঁছচ্ছে আমার কাছে অনেক আলোকবর্ষ পরে। কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়া, লয় পেয়ে যাওয়া ছবি নয়। এ

ছবি স্থির হয়ে আছে অনেক দূরে। বার বার কাছে পৌঁছচ্ছি আবার হারিয়ে ফেলছি। দাদু কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? সোজা গিয়ে ঘরে উঠি।

—দাদু!

দাদু আমার দিকে তাকান। দৃষ্টিতে কোনও উৎসাহ নেই। আমি ব্যাগটা রেখে মুখোমুখি চেয়ারে বসি।

—সমু!

—বলো। তোমার কী হয়েছে?

—কী হয়েছে সেটাই বুঝতে পারছি না।

—শরীর খারাপ?

—না।

—মন? দাদু, দাদার জন্যে মন খারাপ?

—না। কোনও রকম মন খারাপ নেই ; সেটাই অদ্ভুত। ... আমার বিরাশি কমপ্লিট হয়ে গেল সমু। যে রকম জোরের সঙ্গে সবকিছু মুঠোয় করে রেখেছিলুম, সেই ... মুঠোটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। তুমি দিল্লি থেকে যে খবর এনেছ, যা-ই এনে থাকো, আমায় না বললেও চলে। কিছু এসে যাবে না।

কী গভীর অভিমান থেকে দাদু কথাগুলো বলছেন অনুভব করি। প্রসঙ্গ ঘোরাই।

—বেশ ভাল লাগলো ওঁদের। ওই অরোরাদের ... যাঁদের মেয়ের কথা দাদা তোমাদের আগেই জানিয়েছে। ওঁরা তোমাকে চিঠি লিখবেন। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে চায় দাদা, ওখানেই।

দাদু কেন জিজ্ঞেস করলেন না। আমার মনে হল এখানে বিয়ে হওয়ার মূল অসুবিধেটা ওঁকে জানিয়ে দেওয়া ভাল।

—আসলে দাদু, মেয়েটি ডিভোর্সি। ওঁরা চান না এ নিয়ে কোনও কথা উঠুক।—ঘটা পটা আনুষ্ঠানিক বিয়ে ইত্যাদি ওঁরা কিছুই তাই চান না।

—বেশ।

মা এসে ঢুকলেন — ও তুমি এসে গেছ? কী হল?

আমি শুধু কথাগুলো আবার বলি।

কিছুক্ষণ পরে মা বললেন— আজকে একটা প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি হবে বাবা।

—হোক। কিছুতে কিছু এসে যাবে না। সমু একটা কাজ করবে?

—বলো!

—আমাকে দুটো জিনিস খাওয়াবে?

অবাক হয়ে বললুম— কী?

—ফুচকা আর আইসক্রিম। দিদিভাই খুব ফুচকা খায়, কী এমন জিনিস, একটু চেখে দেখব। আর আইসক্রিম। বহুদিন বহু অভ্যাসে সংযত খাওয়া-দাওয়া করেছি। হঠাৎ হঠাৎ আইসক্রিমের গন্ধ পাই। ওইখানটা একটু বাকি আছে।

শেষ কথাটার মানে বুঝলুম না। মা খুব চিন্তিত চোখে চাইলেন, একবার আমার দিকে, একবার দাদুর দিকে।

মায়ের দিকে চাইলেন দাদু। —আমার ইচ্ছে হয়েছে বললুম। তোমাদের ইচ্ছে না হয়— দিয়ো না।

যখন আনলুম আইসক্রিম দু-তিন চামচ খেয়ে বললেন কোনও বিশেষ স্বাদ তো টের পাচ্ছি না। সমু, আমাদের অল্প বয়সে আইসক্রিমের খুব ভাল স্বাদ-গন্ধ ছিল। ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলিয়া বোধহয়। তা ছাড়া মালাই-বরফের খুব চল ছিল। সিদ্ধি দেওয়া, হালকা সবুজ, বুঝলে? কে জানে তারই গন্ধ পেলুম কি না। তফাত করতে পারছি না।

ফুচকা খেয়েও দাদু কিছু তফাত করতে পারলেন না। বললেন— তোমার খই দুধের সঙ্গে এই দিদিভাইয়ের ফুচকার কিছু তফাত বুঝছি না। আমাদের যৌবন বয়সে, বুঝলে সমু, হাতে ছোট বালতির উনুন ঝুলিয়ে পকৌড়িঅলা যেত, আর তোমার বাবাদের সময়ে পাওয়া যেত লড়াইয়ের চপ। সেসব খেলে দিদিভাই আর এসব আনতাবড়ি জিনিস খেতে চাইত না।

দাদু নীচের ঘরে একলা থাকেন। পাশের ঘরে দুই দিদা। আমি

মাকে বলি ক্যাম্পখাটটা আমি দাদুর ঘরে পেতে নিচ্ছি। আজ এখানেই শোব।

গভীর রাতে দাদু বললেন— সমু ঘুমোলে?

—না দাদু।

—তোমায় কটা কথা বলি।

—বলো।

—যতদূর মনে পড়ছে বলি। আমি খুব সম্ভব খুব স্ট্রাগল্ করে আমার জায়গায় পৌঁছেছিলুম। আমার দাদারা হঠাৎ পরপর মারা গেলেন। তোমার জ্যাঠা খুব বড় স্কলার ছিলেন। উনি কাউকে ভালবেসেছিলেন, মেয়েটি ওঁকে ঠকায়, সেই থেকে মাথার গোলমাল হতে হতে একেবারে উন্মাদ। কিন্তু এখন উনি একরকম ভাল হয়ে গেছেন। ভায়োলেন্স আর নেই। খুব নিরীহ। ওঁকে আমাদের নিয়ে আসাই উচিত। তোমার কাকা এখন কানাডায়, তার দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলেও। অন্যটি দিদিভাইয়ের থেকে বছর চারের ছোট। তাকে নিয়ে তোমার কাকা খুব মুশকিলে পড়েছে। এখন চাইছে দিদিভাই ওখানে গিয়ে থাক। আমার মনে হয় ও মরিয়া হয়ে দিদিভাইকেও এরপর লিখবে। তোমাকে খুব সম্ভব একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। দিদিভাই এখনও এত বড় হয়নি যে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারবে। তুমি ওকে সঠিক পরামর্শ দিয়ো। একটা ইমোশন্যাল আপহিভ্যাল হবে। আমার বয়সে পৌঁছলে বুঝবে তার কোনও সত্যি মূল্য নেই। তোমরা, আমার দুই ছেলে, বউমা, দুই নাতি, কাউকে ভালবাসনি। বড্ড আলগা। তোমার দাদা ভালবাসবার লোক খুঁজে পেয়েছে বলে আমি নিশ্চিন্ত। বড় ছেলেটি ভালবেসে কষ্ট পেল, আর বাকি সবাই না ভালবেসে। ফিনকিই একমাত্র আশা তোমাদের।

দাদু চুপ করে গেলেন।

পরদিন হস্টেলে চলে গেলুম। আমার ফাইন্যাল সেমিস্টারের পরীক্ষার দিনে রাত এগারোটা নাগাদ ফোন এল দাদু চলে গেছেন। খুব ভোরে, নিঃশব্দে, আমার পরীক্ষা ছিল বলে আমাকে খবর দেওয়া হয়নি।

# ৯

তা হলে এই! দাদুর শেষ উপলব্ধি যদি ঠিক হয় তা হলে একদিকে স্বার্থপরতা আরেক দিকে শুকনো কর্তব্যপরায়ণতার উত্তরাধিকার আমাদের। কাকা চলে গেছেন, দাদা চলে গেল, বাবা থেকেও নেই। কিন্তু কর্তব্য, শুধু শুকনো কর্তব্য? এ সব কথা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া শক্ত। মা? দাদাও মাকে উদাসীন বলেছিল। আমি দেখেছি মায়ের সুখদুঃখের অনুভূতি দৃশ্যত কম। ভেতরটায় কী? স্বল্পবাক মানুষের ভেতরটা জানা কঠিন।

কাকার চিঠি। গোটা চারেক। দাদুর ক্যাশবাকসো থেকে নিয়ে পড়ি। একই কথা। ছেলে এখন হাইস্কুল। তাঁর চাকরি খুব কম সময় দেয় তাঁকে। ফিনকি এলে সব দিক রক্ষা হয়। আমরাও বাড়ন্ত একটি মেয়ের দায় থেকে বাঁচি, কাকারও সুবিধে হয়।

জ্যাঠার অ্যাসাইলাম থেকে চিঠি। তাঁদের ফিজ বাড়ছে, তা ছাড়া দেবকুমারবাবু ভাল আছেন। ওঁকে আমরা নিয়ে আসতে পারি।

এ চিঠিটা দেখাই বাবাকে।

—এত ফিজ তো আর দেওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে সরকারি গারদে রাখবার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

—কিন্তু দাদু বলেছেন ওঁকে নিয়ে আসতে।

—বাবার ভীমরতি ধরেছিল। এসব ঝামেলা বাড়িতে ঢোকাতে নেই।

—তুমি একবার না হয় দেখে এসো— আমি বলি।

—আমি খুব নার্ভাস হয়ে যাই এসব ব্যাপারে সমু। দেখতে হয় তুমি দেখে এসো।

—মা, কী করব!

—তোমার দাদু যা বলে গেছেন তাই করা উচিত। ভাসুরঠাকুরের ওপর আমাদের কিছু কর্তব্যও তো আছে!

সুতরাং দক্ষিণ শহরতলি প্রান্তে সেই অ্যাসাইলামে আমি যাই। চতুর্দিকে কোল্যাপসিবল গেট। দারোয়ান। আমাকে ওয়েটিং রুমে

অপেক্ষা করতে বলা হয়। ঘরটা বেশ বড়, উঁচু সিলিং-এর। টেবিল চেয়ার নিয়ে একদিকে গম্ভীর মুখ এক ভদ্রলোক ফাইল খুলে বসে আছেন। এত শক্ত মুখ কেন ওঁর? পাগল সামলাতে কী কী লাগে? গায়ের জোর, দৃঢ়তা দরকার, বুঝি। কিন্তু দরদ? একটু সমবেদন নরম মুখ, শান্ত আশ্রয়শীল ব্যবহার লাগে না এসব? সাতপুরনো জাবদা খাতার মতো এমন মুখ?

চারদিকে পিঠ তোলা কাঠের বেঞ্চি পাতা। ব্যবহারে ব্যবহারে তেলতেলে হয়ে আছে।

আমার সামনেই দু' তিনটে 'কেস' ঢুকে গেল। রীতিমতো জবরদস্তি করে নিয়ে গেল দু' তিন জন লোক। সবাই উর্দিপরা। চোখ লাল, বিড়বিড় করছে মানুষটি। আমার চেয়ে হয়তো সামান্য বড় হবে। ও কি বুঝেছে? এই পৃথিবী এই সব মানুষ খুব অন্যরকম? ওর সঙ্গে মিলছে না? কে জানে হয়তো ও-ই ঠিক। ওর ভাষা কেউ বুঝছে না, তাই...। না, দেবকুমারকেও নিশ্চয়ই এমনি ভাবেই নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন মানুষের ওপর। গ্রহান্তরের কোনও ব্যাপার—ছিল না তো!

অন্য দুজন নিশ্চুপ। কোনও প্রতিরোধ নেই। নিজেদের অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যা হয় হোক। তবে যা হয় হোক। এক ব্যাখ্যাতীত হতাশা সমস্ত শরীরে। হাতে পায়ে স্বাভাবিক অথচ আচরণে আলাদা মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে মনে হল ওরা কিছু একটা মেলাতে পারেনি। কোনও অঙ্ক। ওদের দুয়ে দুয়ে চার হয়নি। প্রাণপণে হাতড়েছে, হাতড়েছে। এখন হতভম্ব হয়ে গেছে—তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর কী? উত্তর যদি না-ই থাকবে তবে প্রশ্ন কেন?

শীর্ণ এক ভদ্রলোককে নিয়ে আসে গার্ড। পাজামা আর ফতুয়া পরা। এক মাথা পাকা চুল। চোখে খুব ভীত দৃষ্টি। দাদুর সঙ্গে, আমার বাবার সঙ্গে, এমনকী আমার সঙ্গেও মিল স্পষ্ট। আমি এঁকে জীবনে সেভাবে দেখিনি। আমার পুরো জ্ঞান হবার আগেই ইনি স্থানান্তরিত হয়েছেন। দাদা দেখেছে, দাদার এঁর সম্পর্কে স্মৃতি খুব তিক্ত।

—বাবা কই? বাবা? ভদ্রলোক দিশেহারা ভাবে বললেন। তারপর আমার দিকে চোখ পড়ল।

—রাজ, তুমি এসেছ? —এগিয়ে এসে খুব আদরে উনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। একটা অস্বস্তিকর গন্ধ। আমি শক্ত থাকবার চেষ্টা করি। তার মানে বাবার চেহারা ওঁর মনে আছে।

—এখানে এরা আমাকে রোজ চারাপোনা খেতে দেয় রাজ, আমাকে দিয়ে জামাকাপড় কাচায়, একটা লোককে সারাক্ষণ হাত-পা টিপে দিতে হয় আমায়। জানো ভাই, আমার ঘরে একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ভয়ে মরি। পুলিশ-টুলিশ! যত বলছি আমি কিছু করিনি বিশ্বাস করছে না। —উনি কাঁপতে থাকেন। আমি ওঁকে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিয়ে দিই। বলি— আপনি বাড়ি যাবেন?

—বাড়ি? উনি অবাক হয়ে তাকান — আমার বাড়ি আছে?

—আছে।

—তা হলে এদের এই অত্যাচার থেকে আমায় বাঁচাও ভাই। নিয়ে চলো। বাবার কাছে।

একটু অপেক্ষা করি, তারপর বলি— আমি কিন্তু আপনার ভাই রাজকুমার নই। আমি আপনার ভাইপো। আমার নাম সমুদ্র।

উনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকান। —আমার ভাই কি বেঁচে নেই?

—না না, উনি আছেন।

—বাবা? বাবা আসেনি কেন?

একটু চিন্তা করতে হয় আমাকে। খবরটা এখানে দেব, না বাড়িতে গিয়ে দেওয়া ভাল? বাড়িতে গিয়ে যদি প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়, তো আমরা কি সামলাতে পারব? এখানে যদি বলি— ওঁর রাতটা খুব যন্ত্রণায় কাটবে। কিন্তু এখানে অন্ততপক্ষে সামলাবার লোক আছে। আমি আস্তে আস্তে বলি— দাদুর তো অনেক বয়স হয়ে গেছে। একাশি-বিরাশি পার।

—বাবার বয়স? একাশি? বিরাশি? তাতে কী হয়েছে! বাবাই তো আমার দেখাশোনা করেন!

তখন আমি বলি— এখন আপনি ভাল হয়ে গেছেন। আর আপনাকে দেখাশোনা করতে হবে না। আপনি নিজেই পারবেন। পারবেন না?

উনি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চান।

আমি বলি— এত বয়সে কি আর কেউ বেঁচে থাকে জেঠু! দাদু কিন্তু মারা গেছেন।

—অ্যাঁ? আঁক করে উঠলেন। তারপরে চুপ করে গেলেন, একেবারে চুপ। মুখের কালি গাঢ়তর। চোখে যন্ত্রণার ছাপ।

—আমার জন্যেই। আমি বাবাকে কষ্ট দিয়েছি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

একসময়ে ওঁর কান্না থেমে গেল। জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছলেন উনি। আমি বললুম— জেঠু আপনি এখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দাদু বলে গেছেন— এবার থেকে আপনিই আমাদের দেখবেন। আপনিই অভিভাবক।

—তোমরা জানো না আমার মাথা খারাপ?

—মানুষের কত রকমের অসুখ হয়, আবার সেরেও তো যায়! এঁরা খবর দিয়েছেন আপনি একেবারে সেরে গেছেন। ওষুধপত্র খেতে হবে অবশ্য। নিয়ম করে ...

—চলো তা হলে যাই — উনি উঠে দাঁড়ালেন।

—আমি কালকে আপনাকে নিয়ে যাব। আপনার ঘর-টর ঠিক করতে হবে তো?

—ঠিক নিয়ে যাবে তো? —করুণ সুরে উনি বললেন।

—ঠিক — আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি।

বাবা সেদিন রাতে খেলেন না। সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ হতে লাগল ধম ধম ধম ধম। মায়ের দিকে তাকিয়ে খুব খারাপ লাগল। এঁর ভার দুর্বহ। সারা জীবন ধরে বইছেন, আমি আরও ভার চাপাতে চাইছি। আমার উপায়ই বা কী!

ফিনকির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলি।

—তোর কি ভয় করছে?

—কামড়ে দেবেন না তো!

—না, সেরকম কিছু নয়।

—জেঠুর কথা কখনও শুনিনি কেন রে ছোড়দা?

—কী জানি, আনপ্লেজেন্ট বলে তোকে কেউ বলেনি হয়তো!

—ঠিক করেনি। আমার কিন্তু সত্যিই খুব ভয় করছে। ওঁকে হাসপাতালেই রাখলে ভাল হত না?

—ফিনকি, এখন আর হাসপাতালের খরচ চালাবার সাধ্য আমাদের নেই। আর ওঁর দিকটাও ভেবে দ্যাখ, উনি ভাল হয়ে গেছেন। এখন অ্যাবনর্ম্যাল লোকেদের সঙ্গে থাকা কি খুব ভয়ানক নয়?

—আমাকে যত শিগগির সম্ভব পাশ-টাশ করে একটা চাকরি করতে হবে। বুঝলি ছোড়দা!

—যত শিগগিরই হোক, যা সময় লাগার তা তো লাগবেই — আমি হেসে বলি, তারপর ওর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলি— তোর অবশ্য একটা বিকল্প আছে।

—বিকল্প? মানে?

—মানে, কাকা তোকে কানাডা নিয়ে যেতে চাইছেন। ওখানে তুই অনেক ভাল ভাল সুযোগ পাবি। ধর তোর জীবনটাই বদলে যাবে।

—হঠাৎ? ওর ভুরু কুঁচকে গেছে।

—হঠাৎ-ই। আসলে কাকিমা আর ওঁর ছোট ছেলে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। বাড়িতে উনি আর ওঁর বড় ছেলে। তাই ...

—তাই বলো! —ঠোঁট বেঁকে গেল ওর — স্বার্থ। কিছুদিন পরে দাদার যখন অসুবিধে হবে, ধর বাচ্চাকে কার কাছে রেখে যাবে, দুজনেই চাকরি করে, তখনও আমি এরকম একটা অফার পেতে পারি। তাই না?—আমি হাসি।

—তোকে ছেড়ে, মা-বাবাকে ছেড়ে, দিদুদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

—বিয়ে হয়ে গেলে?

— সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। আপাতত আমি এখান থেকে নড়ছি না।

পরদিন ফিনকিকে সঙ্গে নিয়ে জেঠুকে আনতে গেলুম।

দাদুর ঠিক ওপরের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। চারিদিকে দাদুর ছবি, ওঁর যৌবনের ছবি, বাবা উনি আর কাকা একসঙ্গে, স্কুল বয়, পাশ করে সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, উজ্জ্বল চেহারা, যত পারি দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়েছি, টেবিলের কাচের তলায় কিছু। ভেবেচিন্তে। চেনা মানুষদের চেনা চেহারা তো আর জীবনে দেখতে পাবেন না। অচেনা ফাঁকগুলোর মধ্যে চেনাগুলো যদি ফিট করে দেওয়া যায় তা হলে হয়তো একটু সহনীয় হবে নতুন জীবন।

সবই অবশ্য করেছে ফিনকি। আমি বলেছি, ও করেছে। ছবি সাজাতে সাজাতে বলল— মাঝখান থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হারিয়ে গেছে, ছোড়দা, কী ভয়ংকর না?

খুব সংকুচিত হয়ে ট্যাক্সির এক ধারে বসে উনি বাড়ি এলেন। ঘরের মধ্যে যে ঢুকে গেলেন, বাস। দিদারা কান্নাকাটি করে জড়িয়ে ধরলেন, মা প্রণাম করলেন, পা কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উনি। তারপর ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্ত।

আর ঠিক তিনদিন পরে আমাকে অফিস জয়েন করতে হবে। বেশির ভাগই পেয়েছিলুম কলকাতার বাইরে। কিন্তু সেগুলো নেওয়ার পরিস্থিতি নেই।

এই যে কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিলুম, এগুলো কি আমার? না কি দাদুর? দাদার কথা শুনতে দিল্লি যাওয়া, জেঠুকে নিয়ে আসা, ফিনকির কাছে কানাডা যাবার প্রস্তাব রাখা, এবং এই দূরে চাকরি না নেওয়া! দাদুকে অনুসরণ করেছি, ঠিকই। কিন্তু আমি তো মানতে না-ও পারতুম। বাবা তো আমার সঙ্গে কথাই বলছেন না। দিদারা সিঁটিয়ে আছেন। অশান্তি কে চায়? মা যন্ত্রের মতো তাঁর কর্তব্যের রুটিন পালন করে যাচ্ছেন। দাদুর জায়গা নিয়েছেন জেঠু। সেই বারবার খাবার দিয়ে আসা, বসা, নিয়ে আসা, প্রতিদিনের জামাকাপড় গুছিয়ে রেখে আসা, ছাড়া কাপড় কাচতে দেওয়া। দাদুর সঙ্গে মায়ের কথোপকথনের মধ্যে যে উদ্দীপক অংশটুকু ছিল সেটা শুধু আর নেই। জেঠু সসঙ্কোচে চুপ করে থাকেন।

প্রথম রবিবারে আমি নিজের খাবার থালা নিয়ে জেঠুর ঘরে যাই। টেবিলের কাচের ওপর দুটো থালা রাখি খবরের কাগজ বিছিয়ে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন উনি। আমি লক্ষ করি না।

বলি— জেঠু আমাদের রান্না আপনার ভাল লাগছে?

অনেকখানি ঘাড় নাড়েন উনি।

—কী কী ভালবাসেন?

—সব। তোমার মা যা দ্যান ...। উনি চারাপোনা দ্যান না। খেসারির ডাল দ্যান না।

এগুলো হাসপাতালে দিত বুঝতে পারি। সম্ভবত রোজ।

—আমি কিছু করি না।

—খান। এই দেখুন আপনার সঙ্গে খাব বলে আমার থালা নিয়ে এসেছি।

—রাজ আসে না। ও বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ। আসলে বাবার অফিসে ভীষণ কাজ পড়েছে।

—আমরা দুজনে সিনেমা দেখতে যেতুম। মহল, কবি, গ্যাসলাইট, জোন অব আর্ক, আমরা একই ক্লাবে খেলতুম।

—কী খেলতেন জেঠু? কী নাম আপনাদের ক্লাবের?

—বন্ধুদল। সব রকম খেলা। টেনিস ছাড়া সব। রাজ ইনডোর ভালবাসত। ক্যারম। ওপরে আলো টাঙিয়ে— জেঠু ওপরে হাত দ্যাখান। —এখন খেলে? ক্যারম? চেস?

—কী জানি! আপনি জিজ্ঞেস করবেন।

—না, না, আমি সে পারব না। তুমি জিজ্ঞেস করো। তুমি সাগর, না?

—আমি সমুদ্র, জেঠু। সাগর দিল্লিতে থাকে।

—মেয়েটি কে?

—আমার বোন, ফিনকি।

—ভাল মেয়ে?

—খুব ভাল।

আমি অফিস যাই। ফিনকি কলেজ যায়। বাবা অফিস যান।

বাড়িতে দুই বৃদ্ধা এক মানসিক রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের দায়িত্ব একলা মায়ের ওপর। প্রতিদিন যাই অপরাধবোধ নিয়ে, প্রতিদিন ফিরি অপরাধবোধ নিয়ে। দেখতে পাই ফিনকি আস্তে আস্তে জেঠুকে ওষুধ খাওয়ানো, তাঁকে একটু-আধটু সঙ্গ দেওয়ার কাজটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রাত্তিরে ঠিক ন'টার সময়ে খাওয়া-দাওয়া হলে ওঁকে ঘুমোতে দেওয়া হয়। বাবা ফিরলে বাবা আর ফিনকি খেতে বসে, আমি মায়ের সঙ্গে বসি। বাবার খাওয়ার সময়টা আমি অনেক সময়েই দিদাদের ঘরে একটুখানি বসি। খুব নিপাট পরিষ্কার চন্দনের গন্ধ বেরোয়। একদিকে দেয়ালে গাঁথা ছোট্ট একটু তাক মতো। তার ওপর বালগোপালের রুপোর সিংহাসন। দুটো খাটে দুটো কম্বলের আসন পাতা। ওখানে বসে ওঁরা জপতপ করেন। দুজনেই নিঃসন্তান, আমাদের ছোটবেলা কেটেছে মোটামুটি ওঁদেরই তত্ত্বাবধানে। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি ওঁরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। আমার নিজের ঠাকুমা হলে কি পারতেন? কেন এমন হল? ওঁরা যেন এ পরিবারের কেউ নয়। আমি যদ্দূর জানি দুজনেই উইডো পেনশন পান। তাতে দাদু কোনওদিনই হাত দেননি। মাঝেমধ্যে নিজেদের ইচ্ছেয় সংসারের জন্য কিছু খরচ করেন, উপহার দেন। মাকে পুজোয় একটা শাড়ি, আমাদের পাশ করবার পর একটা কলম। দাদাকে হাতঘড়ি দিয়েছিলেন। ফিনকিকে ছোটবেলায় ফ্রক কিনে দিতেন। এখন কি দ্যান? আমি জানি না। এসব কথা আমার মাথায় আসেনি এতদিন। দাদার কথা, দাদুর কথা, মায়ের ভাবনা এইসব থেকে ইদানীং আসছে। ভাসমান দুটি দ্বীপ। অনেক দিন দেখেছি বাবার খাওয়ার সময়ে দুজনের একজন গিয়ে বসেছেন। কিন্তু বাবার নিত্যদিনের চেঁচামেচি বোধহয় সহ্য হত না, আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি এই জলধির নির্জন দ্বীপগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করে যাই। দুই দিদা, জেঠু, এমনকী মা ...। আমরা সবাই কি এক জায়গায় বাস করি? বোধ হয় না। এক বাড়ি, কিন্তু আলাদা ঘর, প্রত্যেক ঘরে ঢুকতে হাওয়া নিজেকে একটু পাল্টে নেয়। এ যেন পান্থনিবাস। একসঙ্গে অথচ আলাদা আলাদা আমরা কোথায় চলেছি?

হঠাৎ শুনি— খাবার ঘরে যেন একটু জোর গলা শোনা যাচ্ছে। দুই বৃদ্ধা চকিত হয়ে উঠলেন। গলাটা কিন্তু বাবার নয়। একটু শুনে বুঝতে পারি ফিনকির।

—এর কোনও মানেও হয় না, ক্ষমাও হয় না —ফিনকি বলছে। ওর কানের রিং দুলছে। গাল চকচক করছে। এক হাত দিয়ে ওড়নাটা পিঠে ফেলল। ও বাবাকে একটুও ভয় বা সমীহ করে না।

—আমার যদি ইচ্ছে না হয় ... বাবার গলার স্বর এমনিতেই গম্ভীর। এখনও গম্ভীর শোনাল। কিন্তু তার ভেতরে কোথাও একটা দুর্বলতা আছে। ফিনকির ক্রুদ্ধ মূর্তির সামনে বাবা নিরস্ত্র।

—আমারও যদি ইচ্ছে না হয় তোমার সঙ্গে এরকম গল্প করি, মায়ের যদি ইচ্ছে না হয় প্রতিদিন তোমার ফরমাশ খাটতে, ছোড়দার যদি ইচ্ছে হয় দাদার মতো বিদেশে চাকরি নিতে ...

—মানে? সমু কি অন্য জায়গায় ...

—ছোড়দা জামশেদপুর কি বম্বে গেলে অনেক বেশি মাইনে পেত। যায়নি। কেন সেটা তোমার বোঝা উচিত। সবাইকার কথা ভেবে কিছু কিছু জিনিস অনিচ্ছাসত্ত্বেও করতে হয়। জেঠু আজও তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। উনি ভাবছেন উনি কাজকর্ম করেন না বলে তুমি রাগ করেছ। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি বাবা, রোজ তোমার ওই একঘেয়ে গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে না, লাগে না, লাগে না। শুধু তোমার ভাল লাগবে বলে শুনি।

মায়ের গলা শুনি— আঃ, ফিনকি!

—কাল থেকে আর শুনব না। আসব না। আমার কী দরকার! তা ছাড়া ইচ্ছে হলেই তো আমি কানাডায় চলে যেতে পারি।

—অ্যাঁ? বাবা একটা ফ্যাঁসফেঁসে চিৎকার করলেন।

—হ্যাঁ, কাকা আমাকে অফার দিচ্ছেন, আমি যেতেই পারি, আমার জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যাবে।

হাতে গরস বাবা, লুচির ঝুড়ি হাতে মা স্থাণু হয়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি সেই সময়ে ঢুকি। ফিনকিতে এসে বাবার পথ মায়ের পথ মিলে গেছে। ফিনকিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

—আমার ভয় করে। সে সময়ে দাদার বাই চাপলে আমাকে মেরে পাট করে দিত। পাঁজরে চিড় খেয়েছিল একবার। সমু তুমিই বলো আমার ভয় করাটা কি অন্যায্য?

—কীসের ভয়? —কীসের কথা হচ্ছে, মা?

বাবা বললেন— তোমাদের জেঠুর কথা হচ্ছে। তোমরা তো নিয়ে এসে খালাস। এখন আমাকে জোর করছ কাছে যেতে। আই ডিটেস্ট হিম।

—একবার গেলে হয়তো আর অতটা .... থাকবে না, তুমি গিয়েই দেখ না। আজ জেঠু ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল একবার যেয়ো। ফিনকিকে সঙ্গে করেই না হয় যেয়ো। —আমি খুব হালকা চালে বলি।

—তোমরা আমাকে ... বাবা রাগে আবেগে থরথর করতে করতে উঠে গেলেন। আমি ফিনকিকে বললুম— তুই বাবার খাবার সময়ে কথাটা তুললি কেন?

—আর কখন পাই? এক খাওয়ার পরে ওপরে বাবার ঘরে গিয়ে বলতে হয়। কাছেই জেঠুর ঘর, জেঠুর কানে গেলে কী হবে বল তো! বাবা তো আস্তে কথা বলবে না!

বলে ফিনকি ফিক করে হেসে ফেলল— বাবার খাওয়া প্রায় হয়েই এসেছিল, দ্যাখ একটা মাত্র লুচি পড়ে আছে, বাটিতে একটাই আলুর দম। মা, এবার তোমার পাখির আহার নিয়ে এসো, ছোড়দাও এসে গেছে।

—আমার একটু পড়া আছে মা, উঠি? একটু পরেই ফিনকি উঠে গেল। তখন মা, একটু ইতস্তত করে বললেন— সমু, কানাডার কথা ও কী বলছিল!

—দাদুর বাক্সে কাকার চিঠি পেয়েছি কতকগুলো। উনি ওকে নিয়ে যেতে চাইছেন।

—ও কি জানে?

—না। আমার মনে হয়েছিল অফারটার কথা ওকে জানানো দরকার। ওটা ওর প্রাপ্য মা।

—ঠিকই বলেছ। ওটা ওর প্রাপ্য — কথাগুলো কেমন মন্ত্রের মতো আউড়ে গেলেন মা। মা'র মুখ সাদা হয়ে গেছে। থালার ওপর একটা হাত, থেমে গেছে।

—ও অফারটা নিতে চায়নি মা। ওর ধারণা, হয়তো ঠিক ধারণাই। যে কাকা এখন একটু বিপাকে পড়েছেন, তাই-ই নিয়ে যেতে চাইছেন।

—তা হলে বলল কেন?

—হয়তো বাবাকে ভয় দেখাতে।

—কিন্তু ও যদি জানতে পারে আসল কথাটা ও তো রাগ করতে পারে আমাদের ওপর। তখন? তা ছাড়া নবকুমারের অধিকারটা তো বেশি বটেই।

—মা, সেই আসল কথাটাই এখন নকল হয়ে গেছে। অবান্তর। ওগুলো বলার ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। আর অধিকারের কথা যদি বলো— ফিনকির আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে। এখন ডিসিশন ওর। একটু খেয়ে বলি— যেমন চলছে চলতে দাও। ভেবো না।

—না, ভাবব আর কী! আমার ভাবনার কী-ই বা মানে?

## ১০

দাদু মারা যাবার পর আমার ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চেপেছে, তবু আমার কী রকম হালকা লাগে। কেন আমি বুঝি না। দাদুই ছিলেন আমার একমাত্র বন্ধু। দাদুকে যা বলতে পারতুম, অন্য কাউকেই তা পারতুম না। ঘোর বন্ধন একটা। হস্টেল থেকে বাড়ি আসতুম শুধু ফিনকির জন্যে নয়, দাদুর জন্যেও। দাদুকে বুঝতে দিতুম না। আমার প্রকাশ চিরকালই কম। তবু দাদু হয়তো বুঝতেন, তাঁর প্রকাশ বেশি, কিন্তু তিনিও আমাকে কোনওদিন বুঝতে দ্যাননি যে তিনি আমার টান বুঝেছেন। আর যেহেতু দাদু পুরো পরিবারটার ভাল-মন্দের সঙ্গে অমন নিবিড় ভাবে যুক্ত, তাই দাদুর আগ্রহগুলোতে অংশ না নিয়ে আমি পারতুম না। আর এমনই অন্তর্দৃষ্টি ছিল ওঁর আমাদের বিষয়ে!

কী যেন বলেছিলেন দাদার বিষয়ে— ওর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা কোরো না! কী যেন বলেছিলেন আমাকে — হেরোইন খেয়ে, খারাপ পাড়ায় যাবার পর! —তুমি বড়ো হয়ে গেছ। আর ফিনকি? ফিনকিই একমাত্র আশা তোমাদের। আমাকেও কি উনি ডিসমিস্ করে গিয়েছিলেন? তা হলে শেষ কথাগুলো কেন আমাকে বললেন? আর কেউ বলবার ছিল না, অথচ কথাগুলো বলা দরকার ছিল বলে?

এখন কথাগুলো, দাদুর সে সময়কার আচরণ মনে মনে তোলা পাড়া করি, মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছে। সাইটে আছি। ক্রেন, থিয়োডোলাইট, মিক্সার, স্তূপীকৃত স্টোন চিপস্ ও অজস্র শ্রমিকের মাঝখানে খোঁড়া গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। একটানা আওয়াজ, আমি হঠাৎ বুঝতে পারি ঘটনাটা। দাদু জীবন সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এটা কোনও মান-অভিমানের প্রশ্ন নয়। বাড়ির সকলের উদাসীনতা আত্মপরতার শূন্যতা দাদু নিজের প্রবল আসক্তি দিয়ে সারাজীবন পূর্ণ করে গেছেন। ওঁর মনে হত উনি ছাড়া আর কোনও কাণ্ডারী নেই। ওঁর দাদারা মৃত, দুই বিধবার বিপুল ভার, বড় ছেলে উন্মাদ, তার সমস্ত দেখাশোনা ও আর্থিক দায়িত্ব আর কেউই তো নিতে চায়নি। ভালবাসার সঙ্গে আসে কর্তব্যবোধ। তিনি করেছিলেন, মেজ ছেলের কোনও দায়িত্ববোধ ছিল না। অথচ পরিবার বলতে যা বোঝায় তা তো তাঁরই। ছোট ছেলে স্রেফ চুপচাপ পালিয়ে গেল। পরের প্রজন্মে দাদা অবিকল কাকার পথ অনুসরণ করল। এদের সবাইকার প্রেমহীনতার উল্টো দিকে তাঁর প্রবল ভালবাসা, নিঃশব্দ, নির্বিচার, কিন্তু সবসময়ে সক্রিয়। এই আসক্তিই জীবন। জীবনকে আঁকড়ে ছিলেন তিনি। একদিন কার জাদু ছোঁয়ায় খসে পড়ল আসক্তি। মৃত্যুর আগে যদি এই নিরাসক্তি না আসে তা হলে জীবন ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট! শেষকালটায় তাই দাদুর হৃদয়ে আমরা কেউ, আমাদের কোনও সমস্যার জড় আর ছিল না। আমি ব্যাপারটা টের পেয়েছিলুম। পুরোপুরি বুঝতে পারিনি যদিও। আমার মনে হচ্ছিল— দাদু হঠাৎ বদলে গেছেন, এই বদলটা শুভ নয়। কিন্তু সেই রাতে ওঁর ঘরে আমার থাকায়, হয়তো নয়-নয় করেও কিছু ভাবনা-চিন্তা ওঁর

নিরাসক্ত মনে বুদবুদের মতো ভেসে উঠেছিল। আমি না থাকলে বলতেন না। ছিলুম বলেই জোর করে পরলোক থেকে ফিরে এসেছিলেন। অর্থাৎ দাদু আগেই মারা গিয়েছিলেন।

আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আমার একেবারে বনে না। তার মানে যে ঝগড়া তা নয়। আমি বাইরের আচরণে সৌজন্য, ভদ্রতা সব সময়ে বজায় রাখি। কিন্তু এদের বেশির ভাগই এত ধড়িবাজ, এত পরশ্রীকাতর এবং আদিরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে এদের সঙ্গ আমি আদৌ সইতে পারি না। আমি জানি এরা আমাকে নিজেদের মধ্যে উন্নাসিক বলে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমারও তো ওদের খুব অপূর্ণ লাগে। যেন কোন ফসিল-স্তরে আটকে আছে।

আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার, আমার সমগোত্র আরও জনা সাতেক আছে। কেউ কেউ সামান্য বড়। তিনজন মহিলা আছেন, এঁদের এরা অসম্ভব বিরক্ত করে। এদের মধ্যে একজন, দীপা বেশ একটু রোখা টাইপের। অন্য দুজন জয়ন্তী আর মুকুলিকা চুপচাপ সব হজম করে যায়। এরা সকলেই আমার ব্যাচমেট। তবে অন্য কলেজের। দীপা ছাড়া।

একদিন জয়ন্তী জিজ্ঞেস করল— আপনি পুলককে চেনেন?

আমরা তখন অফিসার্স ক্যানটিনে খাওয়া সারছি। লাঞ্চের পরে আবার ফিরে যেতে হবে চৌরঙ্গিতে। কাজের হিসেব-পত্র নিয়ে অফিসে ফিরতে হবে। এবং রিপোর্ট। চিফ এঞ্জিনিয়ারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবার পর অন্য কোনও কাজ না থাকলে ছুটি।

জয়ন্তীর কথায় আমি হুঁশে ফিরে আসি— পুলক? নিশ্চয়ই। আজীবন আমার ক্লাস-মেট।

—আমার কাজিন।

কোথাও থেকে কেউ বলল— কী পুলক!

জয়ন্তী ডাকল বাকি দুজনকে— দীপা, মুকুল, এদিকে এসো।

আমার টেবিলেই বসল এসে তিনজনে।

দীপা বেশ চড়া গলায় বলল— এখানে বোধহয় বসা যায়, তুমি ঠিকই ধরেছ জয়ন্তী। ইঁদুরের গর্ত-টর্ত নেই।

—বেড়াল আছে — আবারও কেউ বলল।

—ওসব কথায় কান দেবেন না, আমি নিচু গলায় বলি।

—ফিগার ভাল, চৌত্রিশ চৌত্রিশ চৌত্রিশ।

—দেখছেন তো। এতটুকু স্বস্তি দেবে না।

—ইগনোর করুন। কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

—ধ্যাৎ, ঠিক বলিসনি। বাস্টের তফাত আছে, ছত্রিশ তো নিশ্চয়ই, চল্লিশও হতে পারে।

—আবার তিরিশ হওয়াও অসম্ভব নয়।

প্রত্যেকে খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে কথাগুলো বলছিল। কেউ ধরতে পারবে না, দীপা বলল— তুমি বোধহয় আমায় চিনতে পারছ না সমুদ্র, আমি কিন্তু বি.ইরই। এই জাতীয়রা ওখানেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছে।

আমি দীপাকে চিনতুম ঠিকই। দূর থেকে দেখা এক জটলা গাছের মতো। একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যায় না।

বলি— চিনেছি বই কী! কিন্তু সেরকম আলাপ-পরিচয় তো ছিল না!

—সে কী? চেনা ছিল না? জয়ন্তী অবাক।

আসলে, মেয়ে ছিল মোটে চার-পাঁচজন। নিজেদের মধ্যে থাকত একটু ডাঁট নিয়ে। ইলেকট্রনিকস, আর্কিটেকচার-এ ওদের দুগুণ তিনগুণ, কিন্তু সিভল-এ সংখ্যা এরকমই।

—চেনবার মতো চাঁদমুখ থাকলে তো চিনবে। ওদিক থেকে মন্তব্য এল।

দীপার মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। হাত দুটো মুঠো করা।

—নো একসাইটমেন্ট প্লিজ — আমি আস্তে বলি।

—আসলে কী জান, গাঁইয়া তো। শহুরে মেয়ে দেখেনি। বুঝলে সমুদ্র, এখনও রিপোর্টে বানান ভুল করে। বাজে অসভ্যতাগুলোই ছিল ওদের ডিফেন্স।

জয়ন্তী বলল— আমাদের যাদবপুরে গোড়ায় গোড়ায় একটু টিজিং হত বটে, তবে কিছুদিন পরই আর ফারাক থাকত না।

মুকুলিকা বলল— আসলে কী জান ... অনেকেই ফার্স্ট জেনারেশন লিটারেট।

আমি বেগতিক দেখে উঠে পড়ি, বলি— আমাকে এক্ষুনি সাইটে যেতে হবে, নিচু গলায় বলি — তোমরাও প্লিজ বেরিয়ে এসো।

পরদিন পুরো দলটা আমায় ধরল।

—সেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

—-আমার যাত্রা একদম ভাল লাগে না। থিয়েটার সিনেমা বরং পছন্দ হয়। শম্ভু মিত্র আর একবার দেখতে বলো দেখব। কিংবা সত্যজিৎ রায়-তপন সিনহা। এনি থিং।

—ফান বই তো কিছু না, সিরিয়স কিছু তো না!

—দেখো অনিন্দ্য নিজেকে নিয়ে মজা করো কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু অন্যকে নিয়ে ফান ... এসব ছেলেমানুষি অসভ্যতার অভ্যেসগুলো তোমাদের ক্যাম্পাসের ফার্স্ট ইয়ারেই ফেলে আসার কথা। ইটস ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট ইফ ইউ ডোন্ট।

—এটা শুধু মজা নয় সেন, তুমি চিন্তা করো চাকরির এই বাজারে, এত খরচ করে খেটেখুটে পাশ করছি। ওদের কী রাইট আছে আমাদের চাকরিগুলো এইভাবে বাগিয়ে নেবার? — বিজিত বলল।

—ওরা খেটেখুটে খরচ করে পাশ করেনি বলছ?

—দরকারটা কী! সিটটা আটকাচ্ছে তো! বিয়ে করলেই তো ওদের হিল্লে হয়ে যাবে। আমাদের? আমাদের হবে? সেই তো শ্রাবন্তী বলে মেয়েটা বিয়ে বসে গেল। সে তো মাঝপথে? থার্ড ইয়ারে গিয়ে ছেড়ে দিল! একটা ছেলে তো পেতে পারত সিটটা। ছেলেদের ফ্যামিলি দেখতে হয়।

—অনেক সময়ে মেয়েদেরও ফ্যামিলি দেখতে হয় কিন্তু, তুমি দুটোর তফাত কী করে করবে। যে চাকরি দেবে সে যোগ্যতা দেখে দেবে, প্রয়োজন দেখে কক্ষনও দেবে না। ওই জায়গাটায় বরঞ্চ

আন্দোলন করলে একটা কাজের কাজ হয়।

—হুঁঃ আন্দোলন! আমরা ওদের লাইফ হেল করে দেব, তাড়াব।

—চেষ্টা করো। ওরা যদি কমপ্লেন করে তা হলে কিন্তু আমি সঠিক সাক্ষ্য দেব।

—ওরা ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পারবে? ওদের দেখবে বেশির ভাগ ডেস্ক জব দেওয়া হবে এর পর।

—ফিল্ড ওয়ার্ক তো করছে বলেই জানি। আর যদি মেয়েদের শুধু ডেস্ক জব দেওয়া হয়, তখন আপত্তি কোরো। এগুলো কোরো না। এগুলো ঠিক নয়। তোমার বোন কিংবা বউ যদি এই জায়গায় থাকত, তা হলে কিন্তু করতে না।

—ওরা চিফদের পটায়, স্রেফ মেয়ে বলে সুবিধে আদায় করে।

—সেইজন্যেই আরও বলছি কমপ্লেন হলে তোমাদের চাকরি যাবে, খামোখা।

খুব ঠান্ডা গলায় কথাগুলো বলে চলে এলুম। আমি একা ওরা পাঁচজন, ইতিমধ্যেই উন্নাসিক, ডাঁটিয়াল বলে নাম কিনেছি। একটুও উত্তেজিত হইনি আজ। কে আমার ভেতর থেকে কথাগুলো বলল? আমার মনে হল— আমি বলিনি। দরকারের সময়ে, আমার ভেতর থেকে কেউ শীতল যুক্তি সাজায়, তেমন তেমন হলে বৌদ্ধিক প্রতি-আক্রমণ। এই ক্ষমতাটা আমার ছিল বলে আমি জানতুম না। আমি একলা, ভিড় অপছন্দ করি, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না, বলতে কি পুলক দুর্গাপুর চলে যাওয়ার পর আমার একজনও বন্ধু নেই। এ ধরনের অমিশুক লোকেরা একটু পাশ-কাটানো, ভিতু ধরনেরও হয়। আমি তা হলে তেমন নই? নার্ভ নেই আমার, না কী? স্নায়ুকোষ দিয়ে কোনও উদ্দীপক মাথায় পৌঁছয় না? হরমোন বেশি নেই? অ্যাড্রিন্যালিন? আমার ব্রেন সেল গুলো কী অন্যরকম?

দাদার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতেও এই শীতলতা, বা শীতল যুক্তিবোধ আমায় সাহায্য করেছিল। দাদা দাদুর শ্রাদ্ধে এসেছিল। উপস্থিত ছিল, কিছু টাকাও দিয়ে যায়। আমি দিল্লি থেকে ফিরে আসার দিন কয়েক পরেই ওরা রেজিস্ট্রি করে। কিন্তু সোনু আসেনি, বা দাদুর

মৃত্যুর পরও ওদের দিক থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক সান্ত্বনা বাক্যও না।

বাবা উপোস করতে পারবেন না, তাই কাজটা আমাকেই করতে হল। শেষ হলে, একেবারে বিকেলবেলায় অতিথি-অভ্যাগতরা চলে গেলে খুব ক্লান্ত লাগল। অশৌচপালন, লোকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে আমন্ত্রণ। শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা সব করা। পুরোহিত মশায় কিছু আনলেন, কিছু আমাকেই আনতে হল। হালুইকর বামুনের বন্দোবস্ত। সেখানেও বাজারের ঝামেলা। নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে আছি, দাদা ঢুকল। ওর একানে তক্তপোশ এখনও ওধারে। আজকে এক রকম বেড-কভার বালিশ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে ফিনকি।

—তুমি ... তোমরা ... বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছ সমু। বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আমি শুধু তাকাই।

—মানে, এই সবের তো কোনও মানেই হয় না। এ তো টাকার শ্রাদ্ধ ...

—টাকার শ্রাদ্ধ না দাদুর শ্রাদ্ধ ...

আমি আমার কথা অসম্পূর্ণ রেখে দিই।

—টাকাটা যদি দাদুর চিকিৎসায় খরচ হত, তা হলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু এই ভূত ভোজন ...

—প্রচলিত রীতি-নীতির কিছু তো আমাদের মানতেই হয় দাদা। জীবিতকালে দাদুর চিকিৎসায় যে খরচ করতে হয়নি, সেটা আমাদের ভাগ্য, কিন্তু শ্রদ্ধা জানাবার এই রীতিই চালু। কী করা যাবে!

—একটা উচ্চশিক্ষিত ছেলে হয়ে যে তুমি কী করে অন্যের কথায় চলো। অন্যের মতামতকে এতটা গুরুত্ব দাও!

—তুমিও তো তাই করছ, অন্যের মতে চলছ।

—কী ভাবে?

—মজা হচ্ছে তুমি হয় সেটা জানই না আর নয়তো সেটা মানছ

না। না মানাটা বুদ্ধির পরিচয় নয় দাদা, আর যদি না মানো, তা হলেও সেটা খুব পৌরুষের লক্ষণ বলতে পারি না। তুমি অরোরাদের কাছে তোমার আত্মা বিক্রি করে দিয়েছ দাদা। তারা তোমাকে যেভাবে যা করতে বলছে তুমিও তাই করে যাচ্ছ, খুব সম্ভব ইজি লাইফের লোভে। এভাবে যদি নিজের অসম্মান করো, অন্যের মানে এমনকী অরোরাদের সম্মানও তুমি পাবে না।

—একদম বাজে কথা বলছ সমু না জেনে। দে আর ভেরি ভেরি কনসিডারেট। আমাকে এখানে ওরাই আসতে বলেছে, ইনফ্যাক্ট যে টাকাটা দিলুম সেটা সোনুই হাতে গুঁজে দিয়েছে।

—এই তো প্রমাণ হয়ে গেল, তুমি নিজেই প্রমাণ করে দিলে, — আমি হাসি, — যে ওরা যা বলছে তুমি তাই করছ। ভাল হোক মন্দ হোক সিদ্ধান্তটা ওদেরই। আর টাকাটা যদি বউদির হয়, তা হলে ... দাদা ওটা আমি ফেরত দিতে বাধ্য। এই নাও, আমি ড্রয়ার খুলে নোটের বান্ডিলটা দাদার দিকে এগিয়ে দিই।

দাদা রাগে লাল হয়ে গেছে — তুমি আমাকে এভাবে অপমান করতে সাহস করো!

—তুমি যে নিজেই নিজেকে অপমান করলে! সোনু টাকাটা দিয়েছে বললে! মানে যে সোনু বা অরোরা ফ্যামিলি দাদুর মৃত্যুতে একটা চিঠি দিয়েও সহানুভূতি জানানো দরকার মনে করেনি, সে। তারা। তাদের টাকা দাদু কেন নিতে যাবেন? আমিই বা কেন নেব? দাদা ঠান্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখো বুঝতে পারবে, তোমার টাকায় আমাদের ষোলো আনা অধিকার, কিন্তু ওঁদের টাকা হল ভিক্ষার মতন, ওটা নিতে পারি না।

— এর পরে কিন্তু আমার থেকে আর কিচ্ছু আশা কোরো না সমু। দাদা এখনও লাল, কিন্তু ওর ফোঁসানি বন্ধ হয়ে গেছে।

—আশা করব না দাদা, দাবি করব। খুব অনুত্তেজিত ওঠাপড়াহীন গলায় বলি। যে দাদু তোমাকে পালন করেছেন, যে মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে দিদা মায়ের সঙ্গে তোমাকে বড় করেছেন, যে বাবা তোমার লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন, যেখানেই

যাও তাঁদের সবাইকার ন্যায্য দাবি আছে তোমার ওপরে। তুমি সেটা এড়িয়ে যেতে পারো, কিন্তু দাবিটা সত্যিই থাকে, থাকবে।

দাদা চলে গেল, মাকে প্রণাম করল, দিদাদের প্রণাম করল, তাঁদের কান্নার জবাবে শুকনো চোখে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, বাবার পায়ের দিকে একটু নিচু হল, এবং ফিনকি যখন সেই ছোটবেলার মতো দাদাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, দাদা হঠাৎ বোকার মতো বলল— দিল্লির চটি, না? লাল, সবুজ? ফিনকি মজা পাওয়া হাসি হেসে বলল— দুৎ, ওসব চটিফটি আমার চাই না। তুমি বউদিকে নিয়ে আসবে এবার।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, আমি দাদার স্যুটকেসটা বুটে ভরে দিয়েছি, ড্রাইভারের পাশের আসনে বসেছি। ডাক দিলুম— তাড়াতাড়ি এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সারাক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে দিয়ে দাদাকে তার এ.সি কোচে তুলে দিলুম। একটু বসলুম— দাদা পকেট থেকে টাকার খামটা বার করে বলল— বিশ্বাস করো সমু। এটা আমারই টাকা। তোমার ইমপ্রেশন যাতে ভাল হয় তাই সোনুর নাম করেছিলুম। ওরা কি অত জানে টাকা ফাকা দেওয়া না দেওয়ার কথা? দে বিলং টু অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড, নেবে না?

আমি হাত বাড়িয়ে নিই।

—মাকে দিয়ে এলেই পারতে, ভাল হত।

—মা! ঠিকই! কিন্তু মা এত এত ডিসট্যান্ট, কীরকম অপর-অপর, তোমাকেই আমার সবচেয়ে কাছের মনে হয়। প্লিজ!

—ঠিক আছে, আমি মাকে দিয়ে দেব— আমি হেসে বলি, এটা মায়েরই প্রাপ্য। রাইট?

—তুমি যা মনে করো!

সত্যিই বলছি আমার কিন্তু কোনও আত্মবিশ্বাস ছিল না। আত্মবিশ্বাস ব্যাপারটা নিয়ে মাথাটাথাও ঘামাইনি কোনওদিন। যে অবস্থায় যা করেছি বলেছি একেবারে তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

প্রত্যেকবার এরকম ঘটে আর পরে ব্যাপারটার কথা মনে করে আমার অবাক লাগে। এগুলো কী? কোথা থেকে আসে? এগুলোর সঙ্গে আমার চেতনার কোনও যোগ নেই তো! বুদবুদের মতো ওঠে, বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। কিন্তু নিটোল বর্ণালি এক একটা। যা কিছু শিখছি সারাজীবন ধরে, করছি, বলছি কোনওটার সঙ্গেই আমার ভেতরের কোনও আদানপ্রদান নেই। মাঝে মাঝে, খুব মাঝে মাঝে কিছুর প্রতিক্রিয়ায় একটা শক্তিশালী অনুভূতি আমাকে অধিকার করে বটে। রাগ, বেশির ভাগই ক্রোধ, কখনও কখনও কাম। কিন্তু আবার ফিরে যাই। কোথায় যাই? ভেবে দেখতে গেলে কোথাও না। কোনও দুশ্চিন্তা আমার আসে না। খারাপ বা খুব আহ্লাদে মেজাজে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। কোন আমিটা সত্য, এই দাদাকে, সহকর্মীদের উচিত কথা শুনিয়ে দেওয়া লোকটা, না সেই লোকটা যে কোনওরকম ভার বোধ না করে জীবনের যাবতীয় দায় পালন করে যায় এবং যে ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠে, পার হয়ে যায় সীমান্ত, উড়ে চলে যায় দিক-দিশাহীন শূন্যে, এবং পায় সেই আহ্লাদ যা জেগে জেগে কখনও কোনও সফলতার সময়েও সে পায়নি!

সুতরাং আমি দাদাকে চলে যেতে দেখি। প্রায় কোনও অনুভূতি ছাড়া। ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি ওকে আর দেখতে পাচ্ছি না, ওর কিন্তু আমাকে দেখতে পাবার কথা। দাদা কি দেখছে? নাকি এখনই বহু দূর চলে গেছে, গ্রেটার কৈলাস, অরোরাদের জগতে! দেখুক না দেখুক আমি হাত নাড়তে থাকি, যতক্ষণ না ট্রেন প্ল্যাটফর্মের সীমা পার হয়ে চলে যায়, আমার উত্তোলিত হাত একটা আলিঙ্গন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যাই ভাবুক দাদা রূঢ় ভাবতে পারবে না কিছুতেই। দু এক বছরের তফাতে এই দেখা-সাক্ষাৎ একটাও লাবণ্যময় হল না। আমার মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই। দাদার মধ্যে যদি থাকে, যদি তৈরি হয়, তা হলে সেটা দাদার জীবন-যাপন, তার মন, তার সিদ্ধান্ত থেকেই উঠে এসেছে। এই তিক্ততার একটুও আমি নিলুম না। সুতরাং সবটাই দাদার কাছে ফিরে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে মাকে টাকাটা দিই। তার পেছনের দীর্ঘ ইতিহাস,

দেওয়া-নেওয়া-ফিরিয়ে দেওয়া-আবার নেওয়া সেসব কিছুই আমি বলিনি। মা টাকাটা আমারই হাতে দিয়ে বলেন— খরচ মিটিও।

—সে সব হয়ে গেছে। তুমি যা বুঝবে কোরো।

## ১১

একই পুলকারে আমি আর জয়ন্তী ফিরছি আজকাল, অনিন্দ্য আর সুমিতকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা আমাকে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউয়ে নামায় তারপর জয়ন্তীকে নিয়ে চলে যায় পাইকপাড়া। শেষ নামিয়েছি সুমিতকে ওয়েলিংটন। জয়ন্তী বলল— তুমি কি মন্ত্র জানো?

—আমি?

—ওদের র‍্যাগিং থেমে গেছে।

—আমি তো বলেই ছিলুম কিছুদিন যেতে দাও আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

—উঁহু, তোমার এতে কোনও ভূমিকা আছে। জানো, ওরা আমাদের বাড়ির খোঁজখবর করছিল!

—কী রকম?

—অনিন্দ্য আর আমি দুজনেই কালীঘাট সাইটে যাচ্ছি কদিন, অনিন্দ্য হঠাৎ বলল— যা হয়ে গেছে তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। ওসব জাস্ট ফান। তারপরে বাড়িতে কে কে আছেন, কে কী করেন জিজ্ঞেস করছিল।

—তুমি কী বললে আমিও একটু শুনে রাখি।

জয়ন্তী হাসল, বলল— বলি আর কি! তারপরে সে ডেটাগুলো নিয়ে আবার কী করবে কে জানে।

—ও অফেন্স নিল না?

—আমি কি ওকে বলেছি যে বলব না। আমি বেশ ভালমানুষের মতো মুখ করে কতকগুলো উল্টোপাল্টা বকে গেলুম। বাবা

রিটায়ার্ড স্কুল-টিচার, মা এখনও রাইটার্সে চাকরি করেন, ছোট ভাই আর্টস নিয়ে পড়ছে স্কটিশ চার্চে।

—সব মিথ্যে?

—সব নয়। আমার বাবা বেঁচেই নেই। অনেক দিন চলে গেছেন। মা স্কুলে হেডমিস্ট্রেস, কাছেই স্কুলটা, ছোটভাই পড়ছে, তবে এঞ্জিনিয়ারিং, খড়্গপুর আই.আই.টি-তে।

ওদের ছেলেমানুষিতে আমার হাসি পেয়ে যায়। অনিন্দ্য কেন কথাটা জিজ্ঞেস করেছে আন্দাজ করতে পারি। সেদিন বলেছিলুম অনেক মেয়েদেরও সংসার চালাতে হয়, তাই গোয়েন্দাগিরি করছে। আর জয়ন্তী স্রেফ সত্যি কথা ওকে বলবে না বলেই মিথ্যে বলেছে।

—একটা সুবিধে এই যে আমি চাকরিটা পেয়ে গেলুম, তখন আমার ভাই ঢুকল। মায়ের ওপর না হলে প্রচণ্ড চাপ পড়ত।—জয়ন্তী যোগ করে।

তা হলে আমার তির লক্ষ্যভেদ করেছে ঠিকই! সাধারণ ভাবে বলেছিলুম। সেটা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মিলে গেল।

—একদিন আমাদের বাড়ি যাবে?

—গেলেই হয়। কেন?

—এমনি, পুলক খুব তোমার কথা বলত। ও তোমায় খুব অ্যাডমায়ার করত। মা তোমার কথা শুনে দেখতে চায়। পুলকের বন্ধু!

—বলে কী! পুলক আমার অ্যাডমায়ারার? সর্বক্ষণ তো বকত আমাকে, উঠতে বসতে জ্যাঠামশাইয়ের মতো ধমক। ও তো আমাদের পাড়াতেই থাকে, মানে ওর ফ্যামিলি, ও দুর্গাপুরে এখন। কী রকম কাজিন তোমার? যাও না?

—আগে খুব যেতুম। আমার মায়ের মাসতুতো বোন ওর মা।

—মাসতুতো মাসতুতো?

—ঠিক, জয়ন্তী হাসল। হাসলে ওর মুখটা খুব ঝলমলায়।

—যাক ঠিক হয়েছে তবু। আমি আবার এগুলো খুব গুলিয়ে ফেলি। আমার বোনের এরিয়া এটা।

—তোমার বোন?

—হ্যাঁ ফিনকি। ও হিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে। ওর ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ছিল। আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারিনি।

—ডাক্তারি থেকে হিস্ট্রি? খুব দূর হয়ে গেল না?

—ও তো বলে—না। ডাক্তারিটা পড়তে চাইছিল একটা ইন্টারেস্ট থেকে, হিস্ট্রিটা আবার একটা আলাদা ইন্টারেস্ট। খুব প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে।

—প্র্যাকটিক্যাল না হয়ে আর উপায় কী বলো। জয়ন্তী যেন একটু নিশ্বাস গোপন করল—তোমার বোন ডাক্তারি পড়তে চেয়েছিল, তোমরা পড়াতে পারনি, আমার ম্যাথ্‌স্‌ নিয়ে পড়বার ইচ্ছে ছিল, মাকে ছুটি দিতে হবে, ভাইকে পড়াতে হবে বলে এটাই পড়তে হল। তাড়াতাড়ি ভাল মাইনের চাকরি পাওয়া যায়।

আমি চুপ করে থাকি।

—অথচ... একটু ইতস্তত করে জয়ন্তী বলল—পরে ভাই কিন্তু এটা মনে রাখবে না!

আমিও অভিজ্ঞতা থেকে জানি এইরকমই হয়, একেবারে এই রকম। কেউ সিঁড়ির পেছনের ধাপের দিকে ফিরে চায় না। নিজেদের কর্তব্যের কথা মনে রাখে না। মনে করে সে স্বয়ম্ভু। তার কেরিয়ার স্বয়ম্ভু। দাদু মাকে বলেছিলেন বাবলার থেকে তুমি বেশি কিছু আশা কোরো না। আমাকে বলেছিলেন ফিনকিই তোমাদের একমাত্র আশা।

তবু জিজ্ঞেস করলুম—এ রকম মনে হচ্ছে কেন তোমার? সবে তো ঢুকেছে। এখনও যাকে বলে ছেলেমানুষ।

—ও ঠিক বোঝা যায় সমুদ্র, একেক জন ছেলে দেখবে একটু বড় হওয়া মাত্র প্রচুর বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ফেলবে। আমাদের বাড়িতে মা আর আমি দুজনেই মেয়ে। কিন্তু ও ক্রমাগত একটা ম্যাসকুলিন ওয়ার্ল্ডে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না এটা একটা উল্টো প্রতিক্রিয়া কি না।

আমি ভাবি। আমরা দুই ভাই চিরকালই পুং-জগতে ছিলুম।

মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়নি। দাদু, দাদু, দাদু। ফিনকিই একটা ফুলকির মতো আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ত। কিন্তু আমাদের বর্ম কোনওদিন ভেদ করতে পারেনি। দাদার তো নয়ই, আমারও না। অথচ ফিনকি আমার খুব কাছাকাছি।

একদিন জয়ন্তীর সঙ্গে চিলড্রেন্স পার্কে যাই। চারদিকে খেলা হচ্ছে, ফুটবল, ক্রিকেট। আরও বাচ্চারা স্রেফ বল ছোড়াছুড়ি করছে। খুব প্রাণচঞ্চলতা আমাদের চারদিকে। চুপ করে বসে থাকি।

জয়ন্তী বলে—আচ্ছা সমুদ্র, তুমি কি চিরকালই এই রকম ইনট্রোভার্ট?

আমি হাসি—কেউ কি হঠাৎ ইনট্রোভার্ট বা এক্সট্রোভার্ট হয়ে উঠতে পারে? ব্যাপারটা জন্মগত, স্বভাবগত বলেই তো জানি।

—তোমার কী ভাল লাগে বলো তো? ধরো খেলা, মুভি, থিয়েটার, গানবাজনা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা।

—ওই শেষটা ছাড়া সবই।

—আড্ডা ভাল লাগে না, এমন ইয়াং ম্যান আমি তো দেখিনি।কেন বলো তো!

—সেটা তো ভেবে দেখিনি। তবে জিজ্ঞেস করছ যখন তখন একটু ভাবা যেতে পারে। একটু ভাবি তারপর বলি—বহুজন মিলে হই-হল্লা করছে, উল্টোপাল্টা গপ্পো মানে গসিপ, কেচ্ছা—এগুলো বোধহয় আমার ঠিক...আসলে আমি বোধহয়, আমি বোধহয় একটু বুড়োটে টাইপ বুঝলে!

জয়ন্তী হেসে খুন। সেই মুহূর্তে। জয়ন্তীর সেই মজা পেয়ে হাসতে থাকার মুহূর্তটা আমার হঠাৎ খুব ভাল লেগে যায়। হঠাৎ যেন আকাশময় হালকা রোদ ছড়িয়ে পড়ল দীর্ঘ বর্ষার পড়ন্ত বিকেলে। একটু আগেও যেখানে বিশ্রী পুরনো কালির দাগের মতো মেঘ ছিল ছাপকা ছাপকা হঠাৎ সে সব অদৃশ্য। মেঘ গলিয়ে দিয়ে শেষ বেলার সূর্য, শান্ত গর্বে হাসছে। আমি আছি, এখনও আছি।

—হাসছ কেন? আমি বোধহয় একটু গোমড়ামুখোও, কী হবে বলো তো?

ওর হাসি বেড়ে গেল। হাসতে হাসতেই বলল—উঃ নিজেকে কেউ বুড়োটে বলে, গোমড়ামুখো বলে—আমি, আমি এই প্রথম দেখলুম।

—সত্যি কথাটা স্বীকার করে নেওয়াই তো ভাল, অন্য কেউ আবিষ্কার করার আগে।

আবার হাসি। তারপর কোনওমতে হাসি থামিয়ে বলল—আমি কী রঙের শাড়ি পরেছি বলো তো! না দেখে, সামনের দিকে চোখ রেখে বলো, এই একদম টেরিয়ে তাকাবে না কিন্তু। নো চোট্টামি।

—নীল—

—হল না, হয় তুমি কিচ্ছু লক্ষ করো না, আর নয় তুমি রং কানা। বেশির ভাগ ছেলেই অবশ্য সবুজকে নীল, নীলকে সবুজ বলে, খেয়াল করেছ? কেন বলো তো।

—এ খবরটা তো আমি জানতুমই না, কী করে বলব? আমার চিরকালই ধারণা নীলটা হল নীল আর সবুজটা হল গিয়ে সবুজ।

জয়ন্তীকে আজ হাসিতে পেয়েছে। বলল, তুমি কবিতা পড়ো?

—খুব কম।

—কবিরা অনেক সময়ে ঘাসকে নীল বলে থাকেন। তবে সবুজ আকাশ আমি এখনও পড়িনি। তুমি পড়েছ? যদি চোখে পড়ে তা হলে আমাকে বলবে তো, আমার থিয়োরিটা একেবারে কাঠ-সত্যি প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুমি হয় খুব মন দিয়ে কিছু করো। নয়তো একেবারে আনমনা, মানে মনোযোগ আছে কিন্তু অন্য কোনও কিছুতে।

—তুমি তো আমাকে রীতিমতো স্টাডি করেছ দেখছি। আর কোন বিষয়টা জানলে আমার সম্পর্কে তোমার থিয়োরিটাও কাঠ-সত্যি বলে প্রমাণিত হবে বলো তো!— আমি মজা পেয়ে থেমে ওর মুখের দিকে তাকাই। জয়ন্তীর মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

আমি নিজেও এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে অপ্রস্তুত হয়ে যাই।

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটাতে মাথা চুলকোতে থাকি।

—থ্যাংকিউ সমুদ্র, দীপা হাত বাড়িয়ে দিল। কেন আমি বুঝতে পেরেছি, তবু জিজ্ঞেস করি—কী ব্যাপার?

—তোমার আসলে মার্কেটিং-এ যাওয়া উচিত। কিংবা এমব্যাসিতে।

—কেন?

—জানো না? ডিপ্লোম্যাসিতে এ প্লাস। কাউকে কোনওরকম ভাবে অফেন্স না দিয়ে অপ্রিয় সত্যগুলো বুঝিয়ে দেওয়া, সমালোচনা করা, এগুলো পারতে হলে বিশেষ ক্ষমতা থাকতে হয়। মাগনা হয় না।

—কাকে কী বুঝিয়ে দিলুম আবার?

—এই তো চ্যাংড়াগুলোকে? দিব্যি সামলে দিয়েছ।

—কী করে জানলে?

—জানতে হয়, তোমার যেমন ডিপ্লোম্যাসি আছে আমারও তেমন একটা থার্ড আই থাকতে পারে।

দীপা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর বলল—বি.ই. কলেজে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এলে আওয়াজ খেতে। এখন তো আর সে পরিস্থিতি নেই। আফটার অল আমরা ক্লাসমেট, চলো একদিন তোমাদের বাড়ি নিয়ে চলো। খুব সন্দিগ্ধ টাইপের বাড়ি যদি না হয়।

—সন্দিগ্ধ টাইপের বাড়ি, মানে?

—এই! মেয়ে-বন্ধু নিয়ে এলেই বাড়িতে সাড়া পড়ে যায়। যাহ্, ছেলেটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল, প্রেম-ফ্রেম করে ফেলল রে!

দীপাও হাসতে থাকে, আমিও।

—আমার বাড়ি সন্দিগ্ধ টাইপের কি না আমি জানি না। কখনও বান্ধবী নিয়ে তো যাইনি, কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, জানি না।

—কক্ষনও কোনও বান্ধবী হয়নি তোমার? বছর চব্বিশ বয়স তো হলই?

—তা হল। পেরিয়ে গেছে

—তা হলে? এই বয়স পর্যন্ত তুমি মেয়েদের সঙ্গে মেশোনি? অবাক করলে।

—কেন? এ রকম হয় না? আমার সে রকম সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

—আমি কিন্তু অন্য কারণে আশ্চর্য হচ্ছি।

—অন্য কারণ? কী?

—একদম মনে হয় না। তোমার কিন্তু একদম আড়ষ্টতা নেই।

—এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

—শিওর।

—তা হলে এক কাজ করো। তোমরা তিনজনেই একদিন আমাদের বাড়ি এসো।

—তিনজনে? তার মানে বাড়িতে দুয়ে-দুয়ে চার করবে না? তুমি একটা দুঁদে চালাক। উকিল হলে পারতে।

—যাক্, তিনটে সম্ভাবনার কথা জানা গেল। মার্কেটিং, ডিপ্লোম্যাসি, ওকালতি। আমার আর কোনও ভাবনা নেই।

কথা সেরে নিজের টেবিলে ফিরে গেল দীপা। একটু চেঁচিয়েই বলল—ডেটটা জানিয়ে দিয়ো কিন্তু।

ইচ্ছে করে করল, বুঝতে পারলুম। কী চায় কে জানে?

অবধারিত ভাবে পুং-সহকর্মীদের টনক নড়ে।

কিছুতেই আর একা পায় না আমাকে। এটাই যা রক্ষা। অফিসে থাকলে ক্যান্টিনে তিন সহকর্মিণীও এসে আমার টেবিলে বসে যায়। সাইটে যাই একা। বাড়ি ফেরার সময়ে অনিন্দ্য সুমিত দুজনেই আগে নেমে যায়।

বিজিতই একদিন ধরল।

—ডেটটা কবে?

—কীসের ডেট?

—দীপার সঙ্গে ডেট?

—ওহ্, দীপার সঙ্গে সে রকম কোনও ডেট-ফেট নেই। মানে তোমরা যা বুঝছ।

—বেশ তো কী রকমের, তুমি যা বুঝছ সেটাই শুনি না।

—ওরা তিনজনে একদিন আমার বাড়ি যাবে।

—তুমি নেমন্তন্ন করলে, না ওরা যেচে নিল?

—ওরাই।

বিজিত বাকি দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল—কী বলেছিলুম। ঠিক নয়?

—কী বলেছিলে বিজিত?

আমি ওদের নাম ধরে ডাকলেও ওরা কেন কে জানে আমাকে সেন বলেই ডাকে। সমুদ্র নামটা কি ওদের উচ্চারণ করতে অসুবিধে হয়?

অনিন্দ্য হাত নেড়ে বলল—বিজিতই বলছিল। তুমি ডুবে ডুবে জল খাও। বেশ পটিয়ে নিলে। নিলে নিলে তিনজনকেই?

আমি ভালমানুষের মতো বলি— তিনজনকে নেওয়া সম্ভব? আইনে আটকে যাচ্ছে না? তা কাকে ছাড়লে তোমাদের সুবিধে হয়? তা ছাড়া এই অফিসের বাইরেও তো লক্ষ লক্ষ মেয়ে রয়েছে। তোমরা হঠাৎ এদের ওপরেই এমন হামলে পড়লে কেন? আশ্চর্য তো।

এই কথাটার উত্তর ওরা দিতে পারল না।

আমি জানি এটা এক ধরনের হিংসে। সেই ধরুন দুই বোনকে ফ্রক কি পুতুল কিনে দিলে একজন বলে না, ওরটাই বেশি ভাল। ওইটাই চাই। ঠিক সেই মানসিকতা। সমুদ্রের মেয়েগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। কেন হল? আমাদেরও চাই। ওই তিনজনকেই। পৃথিবীর আর সব মেয়ে বাদ। সমুদ্রকে ওরা তিনজনে কেন পছন্দ করবে? আমরা কেন হেরে যাব। এই আর কি!

আমি বললুম— দ্যাখো অনিন্দ্য, ভদ্র আর স্বাভাবিক ব্যবহার করলে সাধারণত সেগুলোই ফেরত পাওয়া যায়। তোমরা ওদের নাজেহাল করতে, ওরা তোমাদের পছন্দ করেনি। কারণ তো পরিষ্কার। আমি ভদ্র থেকেছি, ওরা বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে এসেছে। একই অফিসে কাজ করি। একটা মিনিমাম বোঝাপড়া তো চাই। সকলেই চায়।

—বন্ধুত্ব না পিরিত?

—এখনও পিরিতে পৌঁছয়নি, পৌঁছতেই পারে। সমস্ত রকম সম্ভাবনার দরজাই খোলা আছে।

—দ্যাখ বলেছিলুম কি না— সুমিত বলে।

—কী বলেছিলে?

অনিন্দ্য গোড়া থেকেই বলছে তুমি উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের সঙ্গে মহান-টাইপের সাজছ সেন।

—তা তোমরাও উদ্দেশ্য নিয়েই মহান-টাইপ সাজো না! ফল পেতে পারো, আর দ্যাখো আমাকে সেন-সেন বলে ডেকো না। আমার একটা নাম আছে।

আমি বেরিয়ে আসি। হাতে একটা ওভারনাইট ব্যাগ। বম্বে যেতে হবে। একটা অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স আছে। আমাকে আর দীপাকে পাঠাচ্ছে ফার্ম।

## ১২

এত বড় জঙ্গল, এত ঘন, নিবিড় কিন্তু আমি আর দেখিনি। দেখেছি ঝাড়গ্রামের কাছে কোঁকড়াঝোড় কিন্তু এরকম গহিন নয়। লম্বা লম্বা গাছ। কী এগুলো? শাল না কি? কিন্তু অনেক ধরনের গাছ আছে। লম্বাই, কিন্তু একরকম নয়। গাঢ় সবুজ প্রায় কালচে পাতা, আবার কিছুটা হালকা সবুজ। হাঁটতে হাঁটতে পথের সামনে আড়াআড়ি পড়ে থাকে গাছের ভাঙা ডাল, পায়ের ধাক্কায় সরিয়ে ফেলি, ঝোপ ঝাড়ে নিশ্ছিদ্র হয়ে যায় পথ। একটু এদিক-ওদিক দেখে টপকে পেরিয়ে যাই ঝোপ। সড়সড় করে চলে যাচ্ছে ওটা কী সাপ? এ রকমের সাপের কথা আমি জানি না। ঘোর বাদামি রং, বেশ কাছির মতো মোটা। আলো পিছলোচ্ছে এমন মসৃণ গা। কোথা থেকেই বা এই আলো আসছে? তারপর বুঝি, সাপটা, সাপটার ভেতর থেকেই আসছে আলোটা। আলোর সাপ। বিজ্ঞানীরা তো বলেন সাপের

মাথার মণি-টনি সব বাজে কথা। কিন্তু এটার কী ব্যাখ্যা দেবো? কোনও অভ্যন্তরীণ মণি থেকেই এ-আলো যদি বেরোয়। পৃথিবীতে কত আশ্চর্যই তো আছে! না হয় একটা বাড়লই। মনে মনে নোট করতে থাকি কী লিখব, এটা নিয়ে একটা অন্তত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখা উচিত। ইতিমধ্যে সাপটা আমার খুব কাছে চলে এসেছে, খেয়াল করিনি। ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। ফণাও আছে তা হলে? ফণার ওপর ধবধবে সাদা সব চিহ্ন, কী সুন্দর প্রাণী! আমার ভয় করছে না কেন। আমার কি ভয়ও নেই? সাপটা আমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে। কেমন ভয় না পাও দেখি! একেবারে গলার কাছে চলে এসেছে, আমি প্রাণপণে টেনে তাকে নামাবার চেষ্টা করছি। পারছি না। তারপর গলাটা বুজে আসতে লাগল, আমি একটা ঝটকা মারলুম। আইলের সিট আমার, পাশে এক ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন, আমি বোধহয় ঝটকাটা সত্যি মেরেছি। ঘুমে লাল চোখে আড় নয়নে দেখছেন। ঝটকাটা আমি মেরেছি না উনি নিজেই নিজেকে মেরেছেন স্থির করতে পারছেন না।

আমি বলি— স্যরি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী করেছি...

খুব বিরক্ত চোখে উনি অন্যদিকে চাইলেন। আমাদের তিনটে সিট মাঝখানে দীপারটা ওদিকে, বাঁয়ের প্রথম। ও বেচারি এই সিটটা ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে ছিল। উনি বলেছিলেন—স্যরি, আই কান্‌ট ওবলাইজ ইউ।

আমার বেশ হাসি পেল। দীপার কথা শুনলে এই ঝটকাটা ওঁকে খেতে হত না। দীপাই খেত। খুব বেঁচে গেছে মেয়েটা, ভদ্রলোক এখনও গালে হাত বুলোচ্ছেন। ঝটকা খেলে দীপা আমার যা খোয়ার করত। আমিও সে হিসেবে বেঁচে গেছি।

হোটেলে নিজের নিজের ঘরে গিয়ে স্যুটকেস রাখি, টয়লেট যাই, মুখ হাত ধুই, এ বার এখান থেকে সোজা কনফারেন্স-রুমে। এই হোটেলেরই দোতলায় কনফারেন্স-রুম। দেখি দীপা পাশের ঘর থেকে একইসঙ্গে বেরোলো কিন্তু পোশাক আমূল পাল্টে গেছে।

এসেছিল সালোয়ার কামিজ পরে, এখন একটা একরঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। একটু বোধহয় প্রসাধনও করে নিয়েছে। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল— ড্রেসটা ঠিকই আছে। কোনও ওডিকলোন কি আফটার-শেভ মাখো না?

—নাঃ।

—কেন? শেভ করে কী লাগাও তা হলে?

—অ্যালাম। ফটকিরি।

—এখানেও এনেছ? হেসে ফেলল দীপা।

—নিশ্চয়ই, কখন কী ইনফেকশন লেগে যায়, রক্তটক্ত পড়লে বন্ধও তো করতে হবে।

দীপা বলল— দাঁড়াও, আগে একবার গ্রাউন্ডে চলো তো।

—কেন?

—চলোই না।

গ্রাউন্ড মানে বেসমেন্ট। প্রচুর আলো, ঝলমলে সব দোকান। দীপা চট করে একটা দোকান থেকে এক বোতল কিছু কিনল। বাইরে এসে স্প্রে করে দিল আমার গলায়। হাতের কবজিতে। বলল— শার্টটা একটু ফাঁক করো।

যা ইচ্ছে করুক বাবা, আমি শার্টের ওপর বোতাম খুলি।

ও গেঞ্জির ওপর স্প্রে করে দেয়,— কেমন গন্ধটা?

—চমৎকার, থ্যাংকিউ। তোমাকেও তবে কিছু কিনে দিই একটা?

—পরে। এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক কনফারেন্স নয়। ওয়ার্কশপ ব্যাপারটা। অন্তত ছ-সাতটা রাজ্যের প্রতিনিধি এসেছে। দুটো বক্তৃতা— একটা তার মধ্যে বেশ ক্লান্তিকর। তারপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমরা আলোচনায় বসলুম, লাঞ্চের পর, প্রত্যেক গ্রুপের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার শোনা হবে।

খানিকটা ওয়ার্কশপের সময়ে, খানিকটা লাঞ্চেও অন্তত সাত-আটজনের সঙ্গে রীতিমতো ভাব জমিয়ে ফেলল দীপা। ও ছাড়া আর একজনই মেয়ে। মহিলা। খুব সম্ভব দিল্লির হবেন,

পঞ্জাবি। ইনি পরের দিন বক্তৃতা দেবেন। একটু বয়স্ক। রাশভারী এই মহিলা তাঁর পরিচিতদের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। দীপা তারই মধ্যে ফাঁক খুঁজে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এল। হাতে খাবারের প্লেট। অন্য হাতে ফর্ক, দেখি রাশি রাশি কথা বলছে। উনিও বলছেন। চোখে বেশ আগ্রহ। পারেও।

সেদিনের কাজ শেষ হবার পর, দীপা প্রস্তাব দিল, বেড়াতে যেতে হবে। ঠিক আছে বাবা।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা যাই মেরিন ড্রাইভ। চৌপাটিতে খাই। তখন এলিফ্যান্টা থেকে টুরিস্টরা ফিরে আসছে। একটার পর একটা বোট। স্বল্প তরঙ্গ এই সাগর, ফিরতি বোটের ফুটকি, একটু সাদাটে আকাশ, এখনও যথেষ্ট আলো। পুরো দৃশ্যটাই আমায় একটা শান্ত, স্থির নীরবতায় নিয়ে যায়। মাথার মধ্যে একটা আলো জ্বলছে, স্নিগ্ধ প্রদীপের মতো, ক্রমশ সন্ধ্যা হয় আর তিন দিকে হিরে জহরতের জৌলুসে জোড়া বম্বে শহর জেগে ওঠে।

—কী হল সমুদ্র, ধ্যানস্থ হয়ে গেলে না কি?

সত্যিই উদ্ভট আমার এই নীরবতা। পাশে একটি মেয়ে, এত আগ্রহ করে আমাকে বেড়াতে নিয়ে এসেছে। আর আমি চুপ। জেগে জেগেই যেন ঘুমোই মাঝে মাঝে।

—ভাল লাগছিল খুব। জাস্ট চুপ করে ভাল লাগাটা এনজয় করছিলুম। তুমি কিছু মনে করলে?

—বেশ কিছুদিন ধরে তোমাকে স্টাডি না করলে মনে করতুম।

—স্টাডি?

—ইয়েস। আচ্ছা সমুদ্র তুমি কি মানে যোগটোগ করো?

—যোগব্যায়াম আমি নিয়মিত করি। সকালে চা আর খবরের কাগজের মতো যোগব্যায়ামটাও আমার অভ্যাস।

—সেইজন্যেই তোমার স্বাস্থ্য এত ভাল, টাচ উড, আর কী বলব— চেহারার একটা গ্লো আছে। কিন্তু আমি ব্যায়ামের কথা বলিনি। যোগ, মানে ধ্যান প্রাণায়াম, এ সবের কথা বলছি।

—তুমি জানো না ধ্যান প্রাণায়ামও যোগাসনের একটা অঙ্গ।

তাদের অবশ্য শাস্ত্রটাস্ত্রর ছোঁয়াচ বাঁচাতে বলা হয় মেডিটেশন, ব্রিদিং একসারসাইজ।

দীপা হাসল— তুমি কি খুব শাস্ত্র মানো? দীক্ষা-টিক্ষা নিয়ে ফেলেছ না কি?

—না তো? আমি অবাক হয়ে বলি। কেন না আমাদের বাড়ির ত্রিসীমায় কোনও দীক্ষা জাতীয় ব্যাপার নেই। দাদু অশীতিপর মারা গেলেন, ঘরে অবশ্যই কিছু মহাপুরুষের ফটো ঝুলত। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ শুধু আধ্যাত্মিক নয়, অন্য ক্ষেত্রেরও মহামানবদের। কিন্তু দীক্ষা নিয়েছেন বলে কখনও শুনিনি। দিদারা বালগোপাল, লক্ষ্মী, কালী সব পুজো করতেন। তাঁরা কোনও গুরুর কথা কখনও বলেননি। কিন্তু জপ করতেন। দীক্ষা ছাড়া কি কেউ জপ করে? জানি না। বাবার তো কথাই নেই। মাকেও আমি কখনও ভাঁড়ার ঘরের তাকে রাধাকৃষ্ণর মূর্তিকে ফুল জল দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করতে দেখিনি। তবুও শপথ করে কিন্তু বলতে পারব না— এঁদের আধ্যাত্মিক মত কী। সত্যিই কারও বা কোনও পথের অনুসরণ করেন কি না। কী আশ্চর্য! নিজের পরিবার সম্পর্কে কত কম জানি আমি। আমার বোধহয় লজ্জা হওয়া উচিত।

—কীসে তোমার মনে হল?

—তোমাকে কী রকম আনরিয়্যাল বলে মনে হয় সমুদ্র।

—আনরিয়্যাল?— কথাটা আমার মনের মধ্যে একটা টইটম্বুর জলাশয়ে যেন ঢিলের মতো পড়ল, চারদিক ঘিরে বৃত্ত রচনা হতে লাগল। বৃত্তে বৃত্তে আলোড়ন... আনরিয়্যাল... আনরিয়্যাল... ঠিক এই শব্দটাই আমাকে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যায়। চারদিকে যা দেখছি, যা শুনছি, যা শিখছি সবই যেন অবাস্তব। কখনও বাস্তব, কখনও অবাস্তব। বেশির ভাগ সময়েই একটা বায়বীয় শূন্য পেরিয়ে আমি এখানে পৌঁছই। এটা আমাকে কখনও কখনও মৃদু ভাবিয়েছে। কিন্তু আমি জলজ্যান্ত মানুষটা ...আমি কী করে অবাস্তব বলে প্রতিভাত হতে পারি কারও চোখে?

—আমাকে তোমার ভূত-টুত মনে হয় না কি?— হাসবার চেষ্টা করে বলি।

—না, ঠিক তা নয়, দীপা এখন খুব গম্ভীর— কেমন যেন মনে হয় তুমি...তোমার সঙ্গে কিছুর কোনও যোগ নেই। যে-কোনও জায়গা থেকে তুমি হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে যেতে পার। কংক্রিট নয় একেবারে। অথচ তুমি খুব র‍্যাশনাল, এফিশিয়েন্ট, ভদ্র...এনিওয়ে ছাড়ো, আজ প্লেনে ওই ভদ্রলোক আর তোমার মধ্যে ছোটখাটো একটা কী যেন হয়ে গেল? কী?

—আরে আর বোলো না, আমি ফিরে আসি অন্য মেজাজে— ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উনিও। উনিও অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঝটকা দিয়েছি। সেটাতে ভদ্রলোকের খুব লেগেছে।

—হঠাৎ দুঃস্বপ্ন? তোমাকে তো দুঃস্বপ্ন দেখার লোক বলে মনে হয় না।

—দুঃস্বপ্ন দেখারও আবার লোক আছে না কি? হাসালে দীপা, দুঃস্বপ্ন সবাই কোনও না কোনও সময়ে দেখে। তুমি আমাকে কী ভাবো বলো তো? কোনদিন বলবে তোমাকে তো খিদে-টিদে পাওয়ার, ঘুম-টুম পাওয়ার লোক বলে মনে হয় না।

দীপা হাসল।—খিদে তোমার শারীরিক নিয়মে পায় ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয় না কোনও বিশেষ চাহিদা তোমার আছে খাবার-দাবার বিষয়ে। তা ছাড়া দেখো স্বপ্ন লোকে দেখে, মনের ভেতরে কোনও অবদমিত ভয়, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে। তুমি বিগতস্পৃহ টাইপ। তোমার ভয়, আকাঙ্ক্ষা কিছুই আছে বলে মনে হয় না। এনিওয়ে কী স্বপ্ন দেখলে?

—সাপ। একটা বাদামি রঙের অদ্ভুত চকচকে সাপ আমাকে পেঁচিয়ে ধরছে। গলার কাছটায় আসতে দমবন্ধ লাগল। ঝটকাটা তখনই মারি।

দীপা সমুদ্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মুখে কথা নেই। আমি বলি— সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশবৃদ্ধি হয় শুনেছি, আমার দাদা দিল্লিতে, বিয়ে থা করেছে। নিশ্চয় আমাদের একটি বংশধরের শুভাগমন হচ্ছে এবার।

দীপা আমার দিকে তাকাল— এই সব কুসংস্কারে তুমি বিশ্বাস করো?

আমি ঠোঁট ওলটাই— বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কে বলছে? লোকে বলে, বিশ্বাসটা তাদের অনেক যুগের, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়? তা ছাড়া স্বপ্নের আর মানে কী?

দীপা আমার দিকে তাকাল, বলল— স্বপ্নের কিন্তু মানে থাকে সমুদ্র। তোমার স্বপ্নেরও মানে আছে। সাপের স্বপ্ন আরও দেখেছ না কি? প্রায়ই দেখো।

ভেবে দেখলুম—হ্যাঁ তা দেখি। দেখি বটে। বলি কথাটা ওকে।

এ একটু লালচে মুখে চাইল— কিছু মনে করবে না তো?

—কেন? মনে করব কেন?

—ইউ নিড এ উওম্যান।

—হঠাৎ? একটু চুপ করে থেকে, লাল হয়ে আমিও জিজ্ঞেস করি।

—হঠাৎ নয়। ওই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা দিলুম। সাপের মনস্তাত্ত্বিক একটা মানে আছে, প্রতীক, মেল সেক্স।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে থাকি। মনের ভেতরে বহু কথা ঘুরতে থাকে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেই দিনগুলো, যখন হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে খারাপ পাড়ায় গিয়েছিলুম। দাদু বললেন—'তুমি বড় হয়ে গেছ।'

—তুমি কিছু মনে করবে না দীপা, আমিও একটা কথা বলি?

—না, না মনে করব কেন? আই লাইক ফ্র্যাংকনেস।

—মেয়েরা কি কখনও সাপের স্বপ্ন দেখে না? আমার বোন ফিনকি একদিন বলছিল—ছোড়দা, একটা কী ভয়ানক সাপের স্বপ্ন দেখেছি রে! তো? তুমিও কি দেখ না?

—দেখি তো! তখনও তার মানে একই থাকে। মেল সেক্স সিম্বল। বেসিক ইনস্টিংক্ট।

সাগরের জল এখন কালো। চারপাশের জড়োয়া আলো তার মধ্যে বিম্বিত হয়ে আছে স্থির। দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট

জাহাজ। তার মাস্তুলে একটা আলো। হাওয়ায় তারা উড়ছে, চাঁদ উড়ছে, সেই ওড়ার ভাঙা ভাঙা ছবিও সাগরে। এই বিম্বরা তো সব সাগরেই। হঠাৎ দেখলে তো মনে হতেই পারে সবই আছে সাগরের ভেতরে। জল ভেদ করে উঠে আসছে আলো। শিশু হলে নিশ্চয় হাত বাড়াবে, চাঁদ ধরতে যাবে, 'আয় চাঁদ আয় চাঁদ' ছোটবেলা থেকে শুনেছে যে! সেই চাঁদকে হাতের এত কাছে পেয়ে ধরতে ঝাঁপ দিতে চাইবে না? অথচ সবই বিম্ব, সমস্ত আলো, সমস্ত রূপের অবস্থান অন্য কোনওখানে। কোনটা সত্যি? যদি আমি, আমরা সবাই, স-ব বিম্ব হই?

—তোমার সেক্স-এক্সপিরিয়েন্স আছে?—দীপা পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করল। —উত্তর দিতে আমি তোমায় জোর করছি না। বেশির ভাগ পুরুষেরই থাকে তাই জিজ্ঞেস করছি।

—আছে আবার নেইও।

—সেটা কী রকম?

তখন আমি আমার থার্ড ইয়ারের সেই অভিশপ্ত শনি রবির কথা ওকে বলি। কীভাবে নেশা সত্ত্বেও মেয়েটির উলঙ্গ দশা আমার মধ্যে বিবমিষা জাগিয়েছিল। মুহূর্তে চলে গিয়েছিল সব ক্ষুধা। সে যে কী কুৎসিত, কী কুৎসিত। গলিত কুষ্ঠের মতো, জঘন্য যৌনরোগের ক্ষতর মতো, অকথ্য আঁস্তাকুড়ের মতো।

এ সব কথা আমি কাউকে কখনও বলিনি। এমনকী পুলককেও না। শুধু পাপবোধে নয়, সত্যি-বন্ধু কেউ ছিল না বলে। সাক্ষী আছে মৃণাল। সাক্ষী আছে নৃপেশ। সেদিন নিষ্ঠুর ঠাট্টায় আমাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়েছিল। আমি ন্যাকা, আমি পুরুষত্বহীন, আমি সমকামী... আরও কী কী সব। সে সব কথা শুনলে পুলক খেপে যেত, পিটিয়ে ছাতু করে দিত ওদের। কিন্তু আমার তখন পেটের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার জোগাড়। আমি টলতে টলতে চলে আসি। পরে যখন ওরা সাহস দেয়, বলে প্রথমটা ও রকম লাগলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে, আমি ওদের কীভাবে ঠান্ডা গলায় বলি— আমি নপুংসক, তোমরা আমাকে ফার্দার বিরক্ত করবে না।

এই সমস্ত আমি বলি। দীপাকে।

আর একটু রাত হলে বিচে হাঁটতে থাকি। দীপার সাদা-কালো সিল্ক শাড়ির সাদাগুলো ঝলকায়, কালোগুলো সাদার পটে ফুটে ওঠে। ওর ছোট ঢেউ খেলানো চুলের দোল দেখতে পাই। এগুলো আগে কখনও দেখিনি। অন্ধকারে ওর সাদা চৌকো গড়নের চোয়াল জেগে থাকে, চোখে মাঝে মাঝে আলো পড়ে, মাঝে মাঝে অন্ধকার। হাতের সোনার বালা সোনালি সরীসৃপের মতো ঘিরে থাকে মণিবন্ধ। আমার সাদা পাঞ্জাবি ওড়ে। রুমাল বার করে মুখ মুছি, হঠাৎ হাত থেকে রুমালটা উড়ে যায়। কোথায় কে জানে? চলতেই থাকি, চলতেই থাকি, কিছুক্ষণ পর পেছনে— সাব, সাব, মেমসাব, মেমসাব! ভেলপুরিওয়ালা আমার রুমাল দিয়ে যায়। তাতে ভিজে বালি আটকে আছে।

ঘুম আসে না। যদি বা একটু আসে, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। নিশুত রাতেও বম্বের বহুতল হোটেলের সর্বোচ্চ তলায়ও রাস্তার আলো ঢুকে অন্ধকারকে পাতলা করে দেয়। রাত-আলো জ্বালবার দরকার হয় না। লাল কার্পেট এখন জমাট রক্তের মতো কালচে দেখায়। টেবিল-চেয়ার-কৌচ— সব আলোর উল্টোদিকে বস্তুপিণ্ডের শিলুয়েৎ। আমি টয়লেটে যাই, চান কি করব এই মাঝরাতে? সাদা মার্বেলের বাথ-টবটা আমায় খুব লোভ দেখায়। ঠান্ডা জল, ঠান্ডা স্বচ্ছ, তলা অবধি দেখা যাবে। কোথাও কোনও রহস্য নেই। ডুবে থাকব, শীতল হয়ে যাবে কঠিন শরীর। যদি চান করতে করতে ডুবে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ি! যদি মাথাটা পিছলে জলের মধ্যে পড়ে যায়? জলের তলায় বিম্ব। অনেক আলো, অনেক শ্বেত-শুভ্র, অর্চিষ্মান, অনেক অবর্ণনীয় রূপ!

স্টপার লাগিয়ে টবটা ভরতে দিই। অনেকটা সময় নেয়, কিন্তু ভরে যাওয়ার পরেও আমি তাতে পা ডোবাই না। খুব কৌতূহলের সঙ্গে দেখি। বিরাট টব। চমৎকার জল। তারপর হঠাৎ ফিরি। ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি, চাবি দিই। একটা ঘর পরে দীপার ঘর। নক

করি। সামান্য সময়, তার পরে দরজা খুলে যায়।

রাত-পোশাক পরা কোনও মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। অসাধারণ সুন্দর এই পোশাক। লেসে-লেসে ভরা, সেই এলিজাবেথীয় কিংবা ভিক্টোরীয় যুগের গাউন-টাউনের মতো। শুধু কোমরের কাছ থেকে ওই রকম কৃত্রিম ভাবে ছড়িয়ে যাওয়া নেই। কুঁচিতে কুঁচিতে কোমর ঘিরে বড় মোহন ভঙ্গিতে লুটিয়ে রয়েছে। দীপা আমার পেছনে দরজা বন্ধ করে দেয়।

—দীপা আই নিড ইয়ু।

—ইউ নিড আ উওম্যান সমুদ্র, আই টোল্ড ইউ। মনে হল ওর চোখে জল চকচক করছে।

জল? না আলো! বুঝতে পারি না। জল ভেতর থেকে আসে, আলো বাইরে থেকে।

জিজ্ঞেস করি— তফাতটা কী?

—তফাত? তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।

—আই মীন তুমি, তোমাকেই আমার বড্ড দরকার।

—তুমি কি নিশ্চিত? না আজকের কথাবার্তার একটা ফল...

—হতে পারে। কিন্তু ভেতরে তো ছিলই।

—সমুদ্র, সাপ থাকে বাইরে... ভেতরে... ভেতরেরটাকে হয়তো বাইরেরটা উসকে দেয়। কথা... পরিবেশ... নির্জনতা এই সব সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সে...। আমি হয়তো সেই সাপিনী, ...এসব সময়ে মন থাকে না, ...শরীর শুধু শরীর থাকে।

আমি অনভ্যস্ত আবেগে দৃঢ় থেকে বলি— আমি কখনও কোনও ভগবানকে ডাকিনি দীপা, কেন না কারও কাছে আমার কোনও প্রার্থনা ছিল না। আজ আজই একমাত্র আমার ভেতর থেকে প্রার্থনা উঠে আসছে, তোমার জন্য।

দীপা দু'হাতে মুখ ঢাকল। আর আমার যে কী হয়ে গেল। আমি তার হাত সরিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রাখি। অসহ্য সুস্বাদ, তুলতুলে, আমার ভেতরটা যেন ক্রমে গলে যাচ্ছে। নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরি তাকে বুকে। আমার স্ফীত পেশির ওপর তার তুলতুলে বুক এক দাহহীন

জ্যোতির্ময় আগুন জ্বালায়। আমার ইস্পাত ক্রমাগত মহাসুখে মহাপ্রেমে ও মহা নিষ্ঠুরতায় আঘাত করতে থাকে তাকে যতক্ষণ না সে আমাকে পথ করে দেয়।

আহ্ সমুদ্র আহ্! আরও আরও ছিঁড়ে ফেলো আমাকে, ধ্বংস হয়ে যাই।

'নক্, নক্ নক্'— ভোর-চায়ের জন্য ডাক এসেছে। জানে না এখানে দু'জন মানুষ খুন হয়ে গেছে। আমার বুকের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে সে। আস্তে জাগিয়ে দিই। জেগে সে ছেলেমানুষের চোখে চারদিকে তাকায়। তারপর লাফিয়ে নামে, কার্পেটে একটা বেড়াল লাফাবার হালকা শব্দ হয়। বড় বড় পা ফেলে দরজা খোলে সে, সামান্য— 'চায় নহি চাইয়ে', দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকে, এবার আমি ভোরের আলোয় তার চোখ দেখি। নাক, কান, ঠোঁট, যাকে সমগ্রে পেয়েছিলুম তাকে খণ্ডে খণ্ডে পেতে চাই। নরম হাতে আদর করি, তার রাত পোশাকের ফাঁস খুলে দিই, তারপর ভোরের বিছানায় সেই বাদামি সর্পিণীকে দেখি। ভেতরের আলোয় ভাস্বর। ফণায় শুভ্র আলপনা। এক হাতে তার চিত্রিত ফণা আর এক হাতে তার উত্তেজক লেজ মুঠো করে ধরে আমি তার অমৃত ছোবল নিই, ফিরিয়ে দিই, বারবার, বারবার।

রাতের ধরা ঠান্ডা জলে ডুব স্নান। মাথায় শ্যাম্পু। বাথসল্টের গভীর থেকে সুগন্ধ। কী সব ছোট ছোট বোতল। বডি লোশন। মেয়েরা মাখে, না কী? পুরুষ বোর্ডারের ঘরে মেয়েদের জিনিস রাখবে এমন দরের হোটেল তো এ নয়? ফাইভ-স্টার না হোক ফোর-স্টার। লোশনটা মেখে ফেলি। সুগন্ধ চারিয়ে যায়। খুব তাজা লাগে। গায়ে শার্ট চড়াই, ট্রাউজার্স। নাঃ টাই আমার আসে না। টাইটা বেশি পরে এগজিকিউটিভ ক্লাস। আমাদের কাজ করতে হয় ভাই। মোজা পরে জুতো গলাই, ফিতে বাঁধি। ঘরের দরজা বন্ধ করি। চাবিটা কাউন্টারে জমা দিই। সবটাই একটা ঘোরের মধ্যে। কনফারেন্স রুমে শেষ বক্তৃতা। তারপর এরাই হোটেল থেকে বন্দোবস্ত করে আমাদের কিছু সাইট-সিয়িং-এ নিয়ে যায়। সমুদ্রের

মৃদু ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে বোট এলিফ্যান্টা যায়। দাঁড়িয়ে থাকি ছ'ফুটের লম্বা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবমূর্তির সামনে। সৃষ্টি হয়ে গেছে, স্থিতি চলছে, এবার প্রলয়ের অপেক্ষা।

—সমুদ্র!— দীপা আস্তে করে ডাকল। এতক্ষণ ও দিল্লির সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটার পর একটা শিবমূর্তি দেখে বেড়াচ্ছিল। যেন ও প্রত্ন-গবেষক, শিবমূর্তির এক্সপার্ট।

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকাই— দেখো দীপা শিবমূর্তি! এত শিবমূর্তি। ইনি তো ধ্বংসের দেবতা, এঁকে লোকে শিবই বা বলে কেন, ভালই বা বাসে কেন?— আমি জিজ্ঞেস করি।

দীপা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল— স্যরি। আ অ্যাম স্যরি সমুদ্র।

কেন এ কথা ও বলল আমার ভাল বোধগম্য হল না। ও কি মনে করছে ও আমাকে সিডিউস্ করেছে? আমার অনুতাপ হচ্ছে? উঁচু-নিচু পাহাড়ের গা টপকে টপকে নেমে আসতে থাকি। সব মূর্তি, পাহাড়, সমুদ্র, এতগুলো মানুষ, দূর থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসা গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া সমস্ত কেমন অবাস্তব লাগে। উজ্জ্বল হলুদ সালোয়ার কামিজ পরা ওই বিষণ্ণ কিন্তু তীব্র মেয়েটি কে? বোধহয় অলৌকিক।

## ১৩

আজকাল সংসারের অবস্থা বেশ স্থিতিশীল হয়েছে। ফিনকি খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। পাশ করা মাত্র ইউ. জি. সি স্কলারশিপ পেয়ে গেল। মেজদিদা সামান্য পেটের অসুখে মারা গেলেন। জেঠু ক্রমশ নিজের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে রোজ বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন। সবচেয়ে কাছে চিলড্রেন্স পার্ক, আর একটু দূরে গঙ্গার ধার। এখনকার কেউ জানে না, জেঠু একদিন মনোরোগী ছিলেন। একদিন আমাকে ডাকলেন— সমু!

এখনও খানিকটা সংকুচিত। কিন্তু তার মধ্যে আগের মতো অস্বাভাবিকতা নেই।

—বলুন।

—আমি কিছু কাজ করতে পারি না?

—কী কাজ? আপনিই বলুন।

—আমার খুব লজ্জা করে। কিছু করি না।

—লজ্জা করার কিছু নেই জেঠু।

—না না লজ্জা, ভীষণ লজ্জা। ওইটুকু মেয়ে ফিনকি পর্যন্ত কত কাজ করে। তোমার মা, তোমার বাবা। তোমার তো কথাই নেই। এতটুকু ছেলে তুমি!

—এতটুকু ছেলে? আমি? লোকে শুনলে হাসবে জেঠু।

—না না, আমি ঠিক বলছি। আমি একটু পড়াশোনা শুরু করেছি, যদি একটু ছাত্র পড়াই?

আমি একটু ঘাবড়ে যাই। ছাত্র পড়ানোর পরিশ্রম কি ওঁর সইবে? মাথার ওপরই তো প্রেশারটা বেশি পড়বে।

—আমি একটু ভেবে দেখি জেঠু।

বাবাকে বলতে তো বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদের বেশি মগজ খাটাতে খাটাতে এই রকম হয়। বাবার আরও কেস জানা আছে। মা বললেন— যা করবে ভেবেচিন্তে করো সমু। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

শেষ পর্যন্ত জেঠুর ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করি।

উনি একবার দেখতে চাইলেন জেঠুকে। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন, বেশ সময় নিয়ে কথাবার্তা বললেন। আমাকে ডাকলেন— উনি ঠিক আছেন। ইচ্ছে হয়েছে যখন করুন। তবে বেশি চাপ যেন না নেন। আর দুষ্টু বা বিরক্ত করে কি খুব বোকা এ রকম ছাত্র ওঁকে যেন পড়াতে না হয়। আর... একটা কথা... কোনও মেয়েও নয়, বাচ্চা হলে ঠিক আছে। কিন্তু তরুণী-যুবতী মেয়ে কদাপি নয়।

আসল সময়ে কিন্তু দেখলুম উনি হাইস্কুলের ছেলেদের খুব অনায়াসে বিজ্ঞান ও অঙ্ক পড়িয়ে দিচ্ছেন। বেশি কথা বলেন না। খুব

ধৈর্য ধরে আস্তে আস্তে নিচু গলায় বোঝান। খাতায় কষে দ্যান অঙ্ক। ক্রমে কলেজের ছাত্ররাও আসতে লাগল। উনি আমার কাছ থেকে সিলেবাসের বই চান, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। চট করে পাতা উল্টে দ্যান। কোনও কোনও জায়গায় আমাকে জিজ্ঞেস করেন। স্মৃতির একটু অসুবিধে আছে বুঝি। উনিও বোঝেন, কাগজে বড় বড় করে ফর্মুলা লিখে রাখেন, কোনও কিছু সংজ্ঞা, নিয়ম, ঠিকঠাক ভাষায় লিখে রেখে দ্যান চোখের সামনে। কিন্তু ওঁর যুক্তি বুঝতে বা বোঝাতে কোনও অসুবিধে নেই।

আমি মাঝে মাঝেই বসি। ইচ্ছে করে। নজর রাখা দরকার। উনি প্রথম প্রথম একটু লজ্জা পেতেন। তারপর অভ্যেস হয়ে গেল।

জেঠু একদিন তাঁর উপার্জনের হাজার ছয়েক টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন— বউমাকে দিতে লজ্জা করল, সমু, তুমি ওঁকে দিয়ো। চোখমুখে খুশির ছাপ এতই স্পষ্ট, যে আমার না বলতে মন সরল না।

অতএব আমি দীপাকে বলি— দীপা আমাদের বাড়ি চলো। জাস্ট হঠাৎ একদিন। আমি শুধু শিওর হয়ে নেব ফিনকি থাকছে কি না।

—কিন্তু তুমি যে বলেছিলে আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে নিয়ে যাবে?

ভেবে-চিন্তে দেখি। ঠিকই। বলেছিলুম বটে। যদি জয়ন্তী মুকুলিকা জানতে পারে আমি একা দীপাকে নিয়ে গেছি, ওদের খারাপ লাগবে। শুধু শুধু কাউকে আঘাত দেওয়া তো আমার উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া সত্যপালন। সত্যপালনের দায় আছে। অথচ সময় পার হয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে যাচ্ছে। এত কাজ, দীপার সঙ্গে কথা হচ্ছে না।

—সে ক্ষেত্রে দীপা বাড়িতে একটু নোটিস দিয়ে অর্থাৎ জানিয়েই নিয়ে যেতে হবে। বাড়ির সবাই একটু হতবুদ্ধি হয়ে যেতে পারেন।

—কেন? খুব প্রাচীনপন্থী না কি!

—এটা আমি বলতে পারব না। আমি আমার বাড়ির লোকেদের খুব একটা বুঝি না।

দীপা অদ্ভুত ভাবে হাসল।

আমি বললুম আমার দাদা দিল্লিতে পঞ্জাবি মেয়ে বিয়ে করেছে। কোনও সমস্যা হয়নি।

একটু চুপ করে থেকে দীপা বলল— উনি কি কারও মতামতের ধার ধেরেছিলেন?

খুবই সংসারাভিজ্ঞ ও স্পষ্টবাদী মেয়েটি।

আমি হেসে বলি— ধরেছ ঠিকই। কিন্তু তার তো পরও আছে। দাদা এসেছে, সবাই তাকে স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছেন তো!

—তুমি বলছ তোমার দাদা-বউদি এখন তোমাদের বাড়িতেই থাকেন!

—তা কী করে থাকবে? দুজনেরই কর্মস্থল দিল্লি।

—তাই। এসে থাকলে কী হত তুমি জানো না, তাই না?

—এসব ছাড়ো। দীপা, আমাদের বাড়ি অতিথি-অভ্যাগতের আসা-যাওয়া একটু কম, ছোট থেকেই দেখছি। তাই-ই বলছি তোমরা তিনজনে হঠাৎ গিয়ে পড়লে ওঁদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। ঘাবড়ে যাবেন আর কি!

—না-মঞ্জুর।

—সে কী?

—ওই আগে যা ব্যবস্থা ছিল, ফিনকি থাকছে কি না শিওর হয়ে বা ওকে আলাদা করে বলে উইদাউট নোটিস নিয়ে যেতে হবে।

—মামার বাড়ির আবদার?

—তাই বলো তো— তাই।

—ঠিক আছে, যা থাকে কপালে।

আমি আসলে আমার বাড়িকে প্রস্তুত করে নিতে চাইছিলুম। চাইছিলুম দীপা একাই যাক। সেই যাওয়াটাই হবে উপক্রমণিকা। তারপর পাঁচজনের মতামত। বিশেষ করে ফিনকির। ফিনকির কাছ

থেকে মা-বাবা এঁদের মতামত জানতে পারব। জানা দরকার। যদিও তার জন্য কিছু আটকাবে না। তবু জানা দরকার। তিনজনকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আমিই দিয়েছিলুম। তার কারণ ছিল অন্য, জয়ন্তীকে আমি আলাদা করে দেখিনি, অথচ ও গেলে সেটাই এক রকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। কিন্তু দীপা কেন তিনজনে যেতে চাইছে তাও আবার উইদাউট নোটিস— আমি বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে যা বলছে তাই-ই করি অতএব। ফিনকিকে বলব ঠিক করি।

ফিনকি এত ভাল পাশ করে গবেষণা করছে, হেঁজিপেঁজি বিষয় নয়, মুদ্রা নিয়ে কাজ। কিন্তু প্রায় এক রকমই আছে। দেখায় সেই ছটফটে অষ্টাদশীটি। জেঠুর সঙ্গে কত গল্প করে, বড় দিদার পান ছেঁচবার সময়ে ছ্যাঁচা পান টুক করে তুলে নিয়ে রাগায়, মাকে সাহায্য করে, বাবার মেজাজ সামলায়। আমার সময় হলে আমার সঙ্গেও বসে গল্প করে।

—কী রে ছোড়দা— কী করছিস?— একেবারে ডাকাতের মতো এসে পড়ল। ওর ছোটবেলাকার ডলি-ডলি শিশুমুখ খুব একটা ছাঁদ পাল্টায়নি। বড় বড় চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত, কোঁকড়া ছোট চুল, কাটেনি, কিন্তু বাড়ে না বিশেষ। ফর্সা নয় একেবারেই কিন্তু খুব উজ্জ্বল, কোনওদিন ব্রণ হতে দেখিনি। আমাদের বিশেষত দাদার তো ব্রণ হয়ে হয়ে গালে দাগই হয়ে গেল। দাদু বলতেন 'বয়ঃব্রণ, ঘাবড়িও না, হরমোন্যাল চেঞ্জের সময়ে ছেলে-মেয়ে সবারই হয়।' কিন্তু ফিনকির মুখে কোনওদিন কোনও ব্রণ দেখিনি। মুখে দাগ না থাকলে মুখটা খুব নিষ্পাপ নির্মল দেখায়। প্রচুর বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ফিনকিকে তেমনই নির্মল দেখায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শাণিত ভাবটা ওর মুখে একেবারেই নেই।

একদিন শীতের রোববার। কুয়াশা ভাল কাটেনি। কুয়াশা ভেদ করা স্যাঁতা রোদ ঘরে, ঠিক যেন একটা উজ্জ্বল বাঘ নিস্তেজ হয়ে ঘুমোচ্ছে। জানি ঘুম ভাঙবে, লাফিয়ে উঠবে তখন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গায়ের রং মেখে শীত-সকালের গায়ে-হলুদ হয়ে যাবে। একটু দেরি করে উঠেছি। মনে হচ্ছে একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছে।

প্রত্যেক ঘর-সংসারের বিভিন্ন সময়ে কিছু বিশেষ শব্দ-গন্ধ থাকে। তাতে সকালে-বিকেলে তফাত হয়ে যায়। ঠিক যে কী, বলতে পারব না। মাংসের গন্ধ কি হাওয়ায়? হ্যাঁ, খুবই সুবাস।

ফটাস ফটাস করে বাবা নেমে গেলেন। প্রত্যেকটা ফটাসে যেন এক একটা করে পটকা ফাটছে। বাবাও রোববার দেরি করে ওঠেন। জেঠুর একটু কুণ্ঠিত কাশির শব্দ, কেউ চান করে গেছে, বাথরুমের দরজা বোধহয় খোলা, হুড়হুড় করে একটা ভাল কোনও সাবানের গন্ধ আসছে। ফিনকির উপস্থিতিতেই সেই গন্ধ। ও-ই তবে চান করে এল এইমাত্র।

আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে ছ্যাঁক করে দুটো চিঠি রাখল আমার সামনে। একটা দেখি এরোগ্রাম, আর একটা লম্বা অফিশিয়্যাল চিঠি।

—কী ব্যাপার? এগুলো কোথা থেকে? বিদেশে চাকরি পাচ্ছিস? কোথায়?

—পেলে যেতে দিবি তো?

আমি ওর দিকে একটু তাকিয়ে থাকি।— কী যে বলিস ফিনকি? তুই চাকরি চেয়েছিস। পাচ্ছিস। নিবি তোর নিজের সিদ্ধান্তে, আমি কেন বাধা দেব?

—তোর কথা বলছি না ছোড়দা, ধর মা, বাবা, জেঠু, দিদা।

—বাবা একটু চেঁচামেচি করতে পারেন। আর কেউ কিচ্ছু বলবেন না।

—বলবেন না হয়তো। কিন্তু মা মনের কষ্টে গুমরে শেষ হয়ে যাবে। জেঠু খুব অসহায় বোধ করবেন, দিদুও তাই।

আমি চুপ করে থাকি।

—ছোড়দা তোরা কারও মনের খবর রাখিস না, না?

ভেবে দেখলুম সত্যিই রাখি না। যাকে যেমন দেখছি তেমনই মেনে নিয়েছি। না। এমনকী দাদুরও না। মন? মন কোথায় থাকে? পৃথিবীর কোন দুর্গম গুহায়? কত অধ্যবসায় স্বীকার করে তবে সেখানে যাওয়া যায়? খুব তাগিদ না থাকলে সে অধ্যবসায়ও আসে

না, গুহায় পৌঁছনোও হয় না। নিজের মনকেও কি খুব ভাল করে জানি আমি? যা কিছু চারপাশে ঘটছে, বাইরে ও ভেতরে সবই যেন এক অন্তহীন জলছবি। টলটল করছে জলে, ঠিকমতো উঠছে না খাতায়, বা কিছু উঠছে কিছু উঠছে না। ডগডগে রং ফিকে হয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

—রাগ করলি?

—না। ভাবছি। তুই যেটা বললি... সত্যিই... আমি কি কোনও কর্তব্যে অবহেলা করেছি! সেটাই...

ফিনকি এবার ভারী রেগে উঠল— কর্তব্যের কথা কে তোকে বলেছে? আমি কি সে সবে কোনও গাফিলতির কথা বলেছি? কর্তব্য ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবতে পারিস না, না?

—আমি জানি না রে ফিনকি। সত্যিই তুই, তুই-ই কিন্তু সবাইকার একমাত্র আশা।

যে কথাটা দাদু মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, সেটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

—গ্যাস দিচ্ছিস? শোন্, আমি দুটো দু-রকমের চাকরি পাচ্ছি। একটা এশিয়াটিক সোসাইটিতে ওদের ইনসক্রিপশন সেকশনে, সংরক্ষণ, ক্যাটালগিং রিসার্চ... সবই। আর দ্বিতীয়টা কানাডায় কাকার কাছে। কী ধরনের চাকরি তা জানি না, যিনি স্ত্রী মারা যেতে দুধের শিশুকে ফেলে চলে যেতে পারেন, বছর না ঘুরতেই বিয়ে করে পগার পার, কোনওদিনও সে মেয়ের খোঁজ নেন না, তিনি হঠাৎ এ রকম দরাজ হয়ে উঠলেন কেন? কী চাকরি... সেটা? তোরা ওঁকে জানাসনি আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছি, আমার আর গার্জেনের দরকার নেই?

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

ও একটু রাগী হাসি হাসে।— কাকা আমাকে আগেও একটা চিঠি দিয়েছিলেন তাতেই নিজের গুণপনা ব্যক্ত করে ফেলেছেন। এখন লিখছেন আমাকে উচ্চশিক্ষা দেবেন। আমার ভাই বড় হয়ে যাচ্ছে, কাকিমা ওঁকে ছেড়ে গেছেন তো! আবার বিয়ে করেছেন।

—সে কী? আমরা তো জানি মোটর দুর্ঘটনায় উনি আর ওঁর বড় ছেলে মারা গেছে।

—আমিও তো তেমনই কানাঘুষো শুনেছিলুম। তা উনি যদি নিজে লেখেন কাকিমা ডিভোর্স করে অন্য এক ধনকুবেরকে বিয়ে করেছেন। এক ছেলে তিনি নিয়েছেন, আর এক ছেলে এঁর। তা হলে তো ওঁর এই কথাটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হয়।

আমি বিমূঢ়।

—কী বল?

—কী বলব ফিনকি? স-বই তোর। এ বাড়ি ও বাড়ি। তুই যেখানে যেতে চাস...

এবারে ফুঁসে উঠল ফিনকি— এত নিষ্ঠুর তুই? একবার মুখ ফুটে বলতে পারছিস না— ফিনকি তুই আমাদের, যাস না, কোথাও যেতে দেব না! ভারী বিবেচক ভদ্রলোক হয়েছিস, না?

ওর চোখ জলে ভরে উঠছে।

—শোন শোন। আমি আমরা তোকে যেতে দিতে চাই না, ভুল বুঝিস না। কিন্তু তোর বাবার কাছে যদি তুই যেতে চাস?

—কে আমার বাবা? রাজকুমার না নবকুমার? কে আমার ভাই, তুই না সেই এঁচড়ে-পক্কটা?

—শুধু-শুধু কেন গালাগাল দিচ্ছিস, কেন? বেচারা ছেলেটাকে?

—না রে গোল্লায় গেছে, কাকার চিঠি পড়ে আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি।

—সে দোষটা পুরোপুরি ওর কি? ব্রোক্‌ন ফ্যামিলি...

—দরদ উথলোচ্ছে যে রে। এবার বলবি না তো আহা তুই দিদি হলি। মা-হারা ছেলেটার জন্যেও যা! বল্। কর্তব্য। কর্তব্যটা তো খুব বুঝিস!

—ঠিক আছে তাই বললে তুই কী বলবি?

—বলব পৃথিবীতে কত শত ব্রোক্‌ন ফ্যামিলি আছে, ছেলেমেয়ে অসহায়, বখে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে— অত দায় নেবার সাধ্য কী আমার! ...ওহ্, আর একটা চিঠিও আছে। তোর। কার যেন বিয়ের কার্ড।

স্বস্তিকা আঁকা হ্যান্ড-মেড পেপারের একটা শুভবিবাহের কার্ড আমার হাতে দিল ফিনকি।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী... অমুক তারিখে অমুক লগ্নে আমাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া দীপার সহিত শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ও উষা চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র কল্যাণীয় আঞ্জনেয়র শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া...

কে রে মেয়েটি?

—ওই যে আসছে শনিবার যে তিনজন আমাদের বাড়ি আসবে বলেছে, তাদেরই একজন।

—তোর তো ছেলে-কলিগও আছে। তাদের ডাকলি না তো?

—আমি এদেরও ডাকিনি ফিনকি, ওরা নিজেরাই... অন্যরা ওদের বড্ড হেক্‌ল করত, আমি করতুম না। এই থেকে...

—যাক তিন থেকে এক কমে গেলে দুই।

ও কী বলতে চায় আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপাতত আমার মাথায় কিছু মৌমাছি। তাদের তাড়াতে পারছি না। ফিনকির কথার জবাবে কিছুই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ও বোধহয় ঘাবড়ে যায়। এত ফাজলামি ছোড়দা পছন্দ করছে না,— বলে— কী খাওয়াব ছোড়দা?

—তুই যা ভাল বুঝিস!

—বাঃ! আসছে তোর অ্যাডমায়ারার, আর বুঝব আমি?

—আমি কী-ই বা বুঝি?

—তার মানে আমার অ্যাডমায়ারার এলেও মেনুটা আমাকেই বানাতে হবে? কী রে?

ইয়ার্কির উত্তরে পাল্টা ইয়ার্কি করতে পারি না। বলি— তখন দেখা যাবে। এখন যা তো! আমার কয়েকটা ড্রয়িং দেখবার আছে।

—তুই যেন কেমন! —ফিনকি হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

কুয়াশাটা বোধহয় কেটে গেছে। জানলা দিয়ে ঘর-ভাসানি রোদ। কিন্তু কুয়াশাটাকে তো কোথাও যেতে হবে! তাই আমার কাছে এসেছে। আমাকে সাত পাকে জড়িয়ে। ঘরটা যেন টং ঘর। কত উঁচুতে? সাত ফুট? আট ফুট? না তার চেয়েও বেশি? মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তার কতকগুলো লম্বা লম্বা খুঁটির। কুয়াশা, ভোঁতা শীত, আমি। আমি, ভোঁতা শীত, কুয়াশা। কাজকর্ম? চলছে, যেমন চলে। আমি বুঝেও বুঝতে পারছি না। আমি উঠে দাঁড়াই, আমার কোল থেকে কুয়াশা গড়িয়ে যায়, উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে হেঁটে বইয়ের দিকে যাই। চোখ বুলিয়ে যাই পরপর। —'ডাব্‌ল হেলিক্স' 'শিওরলি য়ু আর জোকিং মিঃ ফেইনম্যান' 'সামার লাইটনিং', রিলকে। 'সঞ্চয়িতা', 'ছাড়পত্র', 'টাইম-মেশিন', 'আরণ্যক', আমার বিষয়ের কিছু বই। সব উল্টেপাল্টে দেখি কোথাও যদি কিছু পাই, যার এই মুহূর্তে আমার কাছে বিশেষ মানে আছে।

> 'আই লাভ দা ডার্কার আওয়ার্স অব মাই এগজিসটেন্স
> হোয়্যার ইন, অ্যাজ ইন ওল্ড লেটার্স, আই ডিসকভার
> মাই ডেইলি লাইফ অলরেডি লিভ্‌ড্ অ্যান্ড ওভার
> অ্যান্ড লাইক সাম লেজেন্ড লস্ট ইন ফার্দেস্ট ডিসট্যান্স...'

রিলকেরও তা হলে এমন মনে হয়েছিল? বারবার হচ্ছে। যে ভাবে বাঁচছি সব বারবার ফিরে আসছে। খুব পুরনো, 'মাই ডেইলি লাইফ অলরেডি লিভ্‌ড্ অ্যান্ড ওভার'। সব অভিজ্ঞতাই সুদূর অতীতের ছেঁড়া পাতা হঠাৎ উড়ে আসছে। উড়ে আসছে যেন নতুন পাতা, নতুন চিঠি। কুড়িয়ে দেখি, ওহ্ হো! এ তো সেই পুরনো গল্প লোককথায় কথায় যা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর পাতায় আমি একটা পুনরাবৃত্তি। অথচ এই অন্ধকারতম অস্তিত্ব কেমন দপ্‌দপ্ করছে। পুনরাবৃত্তি বলে চিনলে কেন এই অন্ধকার? কেন এই দপদপানি?

তবে? তবে কি আমি দীপাকে এতই ভালবাসি? আর কেউ যে দুঃখবোধ আমাকে দিতে পারেনি, সে পেরেছে! কিন্তু দীপার প্রতি বম্বের সেই রাতের আগে আমি তো সত্যিই কোনও ভালবাসা বোধ

করিনি? এখনও, এখনও দীপার অদর্শনে আমার কোনও কষ্ট তো হয় না, দেখা করার জন্য কোনও উদগ্র বাসনা নেই, অন্য সবাইকে জীবনে যেভাবে নিয়েছি, এই বন্ধুটিকেও তাই। কাকে তা হলে ভালবাসা বলে? কেনই বা এই তিমিরবোধ? অপমান? প্রতারণা? আমাকে একজন ঠকিয়েছে সেই লজ্জা, সেই নৈরাশ্য? ব্যস?

আমি চুপ করে বসে থাকি আর জাগ্রতেই এই বাড়ি ছাপিয়ে আমার চোখে ভেসে ওঠে অন্য এক বাড়ি। বিরাট। ভাঙা ভাঙা গাবদা থাম। আগাছা গজিয়েছে, আস্তর খসে পড়ছে। দূরে সাপের মুখে ব্যাঙের অদ্ভুত চিৎকার। ঢুকতে চাইছি ঢুকতে পারছি না। যে দিকেই যেতে চাই হঠাৎ যেন পা আটকে যায়। শুধু প্রশস্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি ঘরের পর ঘর, ঘরের পর ঘর, সব কার ঢোকবার অপেক্ষায় আছে। অপেক্ষার রুদ্ধ নিশ্বাস টের পাচ্ছি।

## ১৪

—গুড মর্নিং সমুদ্র!— জয়ন্তী। —গুড মর্নিং— আমি।

—হ্যাললো!— অনিন্দ্য।— হ্যালো— আমি।

—মর্নিং —মুকুলিকা। —মর্নিং —আমি।

—কেমন কাটল উইক-এন্ড? —ভাল— আমি।

— সার, এই ফাইলগুলো রাখুন। চিফকে নোট পাঠাতে হবে। ঘণ্টা দুয়েক পরে এলে হবে? —রাঘব কর। ড্রাফট্‌স্‌ম্যান।

—দীপা ম্যাডাম কোথায় সার? সাহেব ডাকছেন।

—জানি না।

দীপা আসেনি, আসে না।

জয়ন্তী মুকুলিকা দু'জনেই বলে— শনিবারের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ। ঠিক।

—দীপার অসুখ-বিসুখ করল কিনা...

—ফোন করো। করে দেখো।

—করেছি, ক্রমাগত এনগেজ্‌ড্‌ টোন আসছে। খারাপ আছে বোধহয়।

দীপার বিয়ে। অথচ দেখা যাচ্ছে এরা কেউই জানে না। অবশ্য দেরি আছে। দেড় মাসের মতো দেরি। আমার চিঠিটাই সবচেয়ে আগে গেছে। আমাকে নিশ্চিন্ত করতে বোধহয়।

তৃতীয় দিন রাতে ফোন আসে।

—প্লিজ সমুদ্র, স্যরি। আ অ্যাম স্যরি। কাল অফিসের পর কোথাও এসো, দরকার আছে।

—কেন?

—দরকার, প্লিজ।

—আমি জানি না কোথায় যেতে হয়।

—শরৎ বোস রোডে লেকের একেবারে উল্টো দিকে একটা রেস্তরাঁ আছে, নামটা বলছি, আসবে তো? আটটা সুবিধে হবে?—নামটা শুনে নিই। ফোন রেখে দিই। হ্যাঁ না কিচ্ছু বলি না।

সারাদিন কাজে যায়। রোদ্দুরে ঘুরি, ডেসকে কাজ করি, রিপোর্ট তৈরি করি। সারাক্ষণ কুয়াশা আমায় ঘিরে থাকে। দীপা আজ অফিসে এসেছে দেখেছি।

—কী হয়েছিল?— অনিন্দ্য।

—মাইগ্রেন!— দীপা।

অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসে। আমার মাথার ভেতর মৌ ঘোরে। ভিন ভিন ভিন ভিন।

—প্লিজ সমুদ্র, আমার অফিসে ঢুকে নিচু গলায় বলে দীপা, আমি মাথা তুলি না। আটটায় কিন্তু, আটটায়, আমি একা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকব। একা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে... রাত আটটা... থাকব দাঁড়িয়ে... দাঁড়িয়ে থাকব কিন্তু... ঠিক...।

পুলকারের সঙ্গীরা বলল কী হল? ওঠো। সমুদ্র!

—আমার আর একটু কাজ বাকি আছে। তোমরা যাও। আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব এখন।

ওরা চলে গেলে আমি হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে চলে আসি। শীত সন্ধ্যা জেঁকে বসছে। মশা বেশ। ধুলোয় ডিজেলের গন্ধ। চারদিকের ধুলোয় ময়লা গাছগুলো। একটা উঁচু টিলা হচ্ছে আস্তে আস্তে পাতাল রেলের খোঁড়া মাটিতে। ইতিমধ্যেই কিছু ছোট ছোট চারা গজিয়ে উঠেছে, বুনো ফুলও। অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে সব। শুধু গাড়ির আলোর রক্তচোখ, আর আকাশ থেকে ঝুপ ঝুপ করে ঝুলতে থাকা বাদুড় অন্ধকার। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। যাব, না যাব না। ট্যাক্সি নেব, না নেব না। ভাবতে ভাবতে দেখি হেঁটেই চলেছি, হেঁটেই চলেছি। হাঁটছি। বাস নিই না। শেয়ার ট্যাক্সি না। একলা ট্যাক্সি এখন পাওয়াও খুব মুশকিল। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছি, কী হুড়োহুড়ি বাসের লাইনে। দেখছি একেকটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে যেন ভোজবাজিতে সব ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মানুষ উগরোচ্ছে, মানুষ খাচ্ছে। পা চালাই, পেরিয়ে যায় বিড়লা তারামণ্ডল, সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, পেরিয়ে যাচ্ছে নেহরু চিলড্রেন্স্ মিউজিয়াম। এখানে বোধহয় বাচ্চাদের কিছু ক্লাস-ট্লাস হয়। বেরিয়ে আসছে অনেক। সঙ্গে তাদের মায়েরা। চলতে চলতে বুঝতে পারছি এই পথ আমি আগেও হেঁটেছি। ঠিক এমনি করে। অফিসের পর। বিধ্বস্ত। পাতাল রেলের মাটির পাহাড়টা তখন একটা উইঢিবি ছিল, তারামণ্ডল ছিল না। কিন্তু ক্যাথিড্রালটা বোধহয় ছিল, কিংবা কী জানি আমার ভুলও হতে পারে। এত উঁচু উঁচু-অট্টালিকা ছিল না তখন, আকাশ দেখা যেত, এত গন্ধ ছিল না ডিজেলের। কী জানি কী ছিল তখন যানবাহন। যা-ই থেকে থাক, আমার এই হেঁটে চলাটা সত্য। একেবারে ডুবে গিয়েছিলুম পড়া বইয়ের হলদে পাতায়। ঝুর ঝুর করে ভেঙে যাচ্ছে সব, অক্ষরগুলো পুরো বুঝতে পারছি না।

আমার ভেতরে কোথাও টং টং করে আটটা বাজল। কেউ গম্ভীর গলায় বলল— সময় হল। ভেসে উঠেছে ল্যান্সডাউন রোডের মোহনা, সাদার্ন অ্যাভিনিউ মিশবে। দীপা।

আমরা দু'জনে চিনে রেস্তরাঁয় ঢুকি। চিনে লণ্ঠনের মৃদু আলোর ঢুলুনিতে ড্রাগন ফুটে ওঠে দরজার মাথায়।

—তুমি কী ভীষণ ঘেমে গেছ সমুদ্র, কীসে এলে? এত ঘাম? মোছো।

এতক্ষণে বুঝতে পারি কম দেখছিলুম কেন। চোখের ওপর অবিরল ঘাম ঝরে পড়েছে। তাই। আমি বুঝতে পারিনি। সাদা রুমাল বার করে মুখ মুছি, ফিনকি আমার রুমালের তদারকি করে। ইস্ কালো হয়ে গেছে একেবারে! এত বালিও ছিল! মেনু-কার্ড নিয়ে এসেছে। হঠাৎ জেগে উঠি। দীপা কী খাবে জিজ্ঞেস করি না। অর্ডার দিয়ে দিই।

—সমুদ্র তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। খুব জরুরি কিছু। কথাগুলো তুমি কীভাবে নেবে জানি না। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে।

আমি ওর দিকে তাকাই।

—এই বিয়েটা আমার অনেকদিন থেকেই ঠিক ছিল। দাদার বন্ধু। দু'জনেই দু'জনকে মানে অ্যারেঞ্জড নয়... জাস্ট সব মিলে গিয়েছিল। ও এখন ওয়াশিংটনে। জর্জ টাউনে। অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর— মাইক্রোবায়োলজি।

আমি উঠে পড়ি। ওর চোখে ভয়। আমি বলি— মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে আসি, চটচটে করছে সব। —টয়লেটে যাই। এতক্ষণের জমা জল নামাই, মুখ হাত দুই-ই তরল সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি। এখন একটু তাজা লাগছে।

এসে বসি। খাওয়া শুরু করি। ও-ও এক চামচ খায়। আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

—কারও গুণের ফিরিস্তি শোনবার জন্যে আজ আসিনি কিন্তু — বলি।

— না, সত্যিই, ওটা আমার বলার আসল কথা ছিল না।

—যেটা বলার ছিল বলো, অপেক্ষা করছি।

—আমি... আমি তোমাকে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ছিলুম সমুদ্র। তুমি জানো না, তোমার একটা সাংঘাতিক ম্যাগনেটিজম আছে, মুখ নিচু করল। তুলে বলল,

—অ্যাপিল যাকে বলে। অ্যাকচুয়ালি বি.ই.-তে আমরা সবাই তোমায়... চাইতুম। দীপার মুখটা ঝলসে উঠল— এখানেও জয়ন্তী, মুকুল সবাই তোমায়...।

—বাজি ধরেছিলে নাকি?

—বিদ্রূপ কোরো না, পতঙ্গ যেমন আগুনের টানে... কিন্তু সমুদ্র তুমি মনে কোরো না যা বলেছিলুম তা উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছিলুম, মনে করো না আমার কোনও অভিসন্ধি ছিল। তুমি যখন এলে আমি জাস্ট— জাস্ট নিজেকে সামলাতে পারিনি। যা দিয়েছি আনন্দে দিয়েছি, আনন্দ পেয়েছি। পেয়েছি মানে কি? ইট ওয়জ অ্যান এক্সপ্লোশন। এক্সপ্লোশন অ্যান্ড এক্সট্যাসি।

—তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান...

—কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাসনি, সমুদ্র আমার ব্যঙ্গ অগ্রাহ্য করে বলল ও।

—সেটা কী করে বোঝা যায়?

—কীভাবে বলি.. তুমি... তুমি অদ্ভুত আনরিয়্যাল... আমাদের মতো জীবন্ত নও। অন্যদের মতো রাগ, লোভ, আসক্তি, ইগো কিচ্ছু নেই তোমার মধ্যে।

— মড়া না মহামানব?

—আমি বোঝাতে পারছি না। তুমি কারও সঙ্গে সেভাবে চিরদিন বাঁচতে পারবে কি না... আমার সন্দেহ আছে। অন্তত আমি সে নই। আমি খুব স্ট্রং, তো দেখতেই পাচ্ছ, আমি প্রচণ্ড ভাবে বাঁচতে চাই। সমুদ্র তুমি তখন ঝলসে উঠেছিলে। কিন্তু অন্য সময়ে ঠান্ডা, ভীষণ... মনে আছে...এলিফ্যান্টায় তুমি কতক্ষণ ত্রিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলে, মনে আছে?

—অত সুন্দর ভাস্কর্য দেখব না? আমিও তো কিছু গড়ি!

—না। তা নয়। অন্য জায়গায় যেন চলে গেছ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

—সন্ন্যাসী? গুপ্ত যোগী?

—হতে পারে। সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভাল বলতে পারবে।

কিন্তু সমুদ্র তোমার জীবন অস্তিত্ব যেন অন্য জায়গায়। শিব ধ্বংসের দেবতা তবু কেন তাঁকে শিব বলে জিজ্ঞেস করেছিলে না? যে শিব ধ্বংসের দেবতা তার দিকেই তোমার নজর পড়ল?

কথা বলি না। চুপচাপ খাই। অসম্ভব খিদে পেয়েছিল। অবশেষে বলি— খটকা। আমার সম্পর্কে তোমার খটকা ছিল, থাকতেই পারে, ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে কাকে চেনা যায়? কিন্তু তোমারও তো একটা ফিলিং...।

—সেটাও ভালবাসা নয় সমুদ্র। টু বি অনেস্ট। সুদ্ধু উন্মাদনা। ওইটুকুর বাইরে যে মানুষটা তাকে আমি ভালবাসিনি। আজ যদি আবার সে রকম সুযোগ ঘটে, আবার হয়তো ওইভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়ব, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনও মনের মিল নেই, হবে না— দীপা আর লজ্জা পাচ্ছে না, সোজা তাকিয়ে আছে।

—আমাকে বলতে পারতে তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে পছন্দের মানুষের সঙ্গে!

—তা হলে তো তোমায় পেতাম না! —দীপার মুখ লাল। আমি অবাক।

—যদি তোমার ভাবী বরকে সব জানিয়ে দিই? —শেষে বলি।

—দিয়ো। কিন্তু তারপরেও আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তুমি কি সত্যিই মনে করো একদিনের শারীরিক মিলন থেকে সারাজীবনের সম্পর্কের ঝুঁকি নেওয়া যায়? আমি মনে করছি অঞ্জুকে কোথাও ঠকাচ্ছি না। তুমি যদি অন্য ভাবে ভাবতে, আমার কোনও বিবেকদংশন হত না। কিন্তু তুমি সেভাবে ভাবো না, আনফর্চুনেটলি। তাই তোমার জন্যে খুব খারাপ লাগছে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরি।

মা রান্নাঘরের দরজায়। ওপর থেকে বাবার তর্জন। ফিনকি ছুটে এল।

—কী রে। কোথায় গিয়েছিলি?

—আচমকা কাজ পড়ে গিয়েছিল।

—একটা ফোন তো অন্তত করে দিবি!

—হ্যাঁ... ফোনটা... তোরা খেয়ে নে।

—আমাদের খাওয়া কবেই সারা। মা-ই না খেয়ে বসে আছে।

আমি হঠাৎ রান্নাঘরের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের কাছে চলে যাই, মুখোমুখি দাঁড়াই— মা, এই রিচুয়ালগুলো কেন?

—কী?

—রিচুয়াল। বাড়ির সবাইকে না খাইয়ে তুমি খাবে না এই ধরনের রিচুয়াল। আরও আছে সেগুলো এখন থাক। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমরা প্রত্যেকে অ্যাডাল্ট। আমাদের কোনও কাজ পড়ে গেলে আমরা খেয়ে নিতে জানি। পাকস্থলীর পাচক রসগুলো নিয়ম করে বেরিয়ে আসে। খাবার না পেলে নিজেকেই খায়। ফলে আলসার। তোমার না খেয়ে থাকা আমাদের কোনও আনন্দ দিচ্ছে না। তোমার আলসার হলেও সে যন্ত্রণাটা আমরা ভোগ করব না। তোমার মনে হচ্ছে এই স্যাক্রিফাইসটা, আলসারটা... এগুলো তোমার পত্নীত্বের, মাতৃত্বের মহিমা প্রচার করবে। ব্যাপারটা আদৌ তেমন নয়। তোমার যদি এসব কারণে দুরারোগ্য কোনও রোগ হয় আমরা ডাক্তার পথ্য সবই করব। কিন্তু খুব বিরক্তও হব। ভাবব মা শুধু-শুধু একটা ঝামেলা ডেকে আনল।

হতভম্ব মা আর ফিনকিকে রেখে আমি ওপরে উঠি। বাবার দরজা খোলা, ঢুকে যাই। উনি লুঙ্গির কষি খুলে কোমর চুলকোচ্ছিলেন। আমাকে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। ওঁর প্রাইভেসি নষ্ট করার সাহস এ বাড়িতে কারও নেই।

—তু তুমি!

—হ্যাঁ বকুনিটা খেতে এলুম। গর্জন করছিলে শুনছিলুম।

—ন্ না। এত রাত, কোথায় গেলে...।

—তার জন্য দায়ী কে? মা? আমি যদি কোথাও যাই— তেমন খারাপ কোথাও বা একেবারে দাদার মতো অনেক দূরে। কিছু করতে পারবে? চেঁচিয়ে? মাঝ থেকে নিজের রক্তচাপ বাড়বে। বেশি বাড়লে সেরিব্রাল স্ট্রোক। আর সে রকম স্ট্রোক হলে জীবন্মৃত হয়ে থাকবে। হাতি কাদায় পড়া যাকে বলে। তখন ব্যাঙে লাথি

মেরে গেলেও কিছু করতে পারবে না। আবার এ-ও হতে পারে তোমার না হয়ে স্ট্রোকটা, সেরিব্রাল বা করোনারি— মায়ের হল, হতেই পারে, বয়স হয়েছে, সর্বক্ষণের টেনশন সহ্য করতে করতে হার্ট বিদ্রোহ করতেই পারে। মা শুয়ে পড়লে বা মারা গেলে তোমাকে দেখবার আর কেউ থাকবে না।

বেরিয়ে আসি। জেঠুর ঘরে ঢুকি। জেঠু বিছানায় বসে। অবাক হয়ে দেখি উনি জপ করছেন। বেরিয়ে আসছি, ডাকলেন— সমু!

—হ্যাঁ, বলুন। ওষুধ খেয়েছেন? শুয়ে পড়ুন এবার জেঠু। ওষুধটা দেব?

—ফিনকি দিয়েছে বাবা। তোমার কী হয়েছে?

আমার হঠাৎ কী রকম অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। জেঠুকে, একমাত্র জেঠুকেই বলতে পারি কী হয়েছে, কেন না ওঁর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। জেঠুর যা হয়েছিল আমারও তা-ই হল। ঠিক যেমন কাকা যা করেছে, দাদাও তাই করল। কিন্তু জেঠুকে বলা যাবে না। তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার সে-সব হয়নি। হবে না। কিন্তু উনি যেহেতু ভুক্তভোগী তাই সহজাত শক্তিতেই বুঝে ফেলছেন আমার কী হয়েছে।

—শুয়ে পড়ুন জেঠু, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

—পারবে? ক্লান্ত হয়ে ফিরেছ!

—ক্লান্ত কোথায়! খিদে পেতেই খেয়ে নিয়েছি। একটা ফোন করে দেওয়া উচিত ছিল।

জেঠু পাশ ফিরে শোন।

আমি আস্তে আস্তে জেঠুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। উনি আস্তে আস্তে বললেন— তুমি একটু থাকো সমু, তুমি থাকলে আমার ভাল লাগে।

জেঠু খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন। উনি যথেষ্ট কড়া ওষুধ খান। আমি একটু দাঁড়িয়ে থাকি। নীল রাত ঢুকে পড়েছে ঘরে। নীল রাত মাথায় করে আমি দাঁড়িয়ে থাকি বিষে নীল এক মনুষ্য আত্মার দিকে ফিরে। যদি আত্মা থাকে সে কি বিষে নীল হয় আদৌ? মনটা

হয়, চেতনাও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিন্তু আত্মা? যা না কি আমাদের ভেতরের আসল সারটুকু! মৃত্যুর পরেও থাকে! নৈনং দহতি পাবকঃ। বিশ্বাস করি না, প্রমাণ নেই বলা খুব সহজ। কিন্তু যে চেতনার কথা এতদিন পাত্তা দিতেন না, আজ সেই কনসাশনেস নিয়েই তো এত কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা! তিন। তিন এমন একটা সংখ্যা যা সর্বত্র রহস্য সংখ্যা বলে মনে হচ্ছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ফাদার, সন, হোলি গোস্ট।' ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। বুদ্ধ, সংঘ, ধর্ম। এর মানে কী? দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান সবকিছুর মধ্যে একই যোগসূত্র একটা আছে। সেটা আমরা ধরতে পারছি না। একটা মানুষ যদি একই সঙ্গে দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং শিল্পী হয় তবে ধরতে পারবে কী? আইনস্টাইন একই সঙ্গে বিজ্ঞানী ও শিল্পী ছিলেন। বেহালা বাজাতেন অর্থাৎ ভেতরে শিল্প ছিল ধরে নিতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথও ভায়োলিন বাজাতেন, এগুলো কি গুরু চিন্তার ভার থেকে মুক্তি? না তার চেয়ে বেশি কিছু? ফেইনম্যান এক সময়ে অনুভব করেছিলেন তিনি ফিজিক্সের তত্ত্বগুলো ছবি দিয়ে প্রকাশ করতে চান। রীতিমতো শেখেন ড্রয়িং— প্যাস্টেল, জল রং, তেল রং। জেরি নামে এক শিল্পীবন্ধুকে ফেইনম্যান বোঝাচ্ছেন কী করে বৈদ্যুতিক চুম্বক কাজ করে। পেঁচিয়ে একটা ছোট্ট বৃত্ত করেছেন, এবারে সুতো দিয়ে একটা পেরেক ঝুলিয়ে দিলেন ওপর থেকে। তারের মধ্যে ভোল্টেজ দেবার সঙ্গে সঙ্গে পেরেকটা তারের ঘূর্ণির মধ্যে সোজা ঢুকে গেল। জেরির মন্তব্য— ওহ্, ইটস জাস্ট লাইক ফাকিং।

আশ্চর্য, যাতে একজন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বর প্রয়োগ দেখছেন বিস্ময়ে, আনন্দে, সেখানে আর একজন তার সঙ্গে 'ফাকিং'-এর বেশি কিছু খুঁজে পেলেন না। একই প্রক্রিয়া, কিন্তু আলাদা-আলাদা মনে হওয়া। কত রকমের মনে হওয়া আছে পৃথিবীতে! 'ফাকিং' সম্পর্কে জেরির মনোভাবটাও বোঝা যায়। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের আরেকটা, ব্যস। ফান। অনেক মানুষ, আমি নিজেই যেমন দীপার সঙ্গে মিলনে যে অলৌকিক আনন্দ পেয়েছিলুম তার কিছুই 'ফাকিং' দিয়ে বোঝানো যায় না।

হঠাৎ আমার মনে হয় দীপা মেয়েটিকে যেন বুঝতে পারছি। আমি এমনই তুষার-শীতল, ঠিক জিনিসটা ঠিক সময়ে করছি। বলছি, কারেক্ট যাকে বলে। কিন্তু আমার মধ্যে কোনও উত্থান-পতন নেই। আছে শুধু একটা ক্লান্তিকর একমাত্রিকতা। আমি যে ওভাবে জ্বলে উঠতে পারি, সেটা দীপা প্রত্যাশাই করেনি। দেশলাইয়ের কাঠি খড়ের স্তূপে আগুন জ্বালাল। কিন্তু নিজে হয় নিভে গেল, নয় সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। সেই স্বল্পায়ু দেশলাইয়ের কাঠিকে ভয় পেয়েছে প্রবল ভাবে বাঁচতে চাওয়া দীপা।

যতক্ষণ না ঘুম আসে ভাবনা যায় না। আমি নিজেকে যা বুঝি, অন্যে আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। কেন? দাদু বলেছিলেন— তোমার যেন বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা আলগা-আলগা। তুমি দায়িত্বশীল, তাই ব্যাপারটা আরও ভাবায়... তোমার বন্ধু নেই? ...যার সঙ্গে একটা বন্ড... যাকে তুমি সব কথা বলতে পারো.. সত্যিই... কাকে বলব? কী বলব? কী যেন বলেছিল পুলু? ... তুই একটা পাগল... আমি তো পাগল নই পুলু। পাগল আমার জ্যাঠামশাই। এখন আর নেই। যে জ্যাঠামশাই আগে জিনিসপত্র ছুড়ে ছুড়ে ফেলতেন, তিনি এখন সাবান ঘষে ঘষে দু'খানা গেঞ্জি কাঁচেন, দু'খানা রুমালও কেঁচে ঝেড়ে শুকুতে দ্যান, টেবিলের ওপর বই-খাতা গুছিয়ে রাখেন, একটা লাল কলম একটা নীল কলম, একটি ছুরি চিরুনি। সেফটিপিন দিয়ে ভেতরের ময়লা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করেন। কলের জলের তোড়ের তলায় রাখেন। রোদ। যে জ্যাঠামশাই আগে নাকি আমার বাবাকে ধরে মারতেন, মাকে অকথ্য গালাগাল করতেন, দাদুকে দেখলেই চোখে লাল রং এসে যেত, সেই জেঠু এখন বাবাকে ভয় পান, মা'র দিকে চোখ তুলে চান না। ফিনকির সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করেন আর আমাকে বলেন— কাছে বসো। তুমি থাকলে আমার ভাল লাগে।

কিন্তু দীপার মনে হয়েছে— আমি আনরিয়্যাল। 'তোমাকে কী রকম আনরিয়্যাল বলে মনে হয় সমুদ্র।' এবং আমি আনরিয়্যাল কিনা জানি না। কিন্তু আমার চারপাশটা সত্যিই অবাস্তব লাগে বেশির ভাগ সময়ে।

'...যে কোনও জায়গা থেকে তুমি কর্পূরের মতো উবে যেতে পারো।'

আমার এই তথাকথিত অবাস্তবতাকে ভয় পেয়ে দীপা সরে গেল। মানে, কেটে পড়ল আর কি! সারা রাত বৃষ্টির মতো চিন্তাপাত। আস্তে আস্তে বৃষ্টির ধারা ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের আরাম হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সকালবেলা যেমন সময়ে রোজ ভাঙে ঠিক সেই সময়েই ঘুম ভেঙে যায়। দেখি খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছি। পা-দুটো দু'দিকে ফাঁক। যথাসম্ভব আলগা, হাত দুটো দু'দিকে প্রায় ঝুলে পড়েছে। যে কোনও যোগাসনের পর শবাসনে যে ভাবে শরীরটা শিথিল করে দিতে বলে— এ যেন ঠিক সেই রকম। প্রত্যেকটা অঙ্গ থেকে সাড়, বোধ চলে গেছে। আমাকে রীতিমতো চেষ্টা করতে হয় হাত নাড়াতে, পা নাড়াতে। আমি তাদের আলাদা আলাদা করে ডাকি। তোমরা কি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ? আমার ডাকের মধ্যে কোনও ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। খুব ঠান্ডা মাথায় নিজের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করি।

—কী রে ছোড়দা? ফিনকির মুখটা আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

—ছোড়দা!

হঠাৎ আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সাড় ঢুকে যায়। বলি— উঠছি।

—এ রকম অদ্ভুত ভাবে...

—স্ট্রেচ্‌ করছিলুম।— আমি পাশ ফিরে যাই, বুঝে নিই কোমরে জোর এসেছে কি না। তারপর উঠে বসি।

—ঠিক আছিস তো?

—একেবারে— আমি হাসি।

—দেখিস বাবা।

ফিনকি যায় না। সকালের ঘরটার পটে ফিনকি খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে বরং। কোনও সন্দেহ নেই ও বাস্তব, পুরো ঘরটাকে ও এমন একটা অর্থ দিচ্ছে, যেন ফাঁকা লাইন ছিল একটা, কিছু ঠিকঠাক চমৎকার শব্দ এসে সেখানে বসে গেল।

আমি মুখ ধুতে যাই, ফিরে এসে দেখি ফিনকি দাঁড়িয়ে রয়েছে,

দাড়ি কামাই, জলজ্যান্ত পার্থিব বাস্তব আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

—চা আনব।

—না। একেবারে চান করে নীচে নামব। একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি খুব হেলাফেলার সঙ্গে বলি।

ও একবার আমার দিকে চেয়ে চলে যায়।

নীচে নেমে দেখি— আমার সঙ্গেই খেতে বসেছে।

—তুই? এখন খাচ্ছিস?

—বেরোব সকাল-সকাল।

জুতোর র‍্যাকের কাছে এসে নিচু হয়ে ফিতে বাঁধছি, ফিনকি জুতো পরতে পরতে বলল— তুই আজকে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিস।

—কেন?

—তোকে ভাল লাগছে না দেখতে। আমি ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখব, তোর অফিসে যাব। ধর পাঁচটা নাগাদ। রেডি থাকবি।

—বাজে চিন্তা করছিস। আমি অনেক রাত অবধি জেগে ছিলুম। শেষ রাতটা মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। তাই কী রকম একটা লেথার্জিক লাগছিল।

—তুই শিওর?

—শিওর। তুই এগিয়ে পড়, আমার গাড়ি এক্ষুনি আসবে।

## ১৫

দেয়ালের ধার ঘেঁষে পিঁপড়ে চলেছে। লম্বা সারি। লাল-পিঁপড়ে। গরম পড়েছে খুব, তাই ওরা বেরিয়ে আসছে। দেয়ালের কোণ বরাবর ওপর দিকেও যতদূর চোখ যায় পিঁপড়ে। কোথাও নিশ্চয় এর একটা আদি আছে, অন্তত। কিন্তু সেটা কই দেখতে পাই না। কোথাও কোনও চিনি, মধু, সন্দেশের গুঁড়ো কিচ্ছু না। তবে খাটটা

দেয়ালের ধার থেকে সরিয়ে আনতে হয়। একেবারে মাঝখানে, পাখার তলায়। নইলে পিঁপড়েরা সার বেঁধে বিছানায় উঠে আসবে এবং তখন আমিই ওদের চিনি হয়ে দাঁড়াব। কত লক্ষ যুগ ধরে এই কীটেরা ঠিক এক রকম আছে। একই শৃঙ্খলাবোধ, একই দলবদ্ধতা, একই খাদ্যস্পৃহা, বাড়ি বানাবার রীতি। কোনও বিবর্তন হয়নি ওদের। আরশোলাও শুনতে পাই এ রকমই আর এক আদিম সৃষ্টি। ওদের চোখের সামনে দিয়ে কত তুষারযুগ পার হয়ে গেছে। কত মহাজাগতিক বিস্ফোরণ, কত ধ্বংস, কত সৃষ্টির প্রক্রিয়া অবিরাম চলেছে। এদের তো দেখতে পাচ্ছি। যাদের পাচ্ছি না! কত শত সহস্র ব্যাকটিরিয়া ভাইরাস! ঠিক কীভাবে এই বিপুল প্রাণিময় পৃথিবী চলেছে? কোনও নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হচ্ছে না কেন আর? মানুষই কি বিবর্তনের, প্রকৃতির উদ্ভাবনার শেষ ধাপ? আমি কি সেই ধাপের অন্তর্গত? আমার মধ্যে এত প্রতিক্রিয়ার অভাব কেন? এই এক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা। প্রাতঃকৃত্য, চা, মধ্যাহ্নভোজন যা ঠিক মধ্যাহ্নে হয় না। এই অফিস যাওয়া, পুলকারে, অভ্যস্ত নিপুণতায় যে বিদ্যা শিখেছি তার প্রয়োগ সারাদিন ধরে, কারও সঙ্গে তেমন আদানপ্রদান নেই, আবার বিকেলে বা সন্ধ্যায় ফিরে আসা, সবার প্রতি যা করণীয় তেমন ব্যবহার করা... এর মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা নেই? আমার মা, দিদারা, বাবা এঁদের মধ্যেও, এমনকী আমার প্রবাসী দাদার মধ্যেও একটা যান্ত্রিকতা নেই? না, দাদা নয়। দাদা বোধহয় একটা দুঃসাহসিক অন্যরকম কাজ করেছে, স্বার্থপর কাজ কিন্তু অন্যরকম। জেঠুর ছিল তুমুল প্রতিক্রিয়ার জগৎ। অ-যান্ত্রিক ভাবে ভালবেসেছিলেন, প্রতারিত হওয়া সহ্য করতে পারেননি, দুঃখ, লজ্জা, ক্ষোভ, বিশ্বাসঘাতকতার অপমান— তাই তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। সেই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার জগৎ থেকে উনি আবার আস্তে আস্তে যান্ত্রিকতায় ফিরে আসছেন। প্রতিক্রিয়াহীনতাই তা হলে যান্ত্রিকতা! ফিনকি কিন্তু যান্ত্রিক নয়। অভ্যস্ত রুটিনের বাইরেও ওর একটা চিন্তাজগৎ আছে। কাকার সম্পর্কে নিঃশব্দে ভাবনা-চিন্তা করে ও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ওর

একটা আলাদা আলাদা সম্পর্ক। তার বাইরের ফিনকি, স্কুল-কলেজের গবেষণা-ঘরের ফিনকি কেমন সে ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই। কিন্তু আমি আন্দাজ করতে পারি, সেখানেও ও অগতানুগতিক, অযান্ত্রিক। যদি দীপাকে বিয়ে করে ফেলতে পারতুম, তা হলে নিঃসন্দেহে আমার এই প্রতিক্রিয়াহীন যান্ত্রিকতারই বিস্তার হত। মুম্বইয়ের ওই অঘটন বা অতিঘটনের পরেও তো আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠিনি! কোনও রকম উপচে পড়া তো ছিল না আমার মধ্যে! আহার-নিদ্রা-ঔপার্জনিক কর্ম-মৈথুন— এই চক্রে বাঁধা আমি এক মানুষ পিঁপড়ে। তাই, সেটাই বুঝতে পেরে দীপা সরে গেছে, তাকে দোষ দিতে পারি না।

মানুষ স্বপ্ন দেখে। কেরিয়ার নিয়ে। বিবাহ নিয়ে, সন্তান নিয়ে। আমি তো কোনওদিন কোনও স্বপ্ন দেখলুম না! আমার কোনও দিবাস্বপ্ন নেই। যা আছে তা রাতের ঘুমে। যখন আমার যান্ত্রিক উপর-চৈতন্য ঘুমিয়ে পড়ে ভেতর থেকে জেগে ওঠে প্রাচীন প্রত্ন বাড়ি সব এবং স্বাধীন এক অস্তিত্বের ছায়া-উড়ান, সে কখনও চার চৌকো ঘর কখনও বাদামি সাপের আয়ত্ত ছাড়িয়ে উড়ে যায়।

*দীপা, দীপা কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী তুমি।* কীভাবে আমাকে খুঁটিয়ে দেখেছ, বিশ্লেষণ করেছ, না কি এটা বুদ্ধির ব্যাপারই নয়। ইনস্টিংক্ট! বাহবা দীপা, বাহবা। তাই আমার মধ্যে যেটুকু লোভনীয় সেটা নিয়ে আমাকে ফেলে দিয়েছ। ঠিক যেমন বহু পুরুষ মানুষ বহু সুন্দরী মেয়েকে ভোগ করে ফেলে দেয়! আমি সাধারণ বাড়ির মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছেলে। আমার ধারণা দৈহিক মিলনের সঙ্গে বিবাহের একটা অবিসংবাদী সম্পর্ক রয়েছে। তাই ধরেই নিয়েছিলুম দীপা ও আমি বিয়ে করব। ভেবে দেখিনি দীপাকে আমার কতটা ভাল লাগবে। তার প্রতি দৈহিক আকর্ষণটাই বা আমার কতটা গভীর। সে আমার নারী কি না। ভাবিনি, কিন্তু দীপা চমৎকার ভেবেছে। বেশ পরিকল্পনা করে আমার কৌমার্যভঙ্গ করে দীপা এক রাত্রির উন্মাদনা ভেতরে নিয়ে নির্ধারিত পাত্রের গলায় মালা দিতে চলে গেল। তার ভেতরে কোনও দংশন নেই। তার চেয়েও বড়

কথা, দংশন আমারও নেই। দীপার অর্থে নয় অবশ্য। প্রথমে বিস্ময় কিছুটা রাগ এসব তো হয়েছিলই। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেটা কাটিয়ে উঠেছি। দীপা নামে একরাত্রির বনিতার জন্যে আমার কোনও বিরহবোধ নেই। প্রত্যাখ্যানে তেমন কোনও জ্বালা নেই। খালি টের পাচ্ছি, আমি একটু অদ্ভুত, যাকে আমি যান্ত্রিক বলছি, তাকেই কি দীপা আনরিয়্যাল বলছে? তুমি কী রকম আনরিয়্যাল সমুদ্র... যে কোনও মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে যেতে পার।

আমি আনরিয়্যাল কী? চারপাশের জগৎটাকেই তো আমার আনরিয়্যাল লাগে! ক্রমাগত হর্ন বাজাতে বাজাতে ঝড়ের বেগে ট্যাক্সি চলে গেল। কিছু লোক রাস্তা পার হচ্ছে, কেউ দেখে-শুনে, কেউ হাত তুলে গাড়ি থামাতে থামাতে। পুলুর ফোন— 'সমু কেমন আছিস রে? আমাদের এখানে কেউ কাজ করে না। খালি ইউনিয়নবাজি, টিকতে পারব কিনা জানি না, সুযোগ পেলেই বাইরে চলে যাব, তুইও চেষ্টা কর।' সমু বলে একটি ছেলে ছিল। পুলু বলে আর একটি ছেলে ছিল। পুলু খুব বিশ্বস্ত বন্ধু। অনেক সময়েই রক্ষকের ভূমিকা নেয়। সমু? সমু কোনও ভূমিকা নেয় না। তার কোনও উদ্যোগ নেই। পুলু অন্যত্র চাকরি পেয়ে চলে গেল। মাঝে মাঝে তার কথা মনে হতে হতে সমু একদিন পুলুকে একেবারে ভুলে গেল। তখন একদিন জয়ন্তী বলল— পুলককে চেনেন? আমার কাজিন। তাই তো? —অবশ্যই পুলু সমুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। একদিন পুলু ফোন করল—'সুযোগ পেলেই বাইরে চলে যাব, তুইও চেষ্টা কর।'

পুরোটাই একটা গল্প। তার খুঁটিনাটি ভুলে গেছি। সেই সমুকে, সেই পুলুকে মনে আছে ঠিক যেমন ভাবে ছোটবেলায় পড়া গল্পের অনুভূতিটা মনে থাকে, আবছা-আবছা। আবার পড়তে গেলে সেরকম ভাল লাগে না আর।

জেঠু খুক খুক করে সন্তর্পণে কাশছেন, কোনও গল্পের জেঠু। মা, বাবাকে খেতে দিয়েছেন। সমু ঢুকছে। মা মুখ তুলে না তাকিয়েই বললেন—বসো সমু, ডালটা সম্বরা দিতে বাকি। —একটা ছবি,

ভিডিয়োতে তুলেছি কোনও সময়ে, দেখছি আবার। অ্যামবাসাডারের সামনের সিটে অনিন্দ্য, পেছনে জয়ন্তী, আমি ঢুকে যাচ্ছি। ঠ্যালাগাড়ি লোহার বোঝা চাপানো— লোহার রড। এগুলো আমাদের দরকার হয়, সামনে দুজন পেছনে দুজন ঘামে চুপচুপ হয়ে টানছে, পেছনে এসে ধাক্কা মারে। শুয়োরের মতো মুণ্ডু নিচু করে একটা নির্দিষ্ট গতিতে আসছিল, টাল সামলাতে পারেনি। ড্রাইভার নেমে যাচ্ছে। প্রচণ্ড হুঙ্কার দিচ্ছে। গাড়ির সাইডটা টাল খেয়ে গেছে। অনিন্দ্য নেমে দাঁড়ায়— 'আঃ সুদর্শন। ছাড়ো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ঢোকে সুদর্শন— জানেন না সার, মারুতি হলে সাইড ফুটো হয়ে যেত। মেমসাহেবের গায়ে সোজা এসে ফুঁড়ে যেত... নেহাত... গোঁ-ও-ও করে স্টিয়ারিং ঘোরায় সুদর্শন যেন ম্যাটাডরের হাতের লাল কাপড় দেখা খ্যাপা মোষ শিং বাঁকিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

আমি মৃদু হেসে বলি— জয়ন্তী আজ খুব বেঁচে গেলে কিন্তু।

—ঠাট্টা নয় সমুদ্র, সত্যি! মৃত্যুর থেকে মোটে আড়াই ইঞ্চি দূরে।

—রিয়্যালি, আজ জয়ন্তীর একটা ফাঁড়া গেল। অনিন্দ্য বলল, তবে তোমারও স্বস্তিতে থাকবার কিছু নেই সমুদ্র! ভেবে দেখ ঠিক কী ছিল মোমেন্টামটা, গাড়ির খোলটার রেজিস্ট্যান্স কতটা, ব্যাটা জয়ন্তীকে ফুঁড়ে তোমার দিকে এগোত, না ওকে জাস্ট একটা ঝটকা মেরে তোমার দিকে এগোত... কষে না ফেললে তো বোঝা যাবে না?

যতীন্দ্রমোহন থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ পার হয়ে আমরা এসপ্ল্যানেড ঢুকে যাই। কে যেন কোথাও থেকে বলেছিল 'অ্যাকশন রিপ্লে', এখন বলল— 'কাট'। সারা দিন ধরে কাজে, অকাজে, অফিসে, বাইরে, একা, সহকর্মীদের সঙ্গে, ক্যান্টিনে, ইউরিন্যালে... দুঃশ্রাব্য কণ্ঠ নিচু স্বরগ্রামে অমোঘ স্বরস্থাপনা করে যায়— 'অ্যাকশন', 'অ্যাকশন রিপ্লে' 'কাট' —'ওভার।'

'মৃত্যুর থেকে আড়াই ইঞ্চি দূরে' —এই শব্দযূথ আমার মাথা থেকে কিছুতেই যেতে চায় না। সারাদিন ঘুরে ফিরে কথাগুলোর

সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। এমন ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যাই যে ক্যান্টিনে বেয়ারাকে আর একটু হলে বলে ফেলেছিলুম, ফিসফিস করে।

শিবেন বলল— কী বললেন সার, আড়াই ইঞ্চি দূরে?...

—উঁহু,— আমি সজোরে মাথা নাড়ি, আড়াই ইঞ্চি পুরু বুঝলে? ওমলেটটা করবে আড়াই ইঞ্চি পুরু।

—সে আবার হয় না কি সার? চার পাঁচটা ডিম দিয়ে সে যে একটা ছোট মতো যাচ্ছেতাই হবে...

—আহা হা, তোমরা ময়দা দিয়ে ডিম দিয়ে কী যে একটা করো না?

—ও, মোগলাই পরোটার কথা বলছেন? তাই বলুন সার, ওপরে কিমা দেব তো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো বুঝেছ... আমি ওকে ভাগাই।

—হঠাৎ আজ তোমার মোগলাই পরোটার শখ?— পাশের টেবিল থেকে সুমিত বলল।

—হল... আমি প্রশ্নটাকে ওইখানেই থামিয়ে দিই। ওই যে বললুম কারও সঙ্গে আমার ঠিক জমে না। শুধু শুধু বেকার কথা কতকগুলো... আসে না। মোগলাই পরোটার সুতো ধরে অনেক দূর যাওয়া যেত। সুমিত তো অনায়াসে পারত। তৈরি হয়েই ছিল। ক্যান্টিনের রান্নার কোয়ালিটি। অফিসার গ্রেডের জন্যেই বা একটা সার্টন পার্সেন্টেজ সাবসিডি থাকবে না কেন? সেটা কি আমাদের পার্কস-এর অন্তর্গত হওয়া উচিত নয়? ...এর থেকে মোগলাই কোথায় কোথায় ভাল করে, কোন রেস্তরাঁয় আলাদা করে মোগলাই ঘর খুলছে... এই মতো এক শব্দ-শৃঙ্খল, অবসর কাটানোর, শুধু সময় কাটানোর একটা খেলার মতো। এ একটা বলল, ও আর একটা যোগ করল। সে একটা... যে কোনও প্রসঙ্গ ধরে চলতে পারে এই খেলা— মোগলাই কুইজিন, অসুখ, মোজা, ফিলম, এন্টার দ্যা ড্রাগন, এম্পারার... ডাক্তার, নারী, লায়েবিলিটি, ভ্রমণ, ট্রাম-বাস, রাজনীতি, যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্র। যে কোনও, যে কোনও বিন্দু

থেকে এক অনন্ত শব্দঘর তৈরি হতে পারে, হয়ে চলেছে অবিরাম। গমগম করছে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ এই রকম নানান অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে। হয়তো অপ্রাসঙ্গিকও নয়। আসলে খুব দায়িত্বহীন লঘু জল্পনা, শব্দ থেকে শব্দে বয়ে যাচ্ছে শুধু। কোনও সিদ্ধান্ত বা সমাধানের ঘাটে ভিড়ছে না।

কে যেন বলে ওঠে জীবনটা তো শুধু সিদ্ধান্ত নয়। সমাধানও নয়। সমাধান হলে তো হয়েই গেল। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে তো মন-মগজের আর কোনও কাজ থাকে না।

—তা হলে কী? তা হলে কী?

—তাই এই টেবিল। চারপাশে চেয়ার। উৎসাহী মুখ, তাই-ই এই শব্দযোগ। এ কোনওদিন শেষ হবে না। এটাই মজা এ খেলার।

—অর্থহীন মনে হয় যে! আধ-পাগলের সিকি-পাগলের প্রলাপ।

—অর্থ নেই। মানে নেই, শেষ মানে কে বলবে? অথচ বেঁচে থাকতে হলে, ভাবতে হয় মানে আছে। শব্দ শুধু শব্দ নয়, তার পেছনে মানে, তার পেছনে আইডিয়া। এমন একটা মোহচক্র তৈরি করতে পারাই বেঁচে থাকা।

ক্রমাগত তারিখ পেছোতে পেছোতে শেষ পর্যন্ত আজ ত্রিমূর্তি—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অর্থাৎ জয়ন্তী, মুকুলিকা ও দীপা আমাদের বাড়ি এসেছে। মেয়ে বলতে এতদিন আমি কয়েকটা রকম বুঝতাম। মা-রকম বোন-রকম সহকর্মী-রকম আর যৌনটান-রকম। তাই কোনওদিন তাঁদের দিকে ভাল করে তাকাইনি। কেন না মা একটা বলয়, তেল-হলুদ-ধনে-জিরে-সাবান-সিঁদুর, মৌন নম্রতা যাকে ইদানীং আর নম্রতা নয় উদাসীনতা বলে মনে হয়। বোন অবশ্য, বিশেষ করে আমার বোন, ঠিক শুধু একটা বলয় নয়। সে সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মতো। মধ্যবিন্দুতে সেখানে ভালবাসা, যেখানে বিশ্বস্ততা সেখানে ঠিক আছে। কিন্তু তার বাইরে যে তরঙ্গ ক্রমাগত বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে তার সবটা আমি চিনি না। তবু জানি এইখানে

একটা অনুকূল হাওয়া বয়, সারা দিন-রাত, ইচ্ছে করলেই সেই হাওয়ায় আমি স্নান করতে পারি। আমি ইচ্ছে করি না যখন-তখন। কিন্তু ফিনকি এখনও পর্যন্ত আছে। জয়ন্তীরা এতদিন ঠিক অনিন্দ্যদের মতোই ছিল, কেবল মেয়ে বলে তাদের সঙ্গে একটু বেশি সৌজন্য, বেশি দূরত্ব ছিল, দূরত্ব তো সবার সঙ্গেই। সৌজন্যেরও কোনও কমতি নেই। তবু জয়ন্তীরা লেডিজ সিট, লেডিজ ফার্স্ট। আর যৌন-টানটা ছিল নারী-নিরপেক্ষ। এক সময়ে, এখনও মাঝে মাঝে নিজের ভেতর থেকেই সেই টান অনুভব করি। ঠিক অন্য দৈহিক টানগুলোর মতো। মেয়েদের সংস্পর্শে যে যৌনতা জাগে তার সম্পর্কে আমি খুব সতর্ক। সেই চুম্বক কোথাও টান মারছে বুঝলেই আমি সরে যাই। দীপা আমাকে নারীস্পর্শের সম্মোহনের কথা দারুণ চিনিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আর একটু চক্ষুষ্মান হয়েছি। ব্যক্তিস্বরূপিণী নারী কে কী সে সম্পর্কে আমি আর অত অবোধ অত অন্ধ নেই। তাই-ই বললাম সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

জয়ন্তী সব সময়ে আগে এগিয়ে আসে। তার সমস্ত ধরনের মধ্যে একটা সরল আহ্বান আছে যা এক ভারহীন সম্পর্ক তৈরি করে। —আপনি পুলককে চেনেন? —আমার কাজিন... ওর কাছ থেকে আপনার কথা কত শুনেছি।... একদিন আপনাদের বাড়ি নিয়ে যাবেন...উঁহুহু বলে নয়... না বলে... ফিনকি কে?... ঠিক আছে ওকে, শুধু ওকে... এই রকম আধা-অন্তরঙ্গ কথায় জয়ন্তীর উপস্থিতি। ফর্সা, একটু মোঙ্গলীয় ধরনের চাপা মুখ। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা চোখের বাঁকে, নাকের টানে। মুকুলিকাকে আমি আগে কোনওদিন দেখিনি ভাল করে, কেন না ও খুব চুপচাপ, নিজেকে লুকিয়ে রাখে। খুব হালকা রঙের শাড়ি পরে, প্রসাধন করে না, রং উজ্জ্বল কিন্তু ফর্সা নয়, ওর চুল কাঁধের একটু নীচে পর্যন্ত ঢেউ খেলানো। একটা ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখে। মুখটা একটুও ভাল মানুষ ভাল মানুষ নয়। অথচ আন্তরিক। ও কিন্তু সোজা মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। যেন কিছু বলতে চায়। বলবার আছে। কিন্তু বলবে না। নিজের ভেতরে রেখে দেবে। না বলা কথার রহস্য মুকুলিকাকে কী

রকম দুর্বোধ্য করে রেখে দিয়েছে। দীপা আজ এসেছে মোহিনী বেশে নয় একেবারেই। তার ছোট চুল একটু বড় হয়েছে বুঝি বা। চৌকো গড়নের মুখে স্মার্টনেস খেলা করে বেড়াচ্ছে, সাদা শাড়ি পরেছে একটা। তাতে ওকে খুব অধ্যাপক-অধ্যাপক লাগছে দেখতে।

জয়ন্তী বলল— জানেন তো মাসিমা, পুলু যে আমাকে সমুদ্রর কথা কত বলেছে! কত বলেছে! এক অফিসে কাজ করবি তো, দেখবি কী ম্যাচিওর, সব ঠিক করে দেবে।

মা মৃদু হাসলেন— কী ঠিক করে দেবে? ঠিক করে দেবার কী আছে!

—বাইরে তো আর বেরোননি মাসিমা, কর্মক্ষেত্র যে একটা কী জিনিস।— দীপা বলল।

—তা সমু সব ঠিক করে দিয়েছে? মা মুকুলিকার দিকে তাকিয়ে বললেন। ও শুধু হাসল। সে হাসির অনেক রকম মানে হতে পারে। হয়তো বলতে চায়। —হ্যাঁ সব ঠিক করে দিয়েছে। হয়তো বলতে চায়— ঠিক করে দেবে? অত সহজ? আবার হয়তো কোনও মতামত দিতে চায় না। কোনটা আমি বুঝতে পারিনি।

মা বললেন— হ্যাঁ আমার ছেলে খুব করিৎকর্মা।

এই প্রথম আমি মায়ের মুখে কোনও বিশেষণ, আমার কোনও বর্ণনা শুনলাম। 'আমার ছেলে'টুকু প্রথমে একটা তীব্রতায় এসে আছড়ে পড়ল আমার বেলাভূমিতে। তাই তো! মা তা হলে জানেন, স্বীকার করেন আমি মায়ের ছেলে? 'আমার ছেলে' না বলে তো 'ও' বলতে পারতেন, 'সমু' বলতে পারতেন, তা হলে আমার কিছুই মনে হত না। কিন্তু 'আমার ছেলে' বলার মধ্যে একটা মালিকানার স্বীকৃতি এমনকী অহঙ্কার আছে সেটা একটু পরে আরও স্পষ্ট হয়— 'করিৎকর্মা'। এই বিশেষণটা আমার সম্পর্কে আদৌ প্রযোজ্য তা কখনও মনে করিনি তো? কোনও হীনম্মন্যতা আমার নেই। কিন্তু আমি একটা করিৎকর্মা মানুষ। মানে অনেক কিছু চটপট পারি? কী-ই বা পেরেছি আমি কতকগুলো রুটিন কাজ ছাড়া? কীই বা পারতে চাই?

দীপা বলল-- সেটা কিন্তু আমরা প্রথম-প্রথম একেবারেই বুঝতে পারিনি। হি নেভার শোজ অফ্। কিন্তু কাজের সময়ে দেখি জাস্ট দু-চারটে কথা দিয়ে সব ঠান্ডা করে দিল।

ফিনকি চোখ বড় বড় করে বলল, ঠান্ডা করে দিয়েছিস? ছোড়দা? তেড়ে মেরে ডাণ্ডা, না কি?

সেটাই তো— জয়ন্তী হাসল— সমুদ্রকে ডাণ্ডা ধরতে হয় না। ওই যে দীপা বলল জাস্ট দু-চারটে কথা!

—-তা-ও উঁচু গলায় না, রেগেমেগেও না, এতক্ষণে মুকুলিকা বলল। এই মেয়েটিও তা হলে সব লক্ষ করেছে! আমি রাগি না, উঁচু গলায় কথা বলি না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

—তাই তো আমরা বলাবলি করি— দীপা বলল—একজন ডিপ্লোম্যাট হবার সব গুণ আছে সমুদ্রর। কী? কিছু বলো সমুদ্র? আমরা এত কিছু বললাম।

আমি মৃদু হেসে শুধু বলি— 'তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান, গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।'

দীপার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রংটা ফর্সা বলে ফ্যাকাশে হওয়াটা চট করে সবাই বুঝতে পারবে না। কিন্তু ওর মুখ-চোখ, কথা-বলা, চলন সবকিছুর মধ্যেই একটা উচ্ছ্বাস, সজীবতা আছে। সেটাই নিভে গেল। তবে সে-ও ডিপ্লোম্যাট কম নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল— বাপ রে কতক্ষণ ধরে আর এই তেলানো চলবে তোদের জয়ন্তী! মাসিমা স্যরি। একেবারে কবিতা-টবিতা, সেন্টিমেন্টালিটির চরম। চলো চুমকি তোমাদের বাড়িটা খুব ইন্টারেস্টিং। তুমি কোন ঘরে থাক, চলো দেখে আসি।

—চুমকি নয়, ফিনকি।

—এমা, স্যরি ভাই।

—স্যরি হয়ে আর কী করবে! এই ভুল অনেকেই করে। আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। চলো, দেখবে তো! ছোড়দা তোর বন্ধু, তুইও আয়।

ফিনকি ওদের নিয়ে এগিয়ে যায়। আমি মায়ের দিকে চাই—

কিছু আনব টানব? শিঙাড়া কচুরি মিষ্টি...

—না, ফিনি তো খুব কষেটষে মাংস রাঁধল। আমাকে বলে গেল লুচি করতে। আমি রান্নাঘরে যাই। তুমি ওপরে যাও। —যাবার সময়ে মা বলে গেলেন— মেয়েগুলি বেশ।

আমার দিকে বিশেষ ভাবে তাকালেন না। অথচ কথাগুলোর মধ্যে কোথাও একটা বিশেষ সুর আছে। মা যেন তাঁর সম্মতি জানাচ্ছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। গো অ্যাহেড।

আমাদের এই সব পুরনো বাড়ির এই রকমের সেকেলে ধাঁচ। বাড়িতে কোনও মেয়ের আগমন হলেই এঁরা ভাবেন, এটা বিয়ের জন্য দেখতে আসা, দেখাতে আসা। চাপা বিরক্তিতে আমার গা গুলিয়ে ওঠে। সেই কোন কাল থেকে মেয়েদের সঙ্গে ক্লাস করছি, ওয়ার্কশপ করছি, এখন চাকরি করছি। মেয়ে-বন্ধু মানেই প্রেমিকা এই বস্তাপচা ধারণাটার বাইরে আমাদের অন্দরমহল কিছুতেই আর ভাবতে পারল না। অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে এখনও। আমি বেরিয়ে যাই। কাছাকাছি এক বিখ্যাত দোকান থেকে দু' রকম মিষ্টি কিনি, এই সন্দেশগুলো খেতে খুব ভাল। ভেতরে বাদামের পুর দেওয়া, ওপরে গোলাপ গন্ধ। আর লেডিকেনি এরা করে একেবারে বিয়েবাড়ির ভিয়েনের মতো। মিষ্টিগুলো মায়ের কাছে জমা দিই। মাকে বলি— একটা প্লেটে কিছু মিষ্টি দিতে। জেঠুকে দেব। উনি মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসেন।

মিষ্টি নিয়ে জেঠুর ঘরে ঢুকছি, পাশের ঘর থেকে ঝনঝনে হাসির ঝঙ্কার এসে কানে লাগল।

আমাকে দেখে জেঠু ভিতু খরগোশের মতো মুখ তুলে বললেন— কে সমু। কে, ওরা কে?

—ওরা তিনটি মেয়ে জেঠু, আমার কলিগ। জাস্ট বেড়াতে এসেছে।

—ফিনকির মতো?

—হ্যাঁ। আর একটু বড় হবে। আপনার জন্যে মিষ্টি নিয়ে এসেছি। খেয়ে নিন।

—খুব মাংসের গন্ধ পাচ্ছি।

—হ্যাঁ। রাতে খাবেন। লুচি দিয়ে।

—না, না রুটি। গ্যাস ভাল না। আমার গ্যাস হয়। সমু, ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে না?

—আপনি করে বলছেন কেন? ওরা আপনার মেয়ের মতো।

—তবু...

—তবু নয়, আপনার মতো বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আপনি-আপনি করলে কারও ভাল লাগবে না।

উনি আমার মুখের দিকে ব্ল্যাঙ্ক চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ। তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—ওখানে কোনও মেয়ে ছিল না, জানো। রাঁধুনি না, ঝি না, নার্স না, সব ধুম্বো ধুম্বো ব্যাটাছেলে। কী বলব আমার দম আটকে আসত সমু। একেবারে রিভোল্ট করত মনটা...

—আরে এখানে?...

মুখটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল— এখানে মা আছেন, মেয়ে আছে, ঠাকুমা আছেন, আহ্— কী শান্তি! কী শান্তি! আমি বড় শান্তিতে ঘুমোই সমু।

কী বলতে চাইলেন জেঠু। মেয়ে থেকে ওঁর আর ভয় নেই? পুরনো বিশ্বাসাঘাতের জ্বালা জুড়িয়ে গেছে? উনি কি এখন মেয়েদের প্রকৃত মূল্য, মানুষের জীবনে কোথায় তাদের স্থান— তা উপলব্ধি করেছেন? কে জানে? তবে আমার সামান্য একটু দ্বিধা ছিল সেটা কেটে গেল। যদিও ওঁর কথা আমি পুরোপুরি বুঝেছি বললে ভুল হবে।

হইচই করতে করতেই ওরা ফিনকির সঙ্গে এ ঘরে এল। জেঠু তখনও তাঁর লেডিকেনি শেষ করেননি।

চট করে উঠে উনি হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। হাত থেকে স্টিলের রেকাবি আর চামচ ঝনঝন করে পড়ে গেল। আধখানা লেডিকেনিও।

—এমা! ও জেঠু এ কী করলেন? নমস্কার করতে আপনাকে কে বলেছিল? কলকল করে উঠল জয়ন্তী।

—ছি ছি, ফিনি দাঁড়াও মা আমি তুলে দিচ্ছি। —ফিনকিকে কিছুতেই তুলতে দিলেন না ওগুলো।

—খালি অপাট। খালি অপাট— তোমার নমস্কার আগে না লেডিকেনি আগে? কৌতুকের স্বরে ফিনকি বলল, ঝটিতি একটা ন্যাতা নিয়ে এসে মুছে নিল লেডিকেনির রস।

ওরা তিনজনে নিচু হতেই জেঠু কাঠের পুতুলের মতো হাতজোড় করে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ রকম একটা গরুড়ের স্ট্যাচু যেন আমি কোথায় দেখেছি।

জেঠুর ঘরে বসে, দাঁড়িয়ে ওরা অন্তত মিনিট দশেক গল্প করল। দেয়ালে সাঁটা বোর্ডের ওপর ফর্মুলাগুলো দেখল। তারপর চলে আসতে আমি বাঁচলুম।

লুচি-মাংস-মিষ্টি ইত্যাদি চেটেপুটে খেয়ে একেবারে বিদায় হতে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

—ওফ্‌ফ্‌ফ্‌।

—তুই তো এত ভিতু অধৈর্য ছিলি না ছোড়দা!

—তাই বলে বাড়ি এসে ঘরে ঘরে ঢুকে ইন্সপেক্ট করবে? চলো তোমার ঘরটা দেখে আসি। এনক্রোচমেন্ট নয়?

—তোর ঘরটা কিন্তু দেখাইনি। বন্ধ করা ছিল। বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া আমি খুলিনি।

—কেন? বলেনি 'সমুদ্রের ঘরটা দেখব!' মুখে তো কিছুই আটকায় না! আমি যদি ওদের কারও বাড়ি গিয়ে এর ঘর ওর ঘর দেখতে চাই, শোভন হবে!

লুটিয়ে লুটিয়ে হাসতে লাগল ফিনকি। তারপরে চোখে হাসির জল নিয়ে মুখ তুলে বলল—তুই রাগ করছিস, দিস ইজ গুড।

কেন কী বৃত্তান্ত আমি আর জিজ্ঞেস করিনি। তখন থেকে অফিসের পোশাক পরে আছি। ওদের যার যার বাসে তুলে দিয়ে তবে মুক্তি। চান করি। পাজামা-পাঞ্জাবি চাপাই। বেশ শীত পড়েছে, কিন্তু এমনই আমার অভ্যেস। দরজাটা তখনও খুলি না। কেন না ফিনকি নিশ্চয়ই কৌতূহলে বেলুন হয়ে রয়েছে। আমার বেরনোর যা

অপেক্ষা। জানলাগুলো শেষ দুপুরের দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, মশার জন্য। এখন সন্ধে উতরে গেছে। আমি জানলা দুটো খুলে দিই। আমার জানলার বাইরে কুড়ি ফুট মতো রাস্তা। তার ওদিকে দোতলা বাড়ি— সামন্তদের। বহুদিন আমাদের প্রতিবেশী। পুলুদের বাড়ি এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। শীত মানেই ভারী বাতাস, ধোঁয়া-মেশা, ময়লাটে। এই ময়লাটে হাওয়া ভেদ করে আকাশের আসল মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ যেন অস্বচ্ছ পর্দার ওপারে কোনও পর্দানশিনের মুখ, উৎসুক হয়ে যাত্রা দেখতে বসেছে। দেখা যায় না। দেখতে খারাপ লাগে। এত বিকৃতি। তবু ওই দিকেই তাকিয়ে থাকি, মনে প্রশ্ন নিয়ে, অস্বস্তি নিয়ে আর কোন দিকেই বা আমরা তাকাতে পারি!

জয়ন্তীকে প্রথম তুলে দিই বাসে, বন্ধুদের দিকে চেয়ে খুব অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ও বাসের হ্যান্ডেল ধরে উঠে গেল। শীত বলেই বোধহয় তেমন ভিড় নেই।

মুকুলিকা লাল চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল— আস্তে করে বলল —আপনি কি লাকি! বাড়ির লোকেরা সবাই কী ভাল! শুধু আপনার বাবাকে দেখা হল না।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাই— আটটা বাজে, আর ঘণ্টাখানেক টেনে থাকতে পারলে শুনতে পেতে!

—শুনতে পেতুম? কী?

—আমার বাবার আগমন বা আবির্ভাব যাই বলো।

—দেখা নয়? শোনা? —দীপা বলল।

—শোনাও শুধু নয়, টের পাওয়া যাকে বলে।

দুজনে দুরকম স্বরে হেসে উঠল।

—তা হলে তো উনি তোমার মতো নয়।

—না, উনি বাড়ির সবার প্রাণশক্তি একাই ধারণ করেন।

—ইন্টারেস্টিং— দীপার উক্তি।

আমি বলি— তোমার দেখাশোনার সবটাই কি ইন্টারেস্টিং আর আন-ইন্টারেস্টিং-এ বিভক্ত?

তাকাইনি তবু বুঝতে পারছি মুকুলিকা মিটি মিটি হাসছে।

—তোমার জীবনের সবটাই যেমন কর্তব্যে আর অকর্তব্যে বিভক্ত।

আমি উত্তর দিতে যাই না আর। কেন না এ তো স্পষ্ট ও জিততে চায়। যা চায় তা ওকে পেতেই হবে। আমাকে চেয়েছিল, পেয়েছে। এখন কথার খেলায় জিততে চাইছে। জিতুক।

মুকুলিকার বাস এসে গেল, ও থাকে উল্টোডাঙার দিকে, সল্টলেকের মুখে।

—তুমি একটা ট্যাক্সি নিলে পার— আমি দীপাকে বলি।

—ওহ্, আর একটুও আমাকে সহ্য করতে পারছ না, না? ঝাঁঝিয়ে উঠল দীপা।

আমি জবাব দিই না। ওর অভিযোগ হোক, অনুযোগ হোক সেটা তো সত্যিই! আমি কি বলব? —ঠিক বলেছ দীপা, তুমি বড় আনইন্টারেস্টিং।

বলা যায় না। এ ধরনের অভদ্রতা, ঝগড়া-কাজিয়া আমার চরিত্রে নেই।

—মৌন মানেই সম্মতি। ঠিক আছে আমাকে সইতে পারছ না। ইটস ন্যাচার‍্যাল। যাই হোক, তোমার জেঠু একটু... মানে বই-টইগুলো দেখছিলাম— খুব পণ্ডিত লোক মনে হল, বিয়ে করেননি কেন?

আমি ধীর গলায় বলি— দীপা, যে বাড়িতে তোমার আসার কথা ছিল, অথচ আসনি, সে বাড়ির সব কথায় তোমার এত কৌতূহল কেন? এটা ঠিক নয়।

ও একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে— স্যরি। কৌতূহল নয়। আমার কেমন মনে হল উনি খানিকটা তোমার মতো। চেহারায়, স্বভাবে। তাই—

—হতেই পারে। বাড়ির একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারার, স্বভাবের মিল থাকতেই পারে। কিন্তু তাতে কী? আমার সম্পর্কে জানার প্রয়োজন তো তোমার ফুরিয়ে গেছে। আমার জেঠু

আমার মতো না আমার কাকু আমার মতো এ খবরে তোমার কাজ কী!

রাস্তার আলো ওর মুখের ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। আমি বুঝতে পারছি ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি নিবিষ্টমনে টু বি বাসের আসার পথের দিকে চেয়ে আছি।

—সমুদ্র। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আমার জন্যে না, আমি জয়ন্তী আর মুকুলের জন্যে খোঁজখবর করছিলাম। ওরা দুজনেই তোমাকে দারুণ পছন্দ করে। তুমি বয়স বাড়লে কীরকম হবে...

এইবারে আমার ধৈর্যভঙ্গ হয়। আমি বুঝতে পারি আমার মাথা দিয়ে চিড়িক বিজলি হেনে যাচ্ছে ক্রোধ। আমার তা হলে ক্রোধ আছে!

বলি— তুমি তা হলে একদিকে আমার আর আর একদিকে তোমার দুই বান্ধবীর গতি করতে চাইছ। তুমিই আমার, আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা! স্পর্ধা বটে! তবে শোনো, আমার জেঠু যে রকম ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন তাঁর ধারে কাছে আমরা কেউ নেই। কিন্তু তিনি আমার ধাতুতে গড়া ছিলেন না। একটি মেয়ে প্রেমের ভান করে তাঁকে রাম ঠকান ঠকায়, তিনি উন্মাদ হয়ে যান। ভায়োলেন্ট। দীর্ঘ আঠারো বিশ বছর তিনি অ্যাসাইলামে ছিলেন। মানে পাগলা গারদ। প্রাইভেট। সম্প্রতি আমি নিয়ে এসেছি। তোমার বন্ধুদের সুযোগ-সুবিধে মতো এই ভেতরের কথাটা জানিয়ে দিয়ো। নাউ, গেট ইনটু দিস ট্যাক্সি।

আমি একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করাই।

—দেশপ্রিয় পার্ক ভাই, ঠিক সে লে যানা।

ট্যাক্সি ছাড়বার আগেই আমি ছেড়ে যাই।

## ১৬

আমি কি নারীবিদ্বেষী হয়ে যাচ্ছি? কিংবা হয়েই জন্মেছি! আমার মা'র সঙ্গেও তো আমার সম্পর্ক হয়নি! সেটা কার দোষ, মায়ের না আমার? নাকি পরিস্থিতির? কোনও মেয়েকে আজ পর্যন্ত আমি চাইনি। কেন? এ কি সেই তরুণ বয়সে কুৎসিত উলঙ্গ বেশ্যাকে দেখার ফল? যা সুন্দর, যা স্বাভাবিক, সৃষ্টির প্রথম যে শর্ত আমাদের শরীর জুড়ে রয়েছে তাকে বিকৃত উৎকট চেহারায় দেখাল আমার নিয়তি। অথচ, আমার সহপাঠীদের তো কিছু হল না! তারা প্রথম যৌবনের কৌতূহল ও প্রবৃত্তি মেটাতে বেশ্যাসঙ্গ করল, তারপর একদিন কোনও মেয়েকে ভালবেসে বা গুরুজনের ব্যবস্থাপনায় বিয়ে করে জীবনভর আইনসঙ্গত নারীসঙ্গ করছে, কোথাও কোনও কাঁটা ফুটছে না, বিষ উগরোচ্ছে না! যদি বা সুন্দর আমাকে দেখা দিল, স্বর্গ আমার জানা হল, পরমুহূর্তে এ কী অদ্ভুত প্রতারণা! আমার ভাগ্যেই ছিল? এখন আবার জানতে পারছি আরও দুটি মেয়ে আমার অনুরক্ত। এমনই নাকি আমার চুম্বক টান! তা এরাও বোধহয় সেইভাবেই আমাকে চাইছে। এক রাতের বনিতাগিরি!

কিন্তু, আমিই কি সত্যি চিরকালের জন্য কাউকে চাইছি। দীপাকে চেয়েছিলুম কেন না সেটাই সামাজিক রীতি। সামাজিক কর্তব্য, দায়িত্ব। যদি ঘটনাটা না ঘটত তা হলে তো চাইতুম না। এই প্রথম আমার মনে হল প্রশ্নটাকে না এড়িয়ে সোজাসুজি এর মুখোমুখি দাঁড়াই। কীভাবে দাঁড়াব? সোজাসুজি জিজ্ঞেস করব? তা কি করা যায়! আমার চাপা স্বভাব। স্বভাবের বিরুদ্ধে কি এতখানি যাওয়া যায়? ঠিক আছে। আমি পর্যবেক্ষণশীল হব। জীবনকে সহজে নিতুম। এবার সহজে নেব না। জটিলে নেব। নিজেও জটিল হব, সতর্ক।

ছোড়দা, তোর কী হয়েছে বল তো? —আমার দিকে চোরা চাউনি হেনে ফিনকি অবধারিত বলল। ফিনকির চুল ফুলে রয়েছে। সালোয়ার কামিজ পরে আজ ওকে আরও ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।

কনুই ভেঙে হাতের পাতায় মুখ রেখে ও আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

—কী আবার হবে?

—তা অবশ্য। আমাকে বলবিই বা কেন। কে একটা খুড়তুতো বোন।

আমি হেসে ফেলি। ও-ও হাসে।

—তুই প্রেমে পড়েছিস, না রে?

আমি চমকে উঠি— ইস্‌স্‌ কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি ফিনকি বুঝলি। তুই নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছিস। আমার খোঁজ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু কী জানিস জারতুতো ভাই তো! নিজের দাদা হলে যতটা ...

ফিনকি আমাকে একটা রাম-চিমটি কাটল। চোখ হাসিতে চকচক করছে।

হঠাৎ আমার মনে হল আমি এক তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। পুরো দৃশ্যটা আধো-অন্ধকার। চারদিকে ভূতের মতো কয়েকটা গাছ। আকাশে তিন চারটে তারা জ্বলজ্বল করছে। বহুদূর থেকে কে আমার দিকে আসছে। মেয়েই বোধহয়। ফিনকি? ফিনকির মতোই তো দেখায়, কেমন একটা কালো মতো পোশাক পরেছে— ছায়ার সঙ্গে মিশে আছে যেন। আসছেই আসছেই, কিন্তু এগোচ্ছে না, একটুও এগোচ্ছে না।

—কী রে? একটা ঝটকা দিল ফিনকি।

—হ্যাঁ, কী বলছিলি?

—বলছিলুম খুড়তুতো বোনকে প্রেমে পড়ার গপ্পো করা যায় না।

—করা যায়, কিন্তু মজাটা হচ্ছে কিছুতেই প্রেম ঘটছে না।

—তুই চেষ্টা করছিস?

—ধুর, চেষ্টা করে হয়? তুই-ই বল্‌।

—চেষ্টা করাটা দরকার, তোর বিশেষ করে।

—কেন? আমার আবার বিশেষ করে কেন?

—ছোড়দা তুই বড্ড একা। এত একা হওয়া ভাল না।

—তুই একা নয় তো?

—না আমি একা নই। আমার অনেকে আছে। মা বাবা জেঠু, দিদা, বন্ধুবান্ধব, মাস্টারমশাই। তোর কেউ নেই!

আমি এবার গম্ভীর ভাবে বলি— তুইও নেই?

—আমি তো থাকতে চাই। কিন্তু তোর ঘরের ছিটকিনি তুই সব সময়ে লাগিয়ে রাখিস। তুই কাউকে ঢুকতে দিস না।

—হয়তো আমার মন নেই।

—মন যে আছে সেটা জানার জন্যে কারও দরকার হয় ছোড়দা, তুই প্রেমে পড় প্লিজ।

আমি হাসি সামলাতে গিয়ে কেশে ফেলি, তারপর ও একটুও হাসছে না দেখে, গম্ভীর ভাবে বলি— প্রেমে পড়লেও যদি একা থেকে যাই?

—দূর, প্রেমে পড়া মানেই দরজা খুলে গেল। মুখোমুখি দুটো দরজা। সেই খোলা দরজা দিয়ে একা মানুষটা বেরিয়ে যায়, অন্তত আর একটা মানুষের কাছে। ছোড়দা আমার কিন্তু তোর তিন কলিগকেই খুব ভাল লেগেছে।

—তা হলে তুই-ই ওদের প্রেমে পড়েছিস?

—ঠাট্টা নয় রে। তুই যাকে ইচ্ছে পছন্দ করতে পারিস, বাড়িতে কোনও আপত্তি হবে না।

মনে-মনে ভাবলুম— হায় হায়, বাড়ির আপত্তির কথা কে কখন ভেবেছে! নিজের আপত্তিকেই সামলে উঠতে পারছি না।

বলি— ছাড় ফিনকি, আমার এই প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না, তোর কথা বল।

—আমার কোন কথা? এত কথা আছে, কোনটা বাছব?

—বাপ রে! বলিস কী! এত?

—হ্যাঁ, যেন এটা স্বতঃসিদ্ধ এমন ভাবে বলল ও। অনেক কথা থাকাটাই যেন স্বাভাবিক।

—তো আমাকে তার এক গণ্ডূষ দে।

—ছোড়দা তুই কী নিয়ে ভাবিস জানি না, আমার মনে হয়,

নিজেকে নিয়ে। মানে তুই স্বার্থপর, নিজের ছাড়া কারও কথা ভাববার তোর মন নেই এটা কিন্তু একেবারেই বলতে চাইছি না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তুই বরঞ্চ উল্টোটাই। তুই জেঠুর কথা এত করে ভেবেছিস, মাকে সেদিন কীভাবে বোঝালি আত্মত্যাগের ইউসলেস মোহ, দাদাকে আমাদের পারিবারিক প্রয়োজন থেকে ছেঁটে ফেলে মান বাঁচিয়েছিস আমাদের। এ সবই। কিন্তু ছোড়দা তুই নিজেকে নিজের সমস্ত সম্ভাবনাসুদ্ধ একটা কৌটোর মধ্যে আটকে রেখেছিস। তোর যেন অনেক দূরে একটা আলাদা বাড়ি আছে, সেখান থেকে এসে তুই আমাদের কাজগুলো করে যাস। তারপর ফিরে যাস তোর নিজের বাড়িতে।

ফিনকি সব সময়ে হাসি-খুশিতে ভরা, ইয়ার্কি-ফাজলামিতে ভরা ফিনকি এইসব অপ্রত্যাশিত কথাগুলো বলছিল আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বাড়ির পরে বাড়ি। বিরাট, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, পাঁচিল দিয়ে ডালপালা মেলে অট্টহাসি হাসছে বট পাকুড় অশথ, ঘরদালান সব খালি পড়ে রয়েছে। আওয়াজ করলে তার প্রতিধ্বনি উঁচু সিলিং-এ, দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে ফিরে আসে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে ধ্বংসস্তূপ, কত দেয়াল, কত ছাদ ভেঙে পড়ে রয়েছে, দালান দিয়ে উঠোনে, উঠোন থেকে ঘরে, ঘরের পর ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন ছোট্ট ছেলে, কিছু খুঁজছে। কিন্তু কী খুঁজছে তা আমার জানা নেই।

সত্যিই তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ওই নাম-না-জানা তল্লাশিতে। মন বলো মন, প্রাণ বলো প্রাণ। আর তাই-ই হয় তো সে পথ চলে আনমনে, কাজ করে যান্ত্রিক, সব বুঝতে পারে, যা করার করে যায় কিন্তু আধখানা সিকিখানা মন দিয়ে। বাকি আধখানা, বা তিন চতুর্থাংশ নিখোঁজ। কেউ কি নেই, কিছু কি নেই যা আমাকে ওই রহস্যাধার বাড়ি থেকে ছুটিয়ে বাইরে বার করে আনতে পারে?

চুপ করে ভাইবোন মুখোমুখি বসে থাকি। এই যে ফিনকি, এ সত্যি-সত্যি কে? আমি একে বেশ পছন্দ করি, এ আমার খুব

আদরের ছাত্রীও। কিন্তু এ কে? এ বাড়িতে এ-ই আমার ঘনিষ্ঠতম, এ জেনে ফেলেছে আমার অন্য বাড়ির কথা, আমিও জানি ওর সমকেন্দ্রিক বৃত্তীয় স্বভাব-কথা। এই জানা ইনস্টিংকটিভ, বা ইনটুইশন জাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তেমন কোনও দৃঢ় সেতু নেই যা বেয়ে আমরা পরস্পরের কাছে পৌঁছতে পারি।

—ও বলে— এই ছোড়দা, মন খারাপ করছিস না কি, আমার কথায়?

দূর ও জানেই না সে-অর্থে আমার মন খারাপ হয়ই না।

—আমি জানি তুই এই উদাসীনতাটা পেয়েছিস মায়ের কাছ থেকে।

এই তো একটা শব্দ পাওয়া গেছে। অন্ধের নড়ির মতো নির্ভরযোগ্য একটা শব্দ— 'উদাসীনতা।' শব্দটা আমরা চিনি, তার অনুষঙ্গগুলো আমাদের চেনা ফিনকি। 'বাড়ি' থেকে 'উদাসীনতা'য় পৌঁছলে বড় স্বস্তি পাই। আমাকে যেন কে খোলামকুচির মতো ছুড়ে দিয়েছিল এক চলন বিলে। হাবুডুবু খাচ্ছিলুম। সযত্নে সেখান থেকে তুলে এনে কেউ স্থাপন করল পাথরের গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জলে। আমার কাজটা সোজা হয়ে গেল।

আমি হাসি, — তো তারপর?

—তারপর মানে, মায়ের উদাসীনতাটা কিন্তু কতকগুলো ঘটনার কারণ, মোটেই স্বভাব নয়। জানিস?

—না তো! কী?

—এই দ্যাখ, কোনওদিন মানুষটাকে জানবার চেষ্টাই করিসনি! আমরা যে একেক জন একেক রকম গড়ে উঠি তার পেছনে একটা কার্য-কারণ থাকে। স্বীকার করছি সহজাত স্বভাবও থাকে খানিকটা। কিন্তু কার্য-কারণটা ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট!

—তা তো বটেই, —আমি ঠেকা দিয়ে যাই। ফিনকি বাজুক। নিজের ইচ্ছে মতো বাজুক।

—জানিস কি? মা একজন স্কলারশিপ পাওয়া মেয়ে! লজিক আর সিভিক্স-এ মায়ের হায়েস্ট মার্কস ছিল ইউনিভার্সিটিতে? সে সময়ে ইনটারমিডিয়েট পড়তে হত!

এ খবর সত্যিই আমি জানতুম না। আরও কিছু শোনবার আশায় চেয়ে থাকি।

—মা শুধু পড়াশোনায় ভালই ছিল না। ভালবাসত খুব। পড়াশোনাটাই প্রাণ ছিল। তার ওপরে মা অপূর্ব গাইত। তুই মায়ের গান শুনেছিস?

আমি অবাক হয়ে বলি— কই না তো!

—আমি মায়ের বাথরুমে গুনগুন থেকে ধরে ফেলি। তারপর জেরা, জেরা। শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হল প্রথমে উস্তাদের কাছে, তারপর পঙ্কজ মল্লিক, শৈলজারঞ্জন এঁদের কাছে গান শিখেছিল। কিন্তু সুদ্ধু কালো মেয়ে বলে মায়ের বাবা-মা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে মনস্থ করেন। যেদিন যেদিন মেয়ে দেখতে আসত মা কলঘরের ছিটকিনি দিয়ে বসে থাকত। কিছুতেই বেরোত না। আমাদের দাদু সব কথা শুনলেন, তারপর নিজে কলঘরের দরজায় ঘা দিয়ে বলেন— মা, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে কলেজে পড়াব, তুমি গান শিখবে— ঠিক যেমন আগে ছিলে তেমনই থাকবে। আমরা তোমার মতো গুণী মেয়েই চাই মা।

এইভাবে বয়স্ক মানুষের পীড়াপীড়িতে আর আদরে মা বেরিয়ে এসেছিল।

—তারপর?

—তারপর? তোর তা হলে কৌতূহল আছে বলছিস!

—নিশ্চয়ই — (ওই যে বললুম আমি শুধু ঠেকা দিয়ে যাই)।

—তারপর খুব ঘটাপটা করে বিয়ে হল। মা থার্ড থেকে ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরীক্ষাটা মিস করল। তা সত্ত্বেও অত ভাল ছাত্রী বলে কোনও অসুবিধে হয়নি, কিন্তু তারপরই প্রেগন্যান্সি, মায়ের প্রাণান্তকর কষ্ট হয়েছিল, হাসপাতালে থাকতে হয় বহুদিন। ড্রিপ চালাতে হয়। দাদা হল, ফাইন্যাল পরীক্ষা এসে গেল, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন বহুদিন। মা বলল— পরীক্ষা দেব না।

দাদু বললেন—ঠিক আছে, পরের বছর দিয়ো। পরের বছর মায়ের দ্বিতীয় সন্তান হল, মেয়ে, এবং মারা গেল, পরীক্ষা দেবার

প্রশ্নই নেই। তারপরে মা কলেজ যেতেও চায়নি। পরীক্ষা দিতেও অস্বীকার করে।

—আর গান?

—ওরে বাবা, দাদু লিবার‍্যাল হলে কী হবে, আমাদের ঠাকুমা ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। ঠাকুমারা সবাই। বাড়ির বউ গান শিখবে?

—কিন্তু সেই কথা দিয়েই তো আনা হয়েছিল!

—এরকম ঠকানো তো অনেক মেয়েকেই হয়! এখনও হচ্ছে!

ঠকানো! প্রতারণা! মেয়েকে! 'ঠকানো' এবং তার শুদ্ধ সংস্করণ 'প্রতারণা' দুটোই আমার ভীষণ চেনা-চেনা লাগে। জীবনে কত শব্দ ব্যবহার করি, তার পুরো মানে না বুঝেই তো করি। ভাষাটা শিখি শুনে শুনে, আবৃত্তি করে করে, তারপর তার শব্দাবলি নিয়মাবলি শিখি। কিন্তু একটা শব্দের পেছনে যে অনেক সময়েই একটা অনুভূতি থাকে, সেটাকে না বুঝলে শব্দটাকে জানা হয় না। 'ভক্তি'— কী মানে এর? জানি না, বুঝি না শব্দটা ব্যবহার করি। 'বিরহ' মানে কী? ব্যবহার করে যাচ্ছি। তার বাইরের খোলসটাকে ছুঁচ্ছি। কিন্তু ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ আসল মানেটা জানবে না। 'ঠকানো', 'প্রতারণা' এগুলো সাধারণত টাকাপয়সা বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারেই ব্যবহার হয়। টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তি যেহেতু স্থূলতর বিষয় তাই ঠকানোর চতুর উল্লাস, ঠকে যাওয়ার ক্রোধ কিছুটা-কিছুটা বুঝি। কিন্তু প্রতারণা যে কত রকম হতে পারে! মা বুঝেছিলেন প্রতারণার মানে, জেঠু বুঝেছিলেন, আমি বুঝেছি। মা পাষাণ হয়ে গেলেন, জেঠু পাগল হয়ে গেলেন, আর আমি কী হলুম? সিনিক, সিনিক বোধহয়। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা আমার মনে হল।

এই যে মা, জেঠু, আমি— আমাদের প্রতারণা, এটার মধ্যে কি একটা পরিকল্পনা আছে? কার? তা জানি না। কিন্তু মা, একজন নারী তাঁকে যেভাবে ঠকানো হল তার প্রতিক্রিয়া আশেপাশে চুপিচুপি রয়ে গেল। সুযোগ খুঁজতে লাগল। জেঠুর ঠকে যাওয়াটা একরকম বদলা। আমারটাও তাই। মায়ের বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছিল, অন্য

নারীরা সেই বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতিশোধ নিল। প্রতিহিংসার ইচ্ছে এবং ফলাফল পরের প্রজন্মে ফিকে হতে থাকে। তাই জেঠু যেভাবে যাতনা ভোগ করলেন, আমি ঠিক সেভাবে করলুম না।

—দাদু কিন্তু ঠকাতে চাননি। ফিনকি বলল— যতদূর সম্ভব সাহায্য করে গেছেন মাকে। প্রথম কথা, প্রতিদিন সন্ধেয় দাদু ফিরলে মা গান শোনাত, ঠাকুমারাও ভক্তিভরে শুনতেন, দাদু চুপিচুপি বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার নাম করে মাকে উস্তাদজির কাছে নিয়ে যান। কিন্তু মা বলে— কাউকে লুকিয়ে মা কিছু করতে পারবে না।

—অর্থাৎ তথাকথিত সততাও এক ধরনের বোকামি, তাই নয়? আমি বলি— তারপর জিজ্ঞেস করি— এই সমস্তর মধ্যে বাবার কোনও ভূমিকা ছিল না?

—নাঃ।

—খুব অদ্ভুত, না?

—নয় বোধহয়। খুব আত্মসর্বস্ব করে ওঁকে তৈরি করা হয়েছিল তো! মা আসাতে বাবার অনেকগুলো প্রয়োজন চমৎকার মিটে গেল। তারপরে সেই মেয়েটিকে পরিবার কেমন ভাবে চালাবে, কী দেবে না দেবে সেটা পরিবারের ব্যাপার।

এইবারে ফিনকি আমার দিকে ফেরে। ওর মনোযোগের কেন্দ্রে আমি। বলল— শুনলি তো, মায়ের ব্যাপারটার পেছনে কতকগুলো কারণ আছে। তোরটার কোনও কারণ নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তুই উদাসীনতাটা মা'র কাছ থেকে পেয়েছিস, আত্মকেন্দ্রিকতাটা বাবার থেকে নিয়েছিস। কিন্তু তুই সে অর্থে উদাসীনও নোস, আত্মকেন্দ্রিকও নোস। এগুলো আমি বুঝি। তুই দাদুর খুব ফেভারিট নাতিও তো ছিলি।

—তা হলে ধরে নে, দাদুই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল। দাদু নেই, তাই বন্ধুও নেই।

—শোন, ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। এতদিন ধরে কারও শোক একরকম থাকে না। থাকা সম্ভব নয়। তার ওপরে তুই যে-রকম হাড়-হিম-করা প্র্যাকটিক্যাল!

—শোকের কথা হচ্ছে না ফিনকি। বন্ধুত্বের কথা হচ্ছে। যে বালক একজন প্রতিষ্ঠিত, জীবনের সব অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ, সদাশয়, সমব্যথী টাইপের বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে আর কারও সঙ্গে সেটা পারবে কেন? সবটাই কি তার জলো আনইন্টারেস্টিং লাগবে না?

হঠাৎ ফিনকির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। চোখ মুছতে মুছতে বলল

—আমি জলো, আমি আনইন্‌ট্‌রেস্টিং?

—আরে বাবা, এতে কান্নার কী হল? তোর কথা বলেছি না কি? বন্ধুদের কথা বলেছি।

—দ্যাখ্‌ যার সঙ্গে যে সম্পর্কই থাক, বন্ধুত্ব হতে কোনও বাধা নেই।

—ঠিক আছে। তোকে একটা ছোট বোন বলে দেখি তো! সেইজন্যে হয় তো! কিন্তু কথা দিচ্ছি, বলবার মতো কোনও কথা হলেই আমি তোকে বলব। ইন দা মীন টাইম ওই মায়ের উদাসীনতা আর বাবার আত্মকেন্দ্রিকতার কম্বিনেশনটা চলুক। হ্যাঁ? —ফিনকি, ছোট্ট একটা ভেংচি কেটে উঠে গেল। ফিনকি আমার ভিন্ন বাড়ির কথা জেনে গেছে। কী করে? জেনেও ও আমাকে কাছে টানে। সবাই ওর মন ছোঁয়, কী করে জানি না। হয়তো কোনওদিন ও কাকাকেও বুঝে ফেলবে, বিশ্বাসঘাতকের প্রতি নৈতিক অসমর্থন থাকা সত্ত্বেও কাছেই টানবে।

## ১৭

শুনলুম বেশ ঘটাপটা করেই বিয়ে হয়ে গেছে শ্রীমতী দীপার। তিনি কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। শ্রীমান আঞ্জনেয়র সঙ্গে ওয়াশিংটন উড়ে চলে যাবেন। ভিসা পেতে সামান্য দেরি। আমি যাইনি কেন বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোর

গিয়েছিলুম। কাজেই এড়িয়ে যাওয়ার অপবাদটা দিতে পারলেন না। উনি আজ এসেছেন রেজিগনেশন দিতে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে। সব বন্ধুদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এগুলো ইনি কীভাবে ম্যানেজ করেন জানি না। তেমন কিছু সাজগোজ করেননি। ঠিক আগেকার মতোই আছেন, খুব সরু একটু লাল সিঁথিতে, তাই দিয়ে যায় চেনা।

—হ্যাললো সমুদ্র, মাস দুই তিনের মধ্যে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে জেনে যেতে চাই তুমি আমায় মাফ করেছ।

ওর সমস্ত চেহারার ভেতর থেকে কৃত্রিম স্মার্টনেস ঝরে গেছে। অথচ ও এখনও স্মার্ট। এটা যে ওর অভিনয় নয়, আন্তরিক কিছু সেটা আমি বুঝি। আমার মুখ দিয়ে সুভদ্র হাসি বেরিয়ে আসে।

—কী মুশকিল দীপা, মাফ করার কী হল? কিচ্ছু নেই। আমি এখন এক্কেবারে নিশ্চিত যে আমার সঙ্গে কোনও স্থায়ী সম্পর্ক না হওয়ায় তোমার তো ভাল হয়েইছে, আমারও ভাল হয়েছে। আবেগের মাথায় কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল।

এত কথা আমি সাধারণত বলি না।

ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠল। খুব আবছা স্বরে বলল— আনন্দের মুহূর্তগুলোর কথাও কি মনে রাখবে না?

—দ্যাখো দীপা, কী মনে রাখব আর কী রাখব না, সেটা তো আমি ঠিক করি না, আমার জীবন, আমার স্বভাব ঠিক করে। আমি ওসব এক্কেবারে ভুলে গেছি। বিশ্বাস করো। প্রথমটা সামাজিক অভ্যাসে একটু রাগ হয়েছিল ঠিকই, খানিকটা অপমানবোধ। কিন্তু তুমি তো জানই আমার ইগো তেমন স্ট্রং নয়। তাই এখন কিচ্ছু নেই। সাফ সব। স্মৃতি আসে স্মৃতি যায়, মনটা একটা ফাঁকা স্লেটের মতো, স্মৃতি আঁচড় কাটে, ঘটনাস্রোত মুছে দেয়, আবার আঁচড় ... আবার মুছে যাওয়া ...

দীপা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। চোখ টলটল করছে। তারপর পেছন ফিরে চলে গেল।

এতগুলো কথা ওকে বললুম, একেবারেই না ভেবে-চিন্তে। কিন্তু সর্বৈব সত্য কথা। অনেক স্মৃতি কাঁটা হয়ে বেঁধে কিন্তু কোনও না কোনওদিন কাঁটা আপনি গলে যায়। এটাই সত্যি। তবে অন্যের ক্ষেত্রে যেভাবে হয়, আমার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শুরু ও শেষ হয় এই প্রক্রিয়া। দীপা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ বিরক্তি যেটুকুও বা ছিল, আমার মন সেটাকে শুষে নিল, বেলাভূমির বালি যেমন জল শুষে নিয়ে সূর্যের তলায় বিছিয়ে থাকে, সব আর্দ্রতা শুকিয়ে যাবে বলে।

কিন্তু ও কী চেয়েছিল? আমি ওকে মনে রাখি? মুম্বইয়ের রাত সারাজীবন প্রাণভোমরার মতো হৃৎ-কৌটোয় রেখে দিই? রেগে যাই, বিষণ্ণ হই, বিষাক্ত হই! আমি যেমন প্র্যাকটিক্যাল দীপাও তো তেমনি, কম ক্যালকুলেশন তো করেনি! সোজাসুজিই তো জানিয়ে দিয়েছিল আমি ওকে ভালবাসিনি ও বোঝে, এবং ও আমাকে ভালবাসে না সেটাও বোঝে। তা হলে? এ কী রকম ধর্ষকাম মেয়েটির মধ্যে? ও চায় ও আমেরিকার ভূস্বর্গে আঞ্জনেয়কে নিয়ে জীবন চূড়ান্ত আনন্দে বাঁচবে। আর সেই আনন্দের একটা উপকরণ হবে সমুদ্র নামে যুবকটির ওকে না পাওয়ার দুঃখ, মাঝে মাঝে ও দুঃখবিলাসে হঠাৎ সমুদ্রের জন্য কষ্ট পাবে, ইশ্‌শ সমুদ্র! আহা সমুদ্র! সমুদ্রকে যা দিয়েছি তা সে কোনওদিন ভুলতে পারবে না, মাঝে মাঝেই ছটফট করবে মনে ও শরীরে। আর সমুদ্র দেবকুমারের মতো পাগল হয়ে গেলে ওর আনন্দটা তুঙ্গে উঠবে। আহা কী আনন্দ আমি একটা যে-সে-নয় এমন যুবককে পাগল করে দিতে পেরেছি। আহা রে, ও এখন গোবরার পাগলা-গারদে থাকে, জানিস মেবল্, জানো কুর্চি, জানো তহমিনা। এসব তো আঞ্জনেয়কে বলবার নয়। তাই তোদের... তোমাদের না বললে মনটা হালকা হচ্ছিল না!

এইভাবে পরিষ্কার আমি পড়তে পারলুম দীপাকে। নিজের বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমার মনে হল, জেঠুকে যে মেয়েটি ঠকিয়েছিল, সে তো আরও গভীর ভাবে

ঠকিয়েছিল! একেবারে প্রেমে পৌঁছে গিয়েছিল। তাকে যদি খুঁজে বার করা যায়! এখন নিশ্চয় বুড়ি। মাথার চুল সব পাকা, যদি কলপ লাগিয়ে না থাকে, মোটা খসখসে হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। গিন্নিবান্নি, খেয়ে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচায়। হয়তো বুড়ো বরকে খ্যাকখ্যাক করে, উল্টে খ্যাকখ্যাকানি খায়। ছেলে মেয়েগুলো কথা শোনে না। বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে সব। এইভাবে ভেবে ভারী আনন্দ হল।

বাড়ি ফিরে ফিনকিকে সেদিন বললুম— একটা কাজ করতে পারবি?

—কী কাজ?

—জেঠুর সেই প্রেমিকার নাম-ধাম জোগাড় করতে পারবি? দেখিস যেন আবার জেঠুকেই জিজ্ঞেস করতে যাস না।

—পাগল? কিন্তু কেন?

—কর না।

—অদ্ভুত তো তুই! কোন কালের কথা তুই খুঁড়ছিস কেন?

—প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঠিক যে কারণে ঢিপি-ঢাপা খোঁড়ে!

—তারা খোঁড়ে অ্যাকাডেমিক কারণে, ইতিহাস জানবে বলে।

—আমিও তাই।

—তুই কি জেঠুকে নিয়ে রিসার্চ করছিস? গল্প লিখবি? জীবনী?

—হুঁ।

এই ধরনের উদ্যম আমি সত্যিই আগে কখনও অনুভব করিনি নিজের মধ্যে। কী যেন ভেতরে আসছে, ইচ্ছা, উদ্যোগ, সিদ্ধান্ত। এ সবই নতুন, একেবারে নতুন।

জেঠুর কাছে বসি, ঘনিষ্ঠ আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলি। খুব সাবধানে অবশ্য। পরে নিজের ঘরে এসে নোট করি।

দেবকুমার সেন— এখন বয়স সাতান্ন। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ আগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, একটি সহপাঠিনীর সঙ্গে গভীর প্রেম ছিল। মেয়েটি অন্য একজনকে বিয়ে করে চলে যায়। দেবকুমার ফিজিক্স ও অঙ্কে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। প্রেমচাঁদ

রায়চাঁদ স্কলার। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। বিকারগ্রস্ত হয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই তাঁর চাকরি যায়। বছর চারেক বাড়িতেই হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি চিকিৎসা হয়, তারপর তাঁকে দীর্ঘ বিশ বছর অ্যাসাইলামে রেখে চিকিৎসায় তাঁর পিতার খরচ হয় প্রতি মাসে গড় 6000, অর্থাৎ 6000×12×20 = 14,40000, এ বাদেও আরও কিছু অতিরিক্ত ধরলে পনেরো লাখের ওপরে যায়। এই তথ্যগুলো আমি পাই দাদুর হিসেবের খাতা থেকে।

এতদিনে একটা করার মতো কাজ পেয়েছি যেন। এমন একটা গবেষণা যা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাঠ, লোহা, সিমেন্ট কাঁকরের ড্রাফট নয়। আমার জীবনের প্রত্যেকটা ধাপ আমি সহজে উতরেছি, প্রত্যেকটা কাজ সহজে করেছি, বোধহয় সেই জন্যেই কোনও উত্তেজনা ছিল না সেগুলোতে। সবই যেন আমার ছায়া, একটা ছায়ামানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সব করে দিচ্ছে। খুব নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত হয়ে থেকেছি। প্রথম উত্তেজনা, প্রথম ধাক্কা, প্রথম অসাফল্য দীপা। দীপাকে মনে না রাখলেও, দীপার দেওয়া উন্মাদনা জুড়িয়ে জল হয়ে গেলেও ওটা একটা বিসদৃশ ঘটনা, আমার জীবনে।

ফিনকির প্রতিভা কিন্তু অসামান্য। ঠিক বার করে ফেলল। মেয়েটি, উঁহু মহিলার নাম সৃষ্টি। সহপাঠিনী নয়, জেঠুর দু বছরের জুনিয়র ছিলেন। জেঠুর কাছে পড়ে, জেঠুর নোটস্, বই নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। তারপর জেঠুরই সহপাঠী, তেমন ব্রিলিয়ান্ট নয়, কিন্তু ধনীঘরের ছেলেকে বিয়ে করে পগারপার হয়ে যান। একেবারে ইংল্যান্ড।

'সৃষ্টি' নামটা খাতায় লিখে আমি বসে থাকি। এরকম ধরনের সৃষ্টিছাড়া নাম সে সময়ে হত? তখন তো নমিতা, সবিতা, মিনতি, বড়জোর শ্রীলা, মধুশ্রী এই সবের কাল। ভদ্রমহিলা ইংল্যান্ডে। তা হলে তাঁকে ধরবই বা কী করে? বাড়িটা হাজরা রোডের এক ঠিকানায়।

—কী করে এসব জোগাড় করলি? ফিনকিকে জিজ্ঞেস করি।

—বলব কেন? তুই বলেছিস নিয়ে কী করবি?

—ধর যদি ওঁর বাড়ি যাই, কৈফিয়ত দাবি করি?

—দুই যুগ পরে কৈফিয়ত? কৈফিয়ত নিতে যাচ্ছিস আবার তুই? জেঠুর ভাইপো? এসব তোর মাথায় এল কী করে?

—জেঠুর জীবনের এতগুলো বছর অকথ্য দুর্গতিতে কেটেছে, আর জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে। যে কোনও জীবন নয়, একজন খুব উজ্জ্বল মানুষের, প্রচুর সম্ভাবনা ছিল যাঁর। এবং পনেরো লাখের ওপর টাকা দাদু ও বাবার খরচ হয়ে গেছে তাঁকে সারাতে।

তখন ফিনকি কতকগুলো অদ্ভুত কথা বলল।

—জেঠুর জীবনের সঙ্গে তুলনা করছি না, ছোড়দা, কিন্তু মায়ের সম্ভাবনার যে অপমৃত্যুগুলো হল, গায়িকা হিসেবে, স্কলার হিসেবে তার কৈফিয়ত তুই কার কাছে চাইবি? ধর মা যদি গান গাইত রেডিয়োতে। সিনেমাতে, জলসাতে, মা যদি প্রোফেসর হত, হতে হতে এখন যদি প্রিন্সিপ্যাল-ট্যাল হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরই হয়ে যেত, তা হলে ইভন ইন টার্মস অব মানি, মা কতটা লুজ করল হিসেব কর। মায়েরও যেটা হয়েছে সেটা দুর্গতিই। তুই একটা সিভিল এঞ্জিনিয়ার, তোকে যদি কোনও বাড়ির চাকরের কাজে রেখে দেওয়া হয়, তোর কী হবে? কেমন দুর্গতি? ভেতরে হেমারেজ হয় ছোড়দা, সমস্ত মনে ছড়িয়ে যায়, তারপর মনটা অসাড় হয়ে যায়।

আমি ওর কথার জবাব দিতে পারি না। দুটো দুর্গতি দুদিকে দাঁড়িয়ে তাদের বিকৃত প্রস্তরীভূত মুখ আমাকে দেখায়। দাদামশাই দিদিমা আর বেঁচে নেই, দাদু-ঠাকুমাও আর বেঁচে নেই। বাবা আছেন। ওঁকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে থাকবেন। বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারবেন না। তারপরে হবে একটা অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া, উনি চেঁচাবেন, গর্জন করবেন, তখন মা ওপরে উঠে আসবেন, হাতে ডালের কাঠি, বলবেন—কী হচ্ছে এখানে? সমু, ফিনকি? যাও, তোমরা এখান থেকে যাও। আমরা চলে যাব, বাবা চাপা গর্জন করে চলবেন। মা ডালের কাঠি নিয়ে নীচে নেমে যাবেন।

জিজ্ঞেসও করবেন না কী হয়েছে? কেনই বা আমরা বাবার ঘরে। কেনই বা তিনি গর্জন করছেন। কৌতূহলশূন্য পাথর-প্রতিমা নীচে নেমে গিয়ে আবার ডালে কাঠি দেবেন, সাঁতলাবেন। ডালে নুন কম, ভাত শক্ত, ঝোলে নুন বেশি, মাছ বড্ড বেশি ভাজা। উচ্ছে সেদ্ধ হয়নি।

ফিনকি বলল—আর ধর যারা উজ্জ্বল নয়, সাধারণ, চেষ্টা করে যাচ্ছে, চেষ্টা করে যাচ্ছে যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে কোথাও পৌঁছতে। তাদের কারও বা অনেকের জীবন যদি অন্য মানুষদের লোভের জন্য হৃদয়হীনতার জন্য সুবিধেবাদের জন্যে বরবাদ হয়ে যায়। তাতে তোর কিছু বলবার নেই? সে কৈফিয়ত তুই কার কাছে চাইবি? মাফিয়ার কাছে না রাজনীতির কাছে না ভণ্ড সমাজসেবকের কাছে, কার কাছে?

আমার ছায়া দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও বক্তব্য নেই তার। এখন ফিনকি আমাকে এমন কয়েকটা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার উত্তর আমি জানি না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

—ছোড়দা তুই কোন জগতে থাকিস জানি না, কিন্তু জীবন তো এরকমই! কে যে সুযোগ পাবে কে যে পাবে না, তুই জানিস না। সম্ভাবনাময় মানুষ ব্যর্থ হল, যার কোনও গুণ নেই সে দিব্যি হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে গেল এরকমই তো হয়।

এবার আমি স্বর খুঁজে পাই।

—এগুলো সবই ভাববার জিনিস ফিনকি, কিন্তু এটা তো স্বীকার করবি যেটা আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে গায়ে লাগে সেটার কথাই আমরা বেশি অনুভব করি, ভাবি, প্রতিকারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি!

—তার মানে জেঠু তোর ব্যক্তিগত, জেঠুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার হয়ে তুই তুলকালাম লাগিয়ে দিচ্ছিস। মানে জেঠুর সঙ্গে তুই আইডেনটিফাই করছিস। কেন রে? তোরও এ রকম কিছু হয়েছে, না? ও, আমাকে তো আবার বলবি না। আমার সঙ্গে আইডেনটিফাই করতে পারিস না। আমি অবশ্য এ-ও বুঝি এর পেছনে কে।

ফিনকি বলে যায় আর আমি হতবাক হয়ে বসে থাকি।

কী করে ও এত বুঝল?

তা হলে দেখা যাচ্ছে আমি এতই আত্মকেন্দ্রিক নিজের স্বার্থে লাগলেই আমি টলে যাই। আমার নির্লিপ্ততা সুতরাং একটা রূপকথা। এবং মোটের ওপর আমি অন্যদের সম্পর্কে অনুভূতিহীন। দ্বিতীয়টা আমি আন্দাজ করেছিলুম, কিন্তু আমার নির্লিপ্ততার গায়ে এমন একটা দুর্বল জায়গা আছে আমি জানতুম না। আমি কি লজ্জা পাব? আমার কি সঙ্কুচিত হওয়া উচিত? মুখ নিচু, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছে কাপুরুষ— এই জাতীয় কিছু?

ফিনকি বলল— যারা নিজেদের খুব বীরপুরুষ ভাবে তারা কোথাও হেরে গেছে স্বীকার করতে চায় না। এটাই তোর ইগো ছোড়দা, আর তোর ইগোয় লেগেছে অর্থাৎ জিনিসটা আছে এটা একটা ভাল লক্ষণ। দীপা, না রে?

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ দিই। ফিনকির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।

—ঠিক কীভাবে কতটা সিরিয়াসলি ও তোকে ঠকাল, জানতে চাইছি না, তোর বোধহয় অসুবিধে আছে। কিন্তু ছোড়দা আমার ধারণা এটা তোর দরকার ছিল। তুই কি এখনও দীপাকে ভালবাসিস?

—ওকে আমি কখনও ভালবাসিনি। ও-ই...

—ও তোকে বুঝিয়েছে ও তোকে ভালবাসে, তুই বিশ্বাস করেছিস, ও চলে গেছে। এই তো!

—কতকটা!

—তা হলে তোর জ্বালাটা, আবারও বলছি, অপমানের জ্বালা।

এবার আমি মুখ তুলি,—আমার কোনও জ্বালা নেই ফিনকি। বিশ্বাস করা না করা তোর ব্যাপার। আমি আর নিজের মনস্তত্ত্ব কী করে বুঝব বল। বরং মনে হয়েছে— ভাগ্যিস! খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। কিন্তু জেঠুর ব্যাপারে আমার ধারণা বা দায়িত্বও বলতে পারিস—একটু অন্যরকম। উনি বহু বছর উন্মাদ ছিলেন। এটা আমি ভুলতে পারছি না।

একমুখ হেসে ফিনকি বলল— যা, তা হলে ভদ্রমহিলার ঠিকানাটা জোগাড় কর, বেশ করে গালাগাল দিয়ে একটা চিঠি লিখে দে।

—গালাগাল দিতে তো আমি পারি না জানিস। ওটা আমার সিসটেমে নেই। আমি যাব হাজরার ওই বাড়িতে, আর তোকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—যাক বাবা, অ্যাদ্দিনে পাত্তা দিলি। আমি সাবালক এটা তোর কাছে প্রমাণ করার জন্যে লাগাতার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ঠিক আছে, গালাগাল যদি না দিস তোর সঙ্গে যেতে রাজি আছি। এখন এই নে তোর নামে দাদার একটা চিঠি এসেছে। পরে বলিস কী লিখেছে...

আমার নামাঙ্কিত একটা খাম ফিনকি আমার হাতে তুলে দেয়। খামটা আমি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে থাকি। ফিনকি চলে যায়।

রাত আটটা মতো হবে। আমাদের রাতের খাওয়ার সময় নটা থেকে সাড়ে নটা। কিছুদিন আগেও বাবার সঙ্গে খেতে পছন্দ করতুম না। এখনও যে খুব করি তা নয়। কিন্তু মায়ের সুবিধে হবে বলে, আর আমি থাকলে বাবা বিশেষ গোলমাল করেন না বলে আমি একসঙ্গেই বসি।

কী লিখেছে দাদা? বিজয়ার সময়ে একটা করে পোস্টকার্ড আসে জানি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক তো রাখে না দাদা! আমরা মানে আমিও রাখি না, মা-ও রাখবেন না, ধরে নিতে পারি। বাকি রইলেন বাবা আর ফিনকি। এঁদের কথা এঁরা না বললে আমি বলতে পারব না। চিঠিটা অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করি। তারপর সাবধানে কাগজ কাটার ছুরি দিয়ে কাটি এক দিকটা। ভেতর থেকে বেরোয় একটা ব্যাংক ড্রাফট। পঞ্চাশ হাজার টাকার। সঙ্গে চিঠি।

সমু,

এতদিন পরে আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয় ভাববে কোনও স্বার্থে ডাকাডাকি করছি। ভাবতেই পার। কিন্তু তোমায় আমার বড্ড দরকার। তুমি একা-একা পরিবারের সব দায় বইছ ভেবে, বিশ্বাস করো আমার আত্মগ্লানি হয়। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা। আমার স্ত্রী

সমস্ত টাকাপয়সার হিসেব রাখে। এবং যেহেতু শ্বশুরের আন্ডারে কাজ করি, আমার মাইনেপত্র ডি.এ সমস্তই তিনি জানেন। আমার নিজস্ব রোজগারের ওপর কেন যে এঁরা এত গোয়েন্দাগিরি করেন, সেটা দেখে আশ্চর্য লাগে। এঁরা কিন্তু আদারওয়াইজ লোক খারাপ নন। শুধু ওই নিজের বাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তার ও আর্থিক সম্পর্ক রাখি এটা একেবারে চান না। কেন সেটা এখন রহস্য আর নয় আমার কাছে। আসলে সোনুর প্রথম বিয়েটা কেঁচে যাওয়ার মূলে ওর শ্বশুরবাড়ির বেশ হাত ছিল। অন্তত ওঁরা তাই মনে করেন। একমাত্র মেয়ে এবং যথেষ্ট সম্পত্তি থাকায় ওঁরা একটু সন্দেহ বাতিকগ্রস্তও হয়ে পড়েছেন। আমাকে খুব ভাল করে, স্টাডি করে, নিরাপদ মনে করেছেন বলেই এগিয়েছেন। তুমি জেনে শকড হবে আমার কোনও সন্তান হবে না এমন শর্তও ওঁরা করে নিয়েছেন, পাছে ওঁদের নাতির কোনও অযত্ন হয়, বা তার উত্তরাধিকারে কিছু কম পড়ে। তুমি বলতে পার—এভাবে দাসখত আমি লিখে দিলুম কেন। তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি সমু, আমি চিরকাল ভীষণ ইনসিকিওর ফিল করেছি। বাবা-মা, এঁরা যেন আমার কেউ না, আমি একটা সমুদ্রে ভাসা কাঠের টুকরোর মতো ওই সংসারে পড়ে রয়েছি। তুমি ছাড়া কারও সঙ্গে আমার কোনও বন্ড ছিল না। এখানে আমি সেই আত্মীয়তা, যত্ন, এরা বলে 'আপনাপন' পেয়েছিলুম। তার ভেতরে ওঁদের কিছু স্বার্থের অঙ্ক অবশ্যই ছিল। কিন্তু খুব একটা ফাঁকি ছিল না। এখন মুশকিল হচ্ছে সোনুর ছেলে বলবীর এই ক'বছরে বেড়ে চোদ্দো বছরের হয়েছে। ছেলেটি আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় না। পুত্রস্নেহ ও নাতিস্নেহে অন্ধ এঁরা সেটা দেখেও দেখেন না। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি, ইউ.এস.এ-র কয়েকটা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে চিঠিপত্র চলছিল। হয় বার্কলি, নয় কেম্‌ব্রিজে পাচ্ছি। আরও একটু বেশি ডলারের জন্য বারগেন করছি। যারা রাজি হবে, তাদের ওখানেই যাব। এখানে কেউ সেটা জানে না। আমি ন্যাচার্যালি এক্সপেক্ট করব আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে যাবে। বলবীর যেহেতু তার দাদু-দিদিমার খুব প্রিয় এবং দিল্লি

পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করছে ও অনায়াসেই এখানে থেকে যেতে পারে। আমি বলব ওঁর পড়াশোনাটা ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া, ওর ডিফেন্সে যাবারও খুব ইচ্ছে। সেক্ষেত্রে ওর ইউ.এস.এ আসবার দরকারই হচ্ছে না। এইভাবে আমি ও দেশে আমার একটা আলাদা জীবন গড়ে তুলতে পারব। আমার নিজের সন্তান হবে, সোনুকেও কিছুটা বোঝাতে পারব। ইতিমধ্যে এই ড্রাফটা রাখো, কীভাবে কার থিসিস লিখে দিয়ে এটা রোজগার করেছি, সে এক গল্প। ফিনকিকে বলো আমি ওকে ভুলিনি, ওর প্রত্যেকটা চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মা বাবা এবং আর সবাইকে প্রণাম দিচ্ছি। তুমি আমাকে মর‍্যাল কারেজ দাও সমু, আমার কোনও বন্ধু নেই যার কাছে পরামর্শ নিতে পারি। তোমাকে আমি ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টাল ফোন নম্বরটা দিচ্ছি। মঙ্গলবার বাদ দিয়ে যে কোনও দিন ফোন করো। প্লিজ।

—সাগর

'দাদা' লেখেনি। ' সাগর', শুধু 'সাগর'। দাদার সঙ্গে আমার যে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, বাইরে থেকে বোঝা যেত না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিল সেটা আমি জানতুম। কিন্তু দাদা বিয়ে করে দিল্লি প্রবাসী হবার পর তাতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গিয়েছিল বলেই জানতুম। বিশেষ করে দাদুর শ্রাদ্ধের সময়ে এসে দাদা যে ব্যবহার করেছিল, সমস্তটাই দাদাকে আমার জীবন থেকে বার করে দিয়েছিল। আমার কোনও অভাববোধ ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যেত, কে যেন বলে উঠত— আমার ভীষণ ভয় করছে। সমু! সমু! কার পায়ের শব্দ দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে টের পেতুম। কোনও কষ্টবোধ নেই, খালি শুনতে পাওয়া। দাদা খুব ভিতু লোক ছিল। ভিতুরাই বোধহয় স্বার্থপর হয়। তবে একটা কথা মনে হওয়ায় আমার খুব হাসি পেল। সব প্রডিগ্যালরাই গিয়ে আমেরিকায় জড়ো হচ্ছে। এক নম্বর নবকুমার, দু'নম্বর দীপা, তিন নম্বর দাদা— সাগর। আত্মগোপন করার ভারী চমৎকার জায়গা মহাদেশটি। পলাতকদের মহাদেশ। পলাতকদের শেষ আশ্রয়।

তুই নিয়মিত লিখিস দাদাকে? ফিনকিকে চিঠিটা দিয়ে জিজ্ঞেস করি। কাঁচুমাচু মুখে মেয়েটা বলে—নিয়মিত মানে কিছু ঘটলে, ধর ছোড়দিদা মারা গেলেন, ধর আমি এইচ.এস, বি.এ, এম.এ পাশ করলুম। রিসার্চে ঢুকলুম। এই রকম। জেঠু এলেন...এখন কোচিং করছেন, খুব চমৎকার মানুষ—এটাও লিখেছি।

—দাদা উত্তর দিত?

—সবগুলো না হোক, কতকগুলো দিত। বেশি নয়, দু-চার লাইন। কিন্তু... আমার দাদার জন্যে বড্ড মন কেমন করে রে! রাগ করিস না!

—রাগ করব কেন? আশ্চর্য তো!

—না। মা-বাবা কেউ তো নাম করে না দাদার। তুইও তো করিস না...

—নাম না করা মানেই তাকে মনে না করা তো নয়!

—তুই মনে করিস?

—স্বজ্ঞানে না করলেও স্বপ্নে যখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না তখন বোধহয় করি।

—লক্ষণ ভাল।

এই ধরনের কথা ফিনকি আমাকে প্রায়ই বলছে আজকাল। লক্ষণ ভাল, দিস ইজ গুড। আবার... তোর ঘরের ছিটকিনি তুই সব সময়ে লাগিয়ে রাখিস... মনের কথা কাউকে বলিস না... তুই বড্ড একা—এত একা হওয়া ভাল না।

আমি যেন একটা রহস্য গল্প। ফিনকি আমাকে আস্তে আস্তে পড়ছে। যেমন যেমন বুঝছে সাজিয়ে যাচ্ছে তথ্যগুলো। কম্পিউটারে ভরে দিচ্ছে যাতে ওর চেয়েও উন্নত নির্ভুল মস্তিষ্ক আমাকে আপাদমস্তক পড়ে ফেলতে পারে। আমি অপেক্ষা করে আছি কবে সেই নির্ভুল পাঠ ডাউনলোড করবে ফিনকি। আমিও নড়বার সুযোগ পাবো।

দাদাকে ফোনে কিন্তু আমি দু'তিন দিনের চেষ্টাতেও পেলুম না। দুটো তিনটে অর্থাৎ সবচেয়ে ব্যস্ত সময়ে ছাড়া করার উপায় নেই।

পাই-ই না। খালি বলে—‘দিস লাইন ইজ বিজি, প্লিজ ট্রাই আফটার সাম-টাইম।’ ট্রাই করতে করতে আমার ধৈর্য চলে যায়, তারপর কাজকর্মের ফেরে ভুলেই যাই। তেমন কিছু দরকার যদি থাকে তা হলে দাদা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে। আবার ভুল না বোঝে, তাই ফিনকিকে বলে দিই। দাদাকে দু লাইন লিখে দিতে।

আসলে এখন আমার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। আমাদের অফিস কমপিউটারাইজড হচ্ছে। সেই নিয়ে প্রচুর কর্মী-আন্দোলন, কোর্ট কেস, কলিগদের মধ্যেও বাগ্-বিতণ্ডা হয়েই চলল। ইতিমধ্যে অফিস আমাকে ব্যাঙ্গালোর পাঠিয়ে দিল। কমপিউটারের সমস্ত খুঁটিনাটি শিখে নিতে। এটা একটা নতুন যান্ত্রিকতা। প্রথমটা বেশ আগ্রহ হয়। ফিরে এসে আমার কাজ হল অফিসের কর্মীদের কমপিউটার শেখানো। ক্রমে বেশি দায়িত্ব পাচ্ছি। জয়ন্তী একদিন এসে অভিনন্দন জানাল। কী ব্যাপার? না আমার এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার পদে প্রোমোশন হচ্ছে।

পুরুষ কলিগরা দেখা হলে শুধু করমর্দন করে সংক্ষিপ্ত কংগ্র্যাটস বলে চলে গেল। কিন্তু জয়ন্তী মুখে বলে গেল ঘরে এসে, আর মুকুলিকা এমন উজ্জ্বল হেসে আমার দিকে তাকাল যে অভিনন্দনটা আর মুখ ফুটে জানাবার দরকার হল না। সন্দেহ নেই, মেয়ে দুটি আমাকে প্রতিযোগী ভাবে না।

—লগনচাঁদা ছেলে সমুদ্র তুমি—কে যেন বলল একদিন। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছ। নো ফ্রিকশন।

জয়ন্তী অমনি তড়বড় করে বলল—বাঃ ওর বুঝি কোনও ক্রেডিট নেই? সবই চাঁদের কৃপায় হয়ে গেল?

বিজিত চোখ নাচিয়ে বলল—দেখো, নিজেরাই দেখো কেমন চাঁদ কপালে!

জয়ন্তী বিরক্ত হয়ে বলল— পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেল একসঙ্গে কাজ করছি। এখনও ভুলতে পারলে না আমরা মেয়ে, না? আশ্চর্য!

অনিন্দ্য চেঁচিয়ে বলল— ভুললে খুশি হবে? অন গড বলো দেখি।

জয়ন্তী পেছন ফিরে বলল—ডিসগাস্টিং।

কাজে ডুবে থাকি। মাঝে মাঝেই টুর, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর। কোনও কোনও সময়ে ওদের কেউ সুমিত টুমিত সঙ্গী হয়। জয়ন্তী বা মুকুলিকা থাকলে আমি এমন ভাবে আমার অক্ষমতা জানাই... বসের সাধ্য নেই বোঝে আমার আপত্তির আসল কারণ। অনর্থক জটিলতার মধ্যে যেতে চাই না। এভাবেই আমি ভাল থাকি। আমার ঘরের মধ্যে আরেকটা ঘর। সেটা প্রতিধ্বনিতে ভরা, কত মানুষ বেঁচে গেছে এই জমিটুকুতে। হয়তো কোন যুগে এখানে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখানেই ঘটেছে কত গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র। হয়তো ছিল বৈরাগীর কুঁড়ে, ভজনগানে ভরে থাকত বাতাস। দুর্ধর্ষ খুনি ডাকাতদের আস্তানা থেকে থাকাও অসম্ভব নয়। যেখানে আমার খাট সেখানে ছিল ডাকাতে কালীর ভয়াল মূর্তি হয়তো। এত চরমেই বা যাব কেন? কত নাম-না-জানা সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ। রেখে গেছে তাদের জীবধারণের শব্দ-গন্ধ এইখানে। যা এখন আমার ঘর। এই অর্থহীন পরিণামহীন চলমানতাকে মেনে নিতে হয়। মেনে নিই।

একেক সময় রাস্তার পাশে কোনও আধখোলা ঝুপড়িতে দেখি দুটো ইটের মাঝখানে কাঠিকুটো জ্বেলে, কুচকুচে কালো হাঁড়িতে কেউ রান্না বসিয়েছে, কোলে ছেলে নিয়ে বা না নিয়ে এসে দাঁড়ায় ভিখারি মেয়ে। মুখে দুঃস্থতা, খিদে কী অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা দিয়েছে মুখকে। কিংবা বিশাল গাড়ি করে এসে থামলেন এম.জি ইনি খুব ভালবাসেন সাহেব সেজে থাকতে। চোস্ত স্যুট, টাই। মসমস করে চলে গেলেন নিজের কামরার দিকে। যেন বেশ বড় কিছু একটা অধিকার করে রেখেছেন। পুরো জীবনটাই বোধহয়। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে জনতা যেই একটা বাস এসে থামল। যেতে হবে, কোথাও পৌঁছতে হবে। পৌঁছে কী হবে? একটু রাত হয়ে গেলেই বা কী ক্ষতি? কয়েকটি মেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে কী একটা কথায় হাসতে হাসতে, হাসি চাপতে চাপতে চলে যাচ্ছে, মুখে হাত চাপা দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একজন, একজন হাসতে

হাসতে পেছনের দিকে হেলে গেছে। আর দুজন দুজনকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে হাসছে। একেবারে নিমগ্ন কোনও তুচ্ছতায়। হাসির কারণটা জানলে হয়তো আর কারও হাসি পাবে না।

দেখতে দেখতে মনে হয় যদি খেতে না পেতুম, কিংবা যদি প্রচুর টাকা আরও টাকা, আরও বিলাস আরও বিলাসের অভ্যেস হয়ে যেত, যদি এমন দৌড়ে, ঝুলে ঝুলে বাস ট্রাম ট্রেনে যেতে হত, যদি এমন অকারণে আধাকারণে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে পারতুম, তা হলেই বোধহয় স্বাভাবিক হতুম। কেউ বলত না তুমি কেমন আনরিয়্যাল ... তুমি বড় একা... তুমি কেমন আলগা-আলগা। তার বদলে আমি নিরবধি কালের পুনরাবৃত্তির চলচ্চিত্র চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে দেখতে পাই। এ সব নয় অন্য কিছু অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুর সন্ধানেও আমি তেমন উৎসুক নই। কারণ সন্ধানে সব ধরা দেয় না। এ সত্য আমি বুঝে গেছি।

## ১৮

বোশেখ মাসের এক সন্ধেয় ফিনকিকে নিয়ে আমি বেরোই। খুব হাওয়া দিচ্ছে, চতুর্দিকে কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, যেন লাল হয়ে রয়েছে আকাশ মাটি। ফিনকি খুব উচ্ছল, উজ্জ্বল, ডগডগে সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। ছাপা। কী শাড়ি, কী ব্যাপার অতশত জানি না। মুখটা খুব পরিষ্কার মাজা। গোলাপি লিপস্টিক লাগিয়েছে। ক্লিপ দিয়ে আটকানো। চুলগুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে রয়েছে।

—এত সেজেছিস কেন? বিউটি কমপিটিশনে যাচ্ছিস না কি?

—আশ্চর্য, এরকম আমি রোজই সাজি। এই শাড়িটা নববর্ষে তোরই টাকা দিয়ে কিনেছি, তা জানিস?

আসলে আমরা আজ অভিযানে বেরিয়েছি। সেই, জেঠুর প্রেমিকার ঠিকানা খোঁজার অভিযান। সত্যি বলতে কি আমার রাগের আঁচ কবে ছাই হয়ে গেছে, উৎসাহও নিভে গেছে। মনেই

ছিল না আমার। ফিনকিই ডাকাতের মতো চড়াও হল।

—কোনও প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিস না, না?

—কী আবার প্রতিজ্ঞা?

—সেই হাজরায় যাওয়া, আমাকে নিয়ে, ঠিকানা...

—হাজরা?— আমি আকাশ থেকে পড়ি।

—সব ভুলে গেছিস? সেই ভদ্রমহিলার ঠিকানা বার করতে হবে না? ইংল্যান্ডে না কোথায়? জেঠুর সেই রে?

—ওহ্, দূর, ওসব ছাড়।

—ছাড়িব না, ছাড়িব না— সুর করে বলল ফিনকি।

তাই ফিনকির নির্বন্ধেই বেরিয়ে পড়া। মনটা মাঝে মাঝে সায় দিচ্ছে, মাঝে মাঝে দিচ্ছে না। কী হবে ও সব করে? অত বছর আগেকার প্রেম, বিশ্বাস, বিশ্বাসাঘাত সব এখন সময় মুছে দিয়েছে। সে দেবকুমারও নেই, সে সৃষ্টিও নেই। দেবকুমার একজন ভেঙে-যাওয়া প্রায়-বৃদ্ধ যিনি বাকি জীবনটা মোটামুটি শান্তিতে কাটিয়ে যেতে চাইছেন। সৃষ্টি নিশ্চয় এখন মেমসাহেব। এত বছর ধরে যিনি বিদেশে কাটিয়েছেন. সেখানেই যাঁর ছেলেমেয়ে হয়েছে তাঁর মধ্যে কোথাও কি পুরনো প্রেমের স্মৃতি বেঁচে আছে? উনি সব ভুলে গেছেন। চিঠি একটা লিখব নিয়মরক্ষা, উনি জবাব দেবেন বলে মনে হয় না।

—কী রে ট্যাক্সি নেব?

—তা নিবি না? আচ্ছা কিপটে তো।

সুতরাং একটা ট্যাক্সি নিই।

হাজরা বেশ গোলমেলে রাস্তা। ট্যাক্সিচালক না থাকলে ঠিকানাটা খুঁজে বার করা আমাদের সাধ্য ছিল না। কিন্তু কলকাতার ট্যাক্সিচালকরা সব জানে। একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াই। রং হচ্ছে, সাদা রং। ভারা বাঁধা, একদিকে এক মিস্ত্রি সিমেন্ট ছুড়ছে তাল তাল, কর্নিক দিয়ে সমান করছে, আরেক দিকে রং হচ্ছে। সদর দরজা খোলা, সেখান দিয়েও মাথায় সিমেন্টের কড়াই নিয়ে বেরিয়ে আসছে মজুরনিরা। ওদের বোধহয় ফুরনের কাজ। সাতটা বেজেছে, এখনও কাজ চলছে।

আগেকার বাড়ি, খুব শক্তপোক্ত, মোটা দেয়াল, কুড়ি ইঞ্চি হবে। এসব বাড়ি আজকাল আর লোকে সারাচ্ছে না। প্রোমোটারকে দিয়ে দিচ্ছে। বেশ বনেদি বাড়ি মনে হয়। আমাদের বাড়িটার মতো গেরস্থ-গেরস্থ নয়। বেশ চওড়া ঝুল বারান্দা। তলার লোহার স্ট্রাকচারটা রং করা হয়ে গেছে। গাঢ় সবুজ রং।

মজুরনিদেরই জিজ্ঞেস করে ফিনকি—ভেতরে কেউ আছেন? কোই হ্যাঁয়? উদাসীন ভাবে মাথার কড়াই সামলাতে সামলাতে ঘাড়ের একটা ভঙ্গি করল মেয়েটি।—অর্থ, ভেতরে যাও, নিজে খোঁজ করো।

আমরা উঠোন পেরিয়ে, নিচু রোয়াকের ওপরে উঠি। অগত্যা। —কেউ আছেন, বেশ কয়েকবার ডাকবার পর সাড়া মিলল।

এক মাথা সাদা চুল, বেশ ফিট চেহারার এক বৃদ্ধ বেরিয়ে আসেন।

—কে?

—আপনি আমাদের চিনবেন না, আমরা আসলে একটা কাজে এসেছি।

—কী কাজ? এ-বাড়ি আমরা বিক্রি করব না। ভুল খবর পেয়েছ তোমরা।

—বাড়ি নয়, কথাবার্তার ভারটা ফিনকিই তুলে নিয়েছে,— আমরা সৃষ্টিদেবীর বর্তমান ঠিকানাটা জানবার জন্য এসেছি।

—সৃষ্টিদেবীর ঠিকানা? কে তোমরা? কেন?— চূড়ান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন।

—কারণটা একেবারেই ব্যক্তিগত।

উনি হঠাৎ অ্যাবাউট টার্ন করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে আমাদের বললেন— এসো।

ভেতরে ঢুকে খুব পুরনো বেত-কাঠের ঢাউস ঢাউস কৌচে বসলুম। ভদ্রলোক হুইল-চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হুইল-চেয়ারে এক শীর্ণ ভদ্রমহিলা। চুল কাঁচা-পাকা, মুখটা এই বয়সেও খুব মিষ্টি, স্নেহশীলা স্নেহশীলা মনে

হয়। সুন্দর দাঁত, কথা বললেই ঝিলিক দেয়। আমাদের দেখে কেমন একটা দুর্বোধ্য যান্ত্রিক হাসি হাসলেন।

—ওঁর একটা সেরিব্র্যাল স্ট্রোক হয়েছিল, এখন ফিজিয়োথেরাপি চলছে।

আমি ফিনকির দিকে তাকাই। ফিনকি আমার দিকে।

আমি ইতস্তত করে বলি— উনি ইংল্যান্ডে কোথাও থাকতেন না?

—হ্যাঁ, সে অনেকদিন হল, শেষ বছর পাঁচেক উনি এখানেই থাকেন।

—আপনি?

—আমি ওঁর হাজব্যান্ড। তোমরা কী কারণে এসেছ বলো এবার।

এখন কী বলব? সেরিব্র্যাল স্ট্রোকে পঙ্গু ভদ্রমহিলা, বৃদ্ধ স্বামী সেবক। আর কেউ আছে বলেও মনে হচ্ছে না। ওঁরা কি একা? ছেলে মেয়ে? আমি তো আর গিন্নিদের মতো জিজ্ঞেস করতে পারি না—'ছেলেপিলে কটি?'

খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে থাকি, ফিনকি হঠাৎ বলে—কিছু না আমরা দেবকুমার সেনের ভাইপো-ভাইঝি। তাই...

ভদ্রমহিলার কোনও ভাবান্তর হল না। অর্থাৎ ওঁর মস্তিষ্কও ঠিক নেই। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন—তাই তোমাকে বড্ড চেনা চেনা লাগছিল। যেন কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি। আমি সঞ্জীব সাহারায়। দেব এখন কেমন আছে?

—কী রকম আর থাকবেন? বহু বছর উন্মাদ ছিলেন, অ্যাসাইলামে ছিলেন, এখন সবাই বলছে সেরে গেছেন। বাড়ি নিয়ে এসেছি।

—ওই কি আমাদের খোঁজ করতে বলেছে তোমাদের?

—না না। এসব উনি... আমরা ওঁকে কিছু বলিনি, ফিনকি বলল— আমার এই ছোড়দা বলছিল ওঁর মানে জেঠুর সারা জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির পনেরো লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। তাই ওঁকে...

—ওঁকে কী? ভদ্রলোক যেন বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। পনেরো লাখ টাকা ওঁর থেকে দাবি করবে?

আমি এবার গলা ফিরে পাই, বলি, না, কিছুই দাবি করব না, শুধু যাঁর জন্যে ওঁর জীবনটা গেল তাঁকে দেখতে এসেছিলুম। অবশ্য দেখা পাব ভাবিনি। ইংল্যান্ডের ঠিকানাটা চাইছিলুম, একটা চিঠি দেব বলে।

—কীসের চিঠি?

—কিছু না. আমি ওঠবার ভঙ্গি করি।

ফিনকি বলে—জানাতে চেয়েছিলুম, ওঁর জানা উচিত জেঠু এত কষ্ট পেয়েছেন এখন ফিরে এসেছেন। এ সব কেন?

দুজনেই উঠে দাঁড়াই। জানি আর কোনও উত্তর নেই। আর কোনও জবাবদিহিরও সময় চলে গেছে। এ একটা আনপড় ছেলেমানুষি। আমি এমন করি না, কেন করলুম জানি না।

উনি হঠাৎ হাত তুললেন— দাঁড়াও দাঁড়াও। যেয়ো না। বসো আমি আসছি।

—আমরা যাই। উনি অসুস্থ, আমাদের আর কিছু বলবার নেই— আমি বলি।

—আমার বলবার আছে মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। তোমরা বসো, আমি ওঁকে ভেতরে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ভেতরে চলে গেলেন। দূর থেকে ওঁর গলার আওয়াজ ভেসে এল গীতা ...গীতা...।

একটু পরে এসে বসলেন।— বলো এবার কী বলছিলে।

আমি বললুম—বলেছি তো! এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। উই আর স্যরি ফর হার। খুব খারাপ লাগছে।

—তোমরা তা হলে এতকাল এই গল্পটা বিশ্বাস করে এসেছ যে সৃষ্টির জন্যেই, অংশত আমার জন্যেও, দেব মানে তোমাদের জেঠু উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা কথা না বলে ওঁর দিকে চেয়ে থাকি।

—আমার স্ত্রীকে একটা মিথ্যে রটনার হাত থেকে রক্ষা করা

আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। কী নাম তোমার?

—মনীষা।

—তোমার?

— সমুদ্র।

—বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘদিন আগেকার ভুল বোঝাবুঝি আজ শেষ হোক। সৃষ্টিকে দেব পড়াত, অত্যন্ত মেধাবী ছেলে, সৃষ্টিও ছিল এক নম্বর। আমি দুই কি তিন নম্বর হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি আমাকেই ভালবেসেছিল। গড নোজ হোয়াই। এ সবের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। আমাদের ব্যাপারটা ছিল পারস্পরিক। একদিন এই বাড়িতে, সৃষ্টির মা-বাবার বাড়িতে দেব ওকে আক্রমণ করে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ওর মা-বাবা আমাকে ফোন করেন। আমি এসে দেবকে সামলাই। দেখি ওর চোখ অস্বাভাবিক লাল, ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। দেখেই বুঝতে পারি ও পাগল হয়ে গেছে। সৃষ্টির জন্যে পাগল নয়, পাগল বলেই আক্রমণটা ও করে। দেব ছিল অস্বাভাবিক মেধাবী। তার ওপর অঙ্ক-পাগল। যে সব প্রবলেম কেউ আজ পর্যন্ত সলভ্ করতে পারেনি, ধরো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূক্ষ্ম সব প্রবলেম... সে সব নিয়ে দিবারাত্র ভাবত। আমার মনে হয় তাইতেই ব্যালান্সটা নষ্ট হয়ে যায়। সৃষ্টি মানে লাভ্-টাভ্ কোনও ফ্যাক্টরই নয়। খুব খুউব স্যাড মনীষা, তোমার নাম কী বললে?— সমুদ্র? উই ওয়্যার গ্রেট ফ্রেন্ড্স বুঝলে! কিন্তু সৃষ্টি আমাকেই... কিছু তো করার থাকে না। আমরা বিশেষত আমি কিন্তু বহুদিন ওর খবরাখবর রেখেছি। আমাদের বিয়ের তারিখটা... তারিখটা লক্ষ করো ১১ই জুলাই, ও অ্যাসাইলাম যাবার পাঁচ মাস পরে। ফেব্রুয়ারি, মার্চ... ভদ্রলোক গুনতে লাগলেন, হ্যাঁ, পাঁচ মাস পর, আর তারপরই এডিনবরায় একটা টিচিং অ্যাসাইনমেন্ট পাই। এই। ও সেরে গেছে, এর চেয়ে ভাল খবর...।

কিছুক্ষণ মুখটা নিচু করে রইলেন, সামলাচ্ছেন নিজেকে, বাইশ-চব্বিশ বছর আগে খোয়ানো বন্ধুর জন্য এত?

—আমি তেমন কিছু ছিলুম না, তবু আমিই ছিলুম ওর সবচেয়ে

ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সৃষ্টিও... মানে জুনিয়র তার ওপরে মেধাবী ছাত্রী তো! ...ওর সঙ্গে একটা ইনটেলেকচুয়াল বন্ড ছিল কিন্তু ও আমাকেই... আমি দেবকে দেখতে যাব। দিন পাঁচেক পর আমার মেয়ে আসবার কথা আছে। তখন তার কাছে তার মাকে রেখে...।

আমি বললুম— না।

—কী না?

—যাবেন না।

—তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

—অবিশ্বাসও করছি না। কিন্তু ব্যাপারটা অত সরল নয়। আপনাকে দেখে ওঁর কী রি-অ্যাকশান হবে... যদি খারাপ কিছু হয়? সেক্ষেত্রে ক্ষমা নেই, মানে আপনাদের বা আমাদেরও।

—ঠ্ ঠিক আছে যাব না। তোমাদের ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাও, আমি খোঁজ নেব।

—খোঁজ নেবার কিছু নেই। উনি শান্ত হয়ে গেছেন, কোচিং-টোচিং নিয়ে ভালই আছেন।

—বলো কী? মাথার কাজ ওকে করতে দেওয়া ঠিক নয়।

—জানি। উনি স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের পড়ান। আমরা খেয়াল রাখি।

—আমাদের নম্বরটা নিয়ে রাখো। মাঝে মাঝে খবর দেবে।

ফিনকি বলে উঠল— এ সব আর দরকার নেই। কী থেকে কী হয়! আমরা শান্তি চাই।

—বেশ।

ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল। নর্থে অনেক ট্যাক্সিই যেতে চায় না। খুব হাওয়া দিচ্ছে। প্রচুর হাওয়ার একটা সন্ধে রাতে মিশতে চলেছে বহু কোটি বারের পর আরও একবার। আমার চুল এলোমেলো ওড়ে, আমার দিকে কাচটা তুলে দিই। ফিনকি একেবারে চুপ। ওর চুল ওড়ে না, কোঁকড়া জমাট চুল।

এসপ্লানেড অবধি আসার পর ও বলল— তোর দুঃসাহসিক অভিযানের অপমৃত্যু হয় গেল ছোড়দা। দেবকুমার সেনের

জীবনীতে লেখার মতো কোনও ইন্টারেস্টিং চ্যাপটারই আর রইল না।

—দারুণ একটা কথা কাটাকাটি, ঝগড়া-কাজিয়া হলে কি তুই খুশি হতিস?

—তা নয়। কিন্তু 'জাস্টিস'? 'জাস্টিস' এমনই একটা নেশা যে সে সব সময়ে ইনজাস্টিস খোঁজে। একটা ভারী বই তুই সমস্ত শক্তি দিয়ে তুলতে গেলি, হুস করে বইটা উঠে এল। কী রকম বেকুব লাগে না?

আমি কিছুক্ষণ পর বলি— একটা ছেলেমানুষিই হয়তো করে ফেলেছি ঝোঁকের মাথায়। কিন্তু কতকগুলো জিনিস তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। আমরা তো জানলুম জেঠুর দুর্গতির পেছনে কারও নিষ্ঠুরতা নেই। ওঁরাও জানলেন এতদিন আমরা ওঁদের দায়ী করে এসেছি এজন্য।

—তুই কি ওঁর সবটাই বিশ্বাস করে এসেছিস? ফিনকি অবাক চোখে বলল—আমি কিন্তু করিনি। এর ভেতরে ডেফিনিটলি আরও কথা আছে।

আমি বললুম— ইচ্ছে হলে সন্দেহটাকে পুষে রাখতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস করে নেওয়াটাই বোধহয় বেশি স্বাস্থ্যকর। কী হবে আর?

## ১৯

ওঁদের বাড়িটাও আমার পিছু নেয়। বিরাট বাড়ি, আগেকার, একশ বছর তো হবেই। শক্ত ভিত, মোটা দেওয়াল, বড় বড় ঘর, আসবাব, যাদের বয়স সত্তর-আশি পেরিয়ে গেছে। অব্যবহারে মলিন, কিন্তু কাঠামোটা ঠিক আছে। একজন অশক্ত বৃদ্ধা আরেকজন এখনও পর্যন্ত সক্ষম বৃদ্ধ। অথচ, এই বাড়িটাকে উনি নতুন করে সারাচ্ছেন। কী উৎসাহ! বাইরেটা পুরো আস্তরণ ছাড়িয়ে নতুন করা হচ্ছে।

ভেতরের কাজ সে ভাবে দেখিনি, কিন্তু হচ্ছে, হবে। ওইসব আসবাবপত্র নতুন করে পালিশ হবে, গদি কুশন পাল্টানো হবে। নতুন নতুন ওয়াড়। আলোর ব্যবস্থায় কিছু নতুন, কিছু পুরনো তো থাকবেই। বৈঠকখানার ক্রিস্ট্যালের ঝাড়বাতিটা কি ওঁরা পাল্টাবেন? কখনওই না। বাড়ি সারানোর রকম দেখেই মনে হচ্ছে এটাকে ওঁরা রক্ষা করবেন— হেরিটেজ বিল্ডিং— কিন্তু সেইসঙ্গে নতুন করে বাসযোগ্য। নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন উৎসাহ। অথচ দু'জনেই ষাট পেরিয়েছেন। একজন এখন জড়পিণ্ড প্রায়, উদ্ধারের আশা আছে কিনা জানি না। ডাক্তার তো নই! তারপরে বাড়িটা তো একটা ঐতিহাসিক বাড়িও বটে। সামান্য অর্থে কত জন্ম মৃত্যু বিবাহ কত জেনারেশন ধরে এ বাড়িতে ঘটে গেছে। আর অসামান্য অর্থে এক কালে এক ব্রিলিয়ান্ট ছেলের সমাধিভূমি, প্রেতভূমি এই বাড়ি। এখানেই কে জানে কী অসম্বদ্ধ কারণে সে তার প্রেমিকাকে আক্রমণ করে। এবং সেই চোখ লাল মুখে-ফেনা-ওঠা পশ্চাৎপট জেনেও এই শক্ত বনেদের মহলে সানাই বেজে ওঠে।

ফাইলপত্তর সামনে নিয়ে আবছা ভাবে এ সবই ভাবছিলুম। একশ বছরের পুরনো বাড়িও লোকে শেষ জীবনে সারাই-ঝালাই করে বসবাস করবার কথা ভাবে? ভাবছিলুম একজন দুর্ধর্ষ মেধাবী মানুষ শুধু বুদ্ধিচর্চা করছিল বলে উন্মাদ হয়ে গেল? মানসিক আঘাত বা দুর্ঘটনার প্রশ্ন যতক্ষণ ছিল, একটা ব্যাখ্যা ছিল। এখন যে দেবকুমারের সবটাই অর্থহীন হয়ে গেল! প্রকৃতি কি তবে চায় না মানুষ বুদ্ধিচর্চা করুক! নিজের সীমাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করুক! প্রকৃতি কি শুধু গতানুগতিকতাই পছন্দ করে! কতকাল ধরে, পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয়ে গেল, পিঁপড়ে একভাবে সার বেঁধে চলেছে, খাদ্য-সংগ্রহ ও বণ্টন করছে, গরমে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। খাবারের টুকরো কিছু পড়ে থাকলে, যেন মাটি থেকে হাওয়া থেকে আবির্ভূত হচ্ছে। পিঁপড়েদের মধ্যে কোনও ফেইনম্যান, কি এনরিকো ফার্মি হবে না, দেবকুমার হবে না। আরশোলাদের মধ্যে আরশোলাদেরই মানদণ্ডে কোনও রবীন্দ্রনাথ

হবে না। পরিবর্তন নেই। উদ্বর্তন নেই। টিকে আছে। কোনও মানে নেই কিন্তু যুগযুগান্ত ধরে টিকে আছে। অথচ যাদের টিকে থাকার মানে ছিল সেই রামানুজ শেষ। সেই দেবকুমার শেষ। দেবকুমার সাবান ঘষে ঘষে গেঞ্জি কাচছেন। নিজের বিছানা নিজেই ঝেড়ে নিতে শিখেছেন, এগুলো নিশ্চয়ই অ্যাসাইলামে তাঁকে অভ্যেস করিয়েছিল। আর হাইস্কুলের পাশকোর্স সায়েন্সের টেক্সট বই, অঙ্ক অনার্সের টেক্সট বই ঘাঁটছেন। এতদিন অনভ্যাসের পরেও যা তাঁর কাছে জলের মতো সোজা। নাকি সঞ্জীব সাহারায়ই একটা উপকথা বলে গেলেন? একজন কখন কী ভেবে অন্যের দিকে চলে যায় সে রহস্যই বা কে বুঝবে? স্থাবর বস্তু তো নয়!

—সমুদ্র!

মুখ তুলে তাকাই। সামনে মুকুলিকা, যাকে এখন আমরা সবাই-ই মুকুল বলে ডাকি।

—কী ব্যাপার? কিছু অসুবিধে হয়েছে? বসো না!

জয়ন্তী বা মুকুলের কোনও অসুবিধে হলে ওরা আমার কাছে আসে। ওদের অসুবিধে দূর করবার জায়গায় এখন আমি পৌঁছেছি।

মুকুল বসল। ও যেমন পরে একটা হালকা হলুদ শাড়ি। মুখ দেখলে মনে হয় না এ মেয়েটি এঞ্জিনিয়ার। যেমন কোনও জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই, তেমন বিশেষ লক্ষণীয় কোনও স্মার্টনেসও নেই, যা দীপার ছিল, জয়ন্তীর আছে।

ফাইলটা ঠেলে সরিয়ে দিই।

—বলো, ব্যাঙ্গালোরে এবার যেতে অসুবিধে আছে?

কোনও জবাব দিল না মুকুল। একটু পরে দেখি ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে, পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে, ও দু'একবার মোছবার চেষ্টা করল, তা-ও পড়তেই লাগল। মুখটা নিচু। আর জল মোছবার চেষ্টা ও করছে না, খালি শাড়ির ওপরাংশ ভিজে যাচ্ছে লোনা জলে।

নির্বাক দু'জনে বসে আছি। আমি বুঝতে পেরেছি। কী যেন একটা উথলে উঠছে আমার বুকের মধ্যে। কী নিরুপায় ও! কত

দীর্ঘদিন দুঃখ নিয়ে কাটিয়েছে, কতদিনের খরার পর এই বৃষ্টিপাত! কোনওদিন এ রকম অনুভূতি হয়নি আমার... এমন করুণা, যেন আমার শেকড় ধরে কে টান দিচ্ছে!

—মুকুল। তুমি কি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছ?

অসহায় কান্নার মুখোমুখি এই কথাগুলোই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

কিছু ভাবিওনি।

ও চুপ।

—বলো কিছু বলো! এখনই কেউ এসে পড়তে পারে।

তাড়াতাড়ি রুমাল ঠেকাল চোখে।

—আমি আজই বাড়ি গিয়ে বলব। ধরো মাস দুই তিন! ঠিক আছে?

টেবিলে পড়ে থাকা মুকুলের হাতদুটো তুলে নিয়ে ওর মুখের দিকে গভীর ভাবে চাই। চোখে চোখ মেলে না। ওর নিচু মুখটা লালে লাল হয়ে আছে।

—তোমাকেও বাড়িতে বলতে হবে। আমি যাব। ঠিকানা, ফোননম্বরটা কি দেবে?

একটা কার্ড বার করে দেয় মুকুল। তারপর বলে— এগোবার আগে একটু কথা বলতে হবে। একটা সন্ধে দাও আমাকে। দেবে?

মনে মনে বলি... জীবনের সব সন্ধ্যা তোমাকে দেবার আয়োজনই তো করছি! আবার কেন সন্ধ্যা চাও মুকুল? তুমি কি দীপার কথা কিছু জিজ্ঞেস করবে? ও কথা জানলে তুমি বড় কষ্ট পাবে, আর যদি জেনে ফেলে থাকো...

—আমি জানি না কীভাবে... মুখে বললুম— ঠিক আছে। বলো কবে?

—যদি শনিবার হয়? এই শনিবার? কোথায় গিয়ে একটু কথা বলা যায়?

—আমি তো জানি না। যেখানেই যাই, বড় ভিড়। তুমি বলো। আমি চলে যাব।

আজ এসেছি। লিন্ডসে স্ট্রিটের ও প্রান্তে ছোট্ট লম্বা রেস্তরাঁ। সত্যিই খুব শুনশান। দু'একজন পান করছে, খাচ্ছে, নিচু গলায় কথা বলছে। উঠে চলে যাচ্ছে।

আমি পৌঁছবার দশ মিনিট পরে মুকুল পৌঁছলো।

আমার একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল, কিন্তু ওকে ভাল করে দেখলুম। সাদার ওপর ছোট্ট ছোট্ট নীল নকশা, সাদা ব্লাউজ, সাদায় শ্যামবর্ণ কোনও যুবতীকে যে এত ভাল দেখাতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

এতক্ষণ একটা নরম পানীয় নিয়ে বসেছিলুম। ও কী খাবে জিজ্ঞেস করি।

—যা হোক কিছু।

—যা হোক? কোনও বিশেষ পছন্দ নেই?

—এখন ও সব ভাবতে পারছি না। ও মুখ নিচু করেই রয়েছে।

—সমুদ্র!

—বলো!

—তুমি কোনও ভূমিকা ছাড়া হঠাৎ ও কথা বললে কেন?

ও কি শুনতে চায় আমি বহুদিন থেকে ওকে ভালবেসে এসেছি! কথাটা তো সত্যি নয়। যার সঙ্গে জীবন বাঁধতে যাচ্ছি তাকে এমন মন-ভোলানো কথা বলব! না বললেও তো ও কষ্ট পাবে! একটু ভেবে বলি—

—মুকুল আমি নিজের সম্পর্কে খুব নিশ্চিত নই। প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো আমার আসে, সহজে করে যাই। যাকে তোমরা এফিশিয়েন্সি বলো। কিন্তু হৃদয় বা আবেগের ব্যাপারে আমার ভেতর থেকে একটা বাধা আছে। জানি না কেন। তোমাকে বরাবরই আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু তুমি সেদিন ওইভাবে ভেঙে পড়তেই আমি বুঝতে পারি আমাদের দু'জনের দু'জনকে দরকার।

—সমুদ্র, তুমি জানো না এই রেস্তরাঁয় বসে আমরা মানে আমি, দীপা, জয়ন্তী তোমাকে নিয়ে কত আলোচনা করতাম। আমরা... তিনজনেই কিন্তু তোমাকে...। দীপার বিয়েটা স্থির ছিল। তাই হয়তো... জয়ন্তী এখনও... ও খুব দুঃখ পাবে।

—মুকুল কেউ দুঃখ পাবে বলে তো আমি নিজেকে সবাইকার মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি না। পারি?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল— জয়ন্তী তোমাকে আগে অ্যাপ্রোচ করলে কী করতে?

—ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটত নিশ্চয়। তখন জয়ন্তীর কাছে আমি ভাববার সময় চাইতুম। আর একটু সময়, আর একটু...। তাতেই জয়ন্তী বুঝে যেত। তা ছাড়া ওর সেন্স অব হিউমার আছে বেশ। তোমার মতো কান্নাকাটি করার পাত্র নয়।

একটু হাসল— তা হলে আমি ছিঁচকাঁদুনে বলেই...।

আমি হেসে ওর হাতটা ধরে বলি— অত বিশ্লেষণ করতে নেই। আবেগ হল আবেগ। অনুভূতি হল অনুভূতি। কী হতে পারত আর কী হবে এ সবে আমাদের দরকার কী?

ফিনকিকে দেখতে হয়। কী হাসি! কী লম্ফঝম্প।

—একটা কাজের মতো কাজ এতদিনে করলি ছোড়দা। এর পরে আমারও একটা ভাল দেখে বিয়ে দিবি তো?

—শিওর, আমি বলি, ওর গালে ঠোনা মারি। যদিও এসব আমার আসে না। বাবা খুশি।—ডেকে বললেন— তোমার সিদ্ধান্তে আমি নিশ্চিন্ত হলুম সমু। এটা আমাদের কর্তব্য ছিল, কিন্তু কখনও তোমাকে বলতে পারিনি। এমন একটা ডিসট্যান্ট ধরন তোমার! মেয়েটি সগোত্র নয় বলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তোমাকে সংসারী দেখতে চাই। তারপরে ফিনির একটা...।

মা কিছু বললেন না। কিন্তু কয়েকদিন মায়ের ঘোরাফেরার একটা ছন্দ একটা প্রাণ এসেছে বুঝতে পারি।

আষাঢ় মাসে দিন ঠিক হল। প্রায় প্রায়ই দেখি ফিনকি মুকুলের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। দু'জনে সময় ঠিক করে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। জেঠুও জানতে পারলেন। রাতে গুডনাইট করতে যাই প্রতিদিন। সেদিন বললেন— 'সমু একটু বসো।' একটু বসে ওঁর

মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া আমার অভ্যেস। একটু পরে বললেন— 'সমু বড় ভাল ছেলে, বড় ভাল। ভাল হোক, সমুর ভাল হোক...' ঘুম-জড়ানো গলায় বলতে বলতে কথাগুলো মিলিয়ে এল। আরও কিছুক্ষণ বসলুম। তারপর ওই কথাগুলোর রণন নিয়ে নিজের ঘরে আসি। **একজন অসহায়, পরনির্ভরশীল, প্রায় আত্মবিস্মৃত মানুষ বলছেন, সমু বড় ভাল ছেলে।** সাদা শাড়ি পরা প্রসাধনহীন একটি শ্যামা কেঁদে চলেছে। কেঁদে চলেছে, একটি প্রাণোচ্ছল মেয়ে বলছে, এবার আমার একটা ভাল দেখে বিয়ে দিবি তো? মায়ের মুখে হাসি-হাসি ভাব, বাবা আপাতত হম্বিতম্বি ভুলে গেছেন। আর জয়ন্তী একমুখ হেসে বলেছে— ব্যাড লাক।

—কার?

—আমার। আর কার?

দুজনেই হাসি।

আর দাদা এবার জরুরি ফোন করেছে— সমু। তোমাকে ভীষণ দরকার। খুব সঙ্কটে পড়েছি। আমার আপন লোক দরকার, পরামর্শ দেবার।

প্লেনের টিকিট কাটি। দাদাকে জানিয়ে দিই। দাদাই থাকবার ব্যবস্থা করতে চাইছিল। টেলিফোনেই সব স্থির হয়ে যায়। কিন্তু আমার একটা সুবিধে হবে। গুরগাঁওয়ে কিছু অফিস-সংক্রান্ত কাজ আছে। কাকে পাঠাব ভাবছিলুম। নিজেই মিটিয়ে আসতে পারব। মা বিয়ের চিঠিটা দিয়ে দিলেন,— এই প্রথম দাদার সম্পর্কে কোনও মন্তব্য শুনলুম মা'র কাছে।— ওর বিয়ের সঙ্গে তো আমাদের কোনও সম্পর্ক রাখতে দেয়নি। বোলো বউ নিয়ে যেন আসে।

একটু হাসি পেল আমার। দিল্লির চটি। দিল্লির চটি নিয়ে ছুটিতে আসার কথা দাদার। এখনও ফিনকি চটি পরছে।

প্লেন ছুটেছে আর আমি ভেবে চলেছি। কী এমন পরামর্শ দরকার হতে পারে দাদার? সে তো বাইরে চলে যাবে ঠিকই করে নিয়েছে। অরোরাদের আওতা থেকে বেরোবার আর কোনও রাস্তাও তো নেই! যেটা বুঝেছে সেটাই করুক। আমার পরামর্শ ছাড়াই তো

এতখানি ভেবে ফেলতে, ব্যবস্থা করে ফেলতে পেরেছে। তা হলে? আমি কোন জাদু জানি যে আমার উপস্থিতিতে কিংবা পরামর্শে দাদার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? হঠাৎ মনে হয়, ও সব আসল কথা নয়। দাদা বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে খুব সুখে নেই। অন্যদের মুখোমুখি হবার সাহস ওর নেই। খালি আমাকে, একমাত্র আমাকেই ও সেইরকম আপন মনে করে যাকে নিজের ভুলচুক, সঙ্কট সব বলা যায়।

যাবার সময়ে প্লেন-এ। আসার টিকিট ট্রেনের। হেড অফিস থেকে ওরাই এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসে। ওরাই গেস্ট-হাউজে পৌঁছে দেয়। গুরগাঁওয়ের কাজ সারি। সরেজমিনে মার্কেট-কমপ্লেকসের সাইট দেখা, প্রারম্ভিক হিসেবপত্র করা। আমার মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে কোটেশন দেওয়া হবে। তিন-চারদিন চলে যায়। তারপর দাদাকে ফোন করি। সাদা মারুতি চড়ে গেস্ট হাউজে চলে আসে দাদা।

এ কী চেহারা হয়েছে দাদার? এত থসথসে মোটা? বয়স কত। মাঝ-তিরিশ? ফ্যাটটা তো ভাল লাগছে না! ও কি ড্রিংকস ধরেছে নাকি?

কে রোগা হল, কে মোটা হল, এসব কথা আমি কখনওই কাউকে বলি না। কিন্তু আমার দৃষ্টিটা যে মুহূর্তে দাদার মুখের ওপর স্থির হয় ও বুঝতে পারে। মনের ভেতর একটা দংশন নিশ্চয়ই আছে ওর।

কৈফিয়ত দেবার ঢঙে বলে— কী জানিস, বসে বসে মাথার কাজ তো! গুচ্ছের খানেক আবার রিসার্চ করছে আমার কাছে। আমার তো মনে হয় যে কোনওদিন রক্তে চিনি কি হার্টব্লক ধরা পড়বে। নাও ইনসুলিন, করো অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি... যাক গে যাক গে। তোর চেহারাটা বলতে নেই চাবুকের মতো। ফর্মটা ধরে রেখেছিস। অনেকদিন বাঁচবি। আরাম সে।

আমি হাসি— একটু যোগ-ব্যায়াম কি ফ্রি-হ্যান্ড-ট্যান্ড করলেও তো পারো। কিছু না হোক হাঁটাহাঁটি? মাথার কাজ-টাজ অজুহাত।

—কী জানিস, তেমন উৎসাহ পাই না, কিছুতেই না।

কেন কী বৃত্তান্ত আমি কিছুই জিজ্ঞেস করি না। ওর যদি বলার তাড়া থাকে ও-ই বলুক।

—চল তোকে পরোটা গলিতে খাইয়ে আনি। আগের বার খেতে চেয়েছিলি, মনে আছে?

পরোটা গলিটা যে একটা অছিলা ছিল, কোনও সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা ছিল না এসব কথা ওকে না বলাই ভাল। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে।

আমাদের বড়বাজারের মতো বিশৃঙ্খল ঘিঞ্জি জায়গাটা। একটা বিরাট গুরুদোয়ারা পেরোলুম। গাড়ি অনেক দূরে রেখে হেঁটে যাই। শীতকাল। কিন্তু দাদার একটু হাঁফ ধরছে। দু'চারটে দোকানে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করল।

—আমি কখনও আসিনি বুঝলি? দাদা একটু বোকার মতো হাসল,— সেই আজীবন কলকাতায় থেকেও লোকে 'পরেশনাথ' দেখে না, না? সেই রকম।

—এ হে-হে-হে, এ যে সবই ভেজ রে?

—তাতে কী হয়েছে? আমি বলি— আমার কোনও অসুবিধে নেই। তুমি কি একেবারেই...।

—আরে না না। ভেজ আমার ভালই লাগে, সেই মায়ের হাতের লাউ-মটরশুঁটি? অবশ্য যেদিন নুন-মিষ্টিটা ঠিক হত— দাদার সঙ্গে আমিও হাসি।

কাঠের বেঞ্চি, স্কুলের মতো হাইবেঞ্চ, লো বেঞ্চ। মাটির গর্তয় গনগনে উনুন তার ওপর পেল্লাই চাটু চাপানো। একজন ফর্সা লোক তাল তাল ময়দা ঠাসছে। কাঠের বারকোশের ওপর নানারকম পুর ভাগ করা করা রয়েছে। দাদা বলল— মেথি পরোটাটা আগে টেস্ট কর বুঝলি সমু? আলু পরোটা তো ওখানেও পাওয়া যায়।

আমার কোনও বক্তব্য নেই। ডাল, আলুর তরকারি, আর চাটনি আসে। মেথি পরোটা, গোবি পরোটা.. মটর পরোটা। এরা বলে পড়েঠা।

—বুঝলি সমু, আমার স্ত্রী যেতে চাইছে না।

—যেতে চাইছে না?— আমি অবাক— বস্টন কেম্‌ব্রিজ... যেতে চাইছে না?

—বলছে এখানে ওর অনেক দিনের চাকরি। ওখানে গিয়ে কী করবে?

—ওখানে গিয়ে ওয়র্ক পারমিট-টিট পেয়ে গেলে তো কাজ করতেই পারে?

—সে কথা ওকে কে বোঝায়? তারপর ছেলের এখন যে স্টেজ! ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। সেটাই...

—তাই বলে তোমার এত উন্নতি— সেটা ভাববে না? ছেলে তো স্কুল লেভল শেষ করে ওখানেই চলে যেতে পারে? বাবা-মা থাকলে তো ওর আরও সুবিধে হয়ে গেল! কত ছাত্র যাচ্ছে!

—তবে! দাদা হতাশ গলায় বলল— বলবীর আসলে ওর দাদু-দিদার চোখের মণি, ওঁরা ওকে ইন এনি কেস ছাড়বেন না।

—বড় হয়ে ও যদি নিজেই সে ডিসিশন নেয়?

—ওই তো বলে কে!

আমি দাদার দিকে তাকাই— এমন চান্স কিন্তু জীবনে বারবার আসবে না দাদা।

—তুই বলছিস? মিস করা ঠিক নয়, না? —দাদা খুব চনমন করে উঠল।

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে আমি যে যাচ্ছিই সে কথা জানিয়ে দিই, না কী?

—ভেবে দ্যাখো।

—আবার ভেবে দ্যাখা-ট্যাখা কেন? সিদ্ধান্তটা যাতে নিতে পারি তাই তো তোর সাপোর্ট চাইছি!

—হ্যাঁ পরে বউদি নিশ্চয় বুঝবেন, মত পরিবর্তন হবে।

—সে গুড়ে বোধহয় বালি— দাদা খুব বিমর্ষ মুখে বলল— ও আদৌ যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। হয়তো... হয়তো বা ডিভোর্সই চাইবে।

—সে কী? আমি আপাদমস্তক অবাক হয়ে যাই।

দাদা করুণ মুখে মাথা চুলকোতে থাকে।

—এমনই কি সম্পর্ক তোমাদের যে যখন-তখন ডিভোর্স চাওয়া যায়।

—কী জানিস, যার একটা নিজের সন্তান হওয়ারই অধিকার নেই, তার সঙ্গে আর কী রকম সম্পর্ক হবে! তারপর ছেলেটাও তো বাবা বলে অ্যাকসেপ্ট করল না। অ্যাকসেপ্ট না করলে আমি কী করতে পারি, বল! চেষ্টার তো কসুর করিনি। উদ্ধত, বেয়াড়া ছেলে একটা, লাইফটা হেল করে দিলে।

বুঝতে পারি দাদার পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

—তুমি তোমার সিদ্ধান্তে স্থির থাকো, আপাতত তোমার কি খুব অসুবিধে হবে বউদি না গেলে? অত সহজে ডিভোর্স চাইতে পারে সে কেমন মানুষ?

অন্যের সম্পর্কে মতামত প্রকাশ আমি কখনও করি না। প্রত্যেককে তার ভাবনার স্বাধীনতা দিই। কোনও ভাবে নিজের ছায়া পড়তে দিই না। আজ কেন দিলুম? মনে হচ্ছিল— দাদা একেবারে কূল হারিয়েছে। তাই কী?

—ঠিক বলেছিস। আমি কী জানিস, একটা আইডেনটিটি কার্ড, একটা মলাট। সোনুর স্বামী, বলবীরের বাবা। এ ছাড়া আর কোনও দরকার ওদের আমাকে দিয়ে নেই।

—বউদিও কি এভাবেই ভাবে?

—কী জানি। বোধহয়! এদের মনের গড়নটা একটু অদ্ভুত। সেন্টিমেন্ট-টেন্ট ধার ধারে না।

—তা ছেলের জন্যে তো খুবই আছে। কত লোকে চান্স পেলে বাবা-মা'র কাছে ছোট বাচ্চা রেখে চলে যায়। পরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়ে যায়! আর এ তো একটা বড় ছেলে?

—ঠিক বলেছিস। সেন্টিমেন্ট আছে, আমার জন্যেই নেই।

—সে ক্ষেত্রে দাদা তোমার চলে যাওয়াই উচিত। ডিভোর্স-টিভোর্স এখুনি দিয়ো না। পরে তো পরিস্থিতি বদলাতেও পারে।

—ফাদার-ইন-ল'টা প্রবলেম করতে পারে। কিছুদিন হল রিটায়ার করেছে অবশ্য।

—পুরো জিনিসটা তুমি সিক্রেটলি হ্যান্ডল্ করো। যাবার আগে ক'দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকো, চলে যাও, তারপর খবর দিয়ো।

—জানি না পারব কি না। তুই একটু হেল্প কর। আমি যদি ক'দিনের জন্যে কলকাতায় চলে যাই! ...তোর কমপিউটার আছে? ফ্যাক্স?

—সবই আছে, অফিসে।

—কলকাতার বাড়ির ঠিকানা দেব বুঝলি। পাসপোর্ট, ভিসাও ওই আড্রেস। ইতিমধ্যে যা কিছু খুচরো খবর তোর ফ্যাক্স নম্বর-এ কি ই-মেলে করবে।

—রিলিজ?

—আরে ওদিকটা সম্পর্কে শিওর হয়ে গেলেই আমি রেজিগনেশন দিয়ে দেবো।

—নোটিস দিতে হয় তো?

—ধুর, কনট্রাক্ট সারভিস্ তো আর নয়। ফর্ম্যালিটি... জাস্ট ফর্ম্যালিটি...। আর পি. এফ-এর টাকা আমি বেশির ভাগটাই তুলে নিয়েছি। এই লোন, সেই লোন। সোনুকে একটা চিঠি লিখে রেখে যাব— তোমার জেদের জন্যে তো আর আমি আমার কেরিয়ার নষ্ট করতে পারি না! সুতরাং আমি চললুম। তুমি যখন ইচ্ছে চলে আসবে। ড্রাফটটা করে ফেলি বল!

আমি হেসে ফেলি— ড্রাফট করাটা আর এমন শক্ত কাজ কী! ও সব কারও চোখে-টোখে পড়ে গেলে...।

—ঠিক বলেছিস। কাগজপত্র কি আর তেমন সেফ? ড্রয়ারের একটা ডুপ্লিকেট চাবি করানোর এমন কী হাঙ্গামা?

বেশ জটিল অবস্থা দাদার। যা ভেবেছিলুম তার চেয়েও ঘোরালো।

যে আশ্রয়কে অনিরাপদ ভেবে দূরে সরে গিয়েছিল, সে আশ্রয়েই ফিরে আসতে চাইছে নিরাপত্তার জন্য। কী পরিহাস! দাদা কি কখনও নিরাপদ হতে পারবে?

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি স্পিড নেবে। দাদার ফুলো-ফুলো বিধ্বস্ত চেহারাটা কেমন ঢেউ ওঠা জলের তলার ছবির মতো বেঁকেচুরে যায়। কাচের লেভেলে কিছু দোষ থাকলে এ রকম হয়। দাদার চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাই। আরও আরও দূরে চলে যাচ্ছে দাদা। কে জানে হয়তো আর দেখা হবে না। দাদা কি সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত নিতে পারবে? দাদা কি কোনওদিন নিরাপদ হবে? আমি কেন মতামত দিলুম? কখনও তো দিই না! দাদার জীবনের সঙ্গে আমার মতামতের কী সম্পর্ক? তবে কি আবার কোনও জল-বসন্তের রাত এলো, যখন আমি ছাড়া দাদার কোনও শুশ্রূষা নেই!

আমার বার্থ নম্বর তেইশ। গুছিয়ে বসি, ওভারনাইট ব্যাগ একটা তলায় চালান করে দিই। চব্বিশ নম্বর অর্থাৎ ওপরের বাঙ্কের মালিক একটি মারোয়াড়ি ছেলে। নাম ভিনিত। অর্থাৎ আমাদের 'বিনীত'। প্রচুর মোটা, তেমনি ফর্সা, সবই যেন ওর ফেটে পড়ছে। খুব হাসিখুশি মিশুক ছেলে। 'দাদা দাদা' করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ ভাব জমিয়ে নিলে। আমাকে কিছু বলতে হয় না, ও-ই একনাগাড়ে বকে যায়। দিল্লিতে মৌসির কাছে থেকে চার্টার্ড পড়ে। বাবার বিজনেস কলকাতায়। কিন্তু ও কলকাতায় যোগ দেবে না। কলকাতার, কিছু মনে করবেন না দাদা, কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সুবিধে পেলেই ও অন্য কোথাও বিজনেস উঠিয়ে আনবে। দিল্লি ইউ.পি-র বর্ডার নয়ডা খুব ডেভেলপ করছে...ওইখানেই।

নিজেই নিজের ভুঁড়িতে টুসকি মেরে হাসতে থাকে— আমাকে আর কী মোটা দেখছেন দাদা, আমার মা ঔর ভি, পাপ্পার প্যান্ট বানাতে পুরা ছ'মিটার কাপড় লাগে। মোটা-মোটি কি ফ্যামিলি, দুবলি-দুবলা কোই নহি।

—খুব ঘি খাও তো?

—আরে কী বলেন দাদা, ঘিউসেই তো খানা পকতা হ্যায়, হোনাই তো চাহিয়ে। আপনি কী করে এমন চেহারাটি বানিয়েছেন দাদা?

আমি হেসে বলি— এ আর এমন সিক্রেট কী? আমি তোমাকে বলতেই পারি। কিন্তু তুমি পারবে না।

—বোলিয়ে না দাদা! ওয়েট-লিফটিং, ইয়োগা? বোলিয়ে না, লড়কিলোগ পসন্দ করতি নহি।

—তবে তো বলতেই হয়, আমি মজা পেয়ে বলি, ওসব ইয়োগা টিয়োগা পরের কথা। আগে ঘি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

—ও হি তো! উও মুঝসে নহি হোগা দাদা।

উল্টো দিকে হেঁটো ধুতি পরা এক ভদ্রলোক মনের সুখে খইনি ডলছেন, বলে উঠলেন— দুধ পিও ভাই, লোটাভর দুধ পিও। ভঁইস কা দুধ। লড়কিলোগ আপসে আ যায়েঙ্গি। ইৎনা গ্ল্যামার হোতা, ইৎনা গ্ল্যামার! তাকত! হিম্মৎ!

অন্য দুজন ভদ্রলোক ব্যবসায়ী মনে হল। নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় জোর গলায় আলোচনা করে চলেছেন। ফ্লাই অ্যাশ অ্যান্টি পলিউশন মেজার, গ্যাসকেট, সেরামিক ব্রিক...এ রকম নানা টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে। এঁরা বোধহয় অন্ধ্রের লোক। তেলুগুতে কথা বলছেন। খুব ভরাট গলা দুজনেরই। নিজেদের জগতে একেবারে মগ্ন, ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি নেই।

সাইডের সিটে ওঁরা নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী, দুজনে মুখোমুখি পা ছড়িয়ে বসে আছেন, কখনও বাইরে চোখ রাখছেন, কখনও নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। কিন্তু শোনা যায় না। শব্দ নেই শব্দ নেই করেও ট্রেনের একটা কেমন অন্তর্নিহিত ধ্বনি থাকে যা সব কথাবার্তা, সব আওয়াজ দূরে পাঠিয়ে দেয়। একবার চকিতের জন্য মনে হল, অদূর ভবিষ্যতে এরকম একটা দৃশ্যে থাকতে পারে মুকুলিকা পালিত এবং এই মানুষটা যাকে 'আমি' বলে চিনি। কেমন অবাক লাগল কথাটা ভেবে। এতদিন এক ভাবে বেঁচে এসেছি, এখন এরপর কি অন্য ভাবে বাঁচব? সেই বাঁচাটা কেমন আমি আন্দাজ করতে পারছি না। আমি কি এই আমিই থাকব না অন্য কোনও আমি হয়ে যাব? টুপ করে একটা দুটো পেয়ারা পাতা খসে পড়ে, হাওয়া বয়, জলের মধ্যে ছবি ভেঙে ভেঙে যায়!

বাইরেটা যতক্ষণ দেখা যায় দেখি। তারপর কাচে শুধু এই কামরারই বিম্ব। এই আমি, ওই ভিনিত, খইনি, ব্যবসায়ীযুগল, দম্পতি। একটা সিনেমার দৃশ্য দেখছি, আমার একটা নগণ্য ভূমিকা আছে ছবিটাতে, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

মাঝখানের পর্দাটা টেনে দম্পতিদের আড়াল করে ব্যবসায়ীযুগল আবার একটু পানও করে নিলেন। 'হোপ য়ু ডোন্ট মাইন্ড' জাতীয় একটা নাম কা ওয়াস্তে অনুমতি নিয়ে। ভিনিত বলল—দাদা চলে? আমি প্রশ্নটা ওকে ফিরিয়ে দিই। মৌসি-মৌসা নাকি ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে ড্রিংক করলে। খৈনি দেখি হঠাৎ একটা কুঁড়োজালি মতো নিয়ে জপ করছেন। এতক্ষণে খেয়াল করি ওঁর গলায় কণ্ঠি। বিহারি বৈষ্ণব আমি এই প্রথম দেখলুম। উনি গ্ল্যামারেও আছেন, কুঁড়োজালিতেও আছেন।

আটটা পেরোতে না পেরোতে ওরা খাবার দিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ সেটা রেখে দিই, ঠায় বসে থাকা আর খাওয়া ছাড়া এ সব সুপার ফাস্টে তো আর কিছু করার থাকে না! কাজেই একটু পরে অ্যালুমিনিয়ম ফয়েলের খোসা ছাড়াই। সেই এক আধা-হলুদ পোলাও, আধা-কালো চিকেন, ডাল, একটা অখাদ্য তরকারি যাকে এরা বলে 'সবজি'। একটু স্যালাড। মায়ের বা রাঁধুনির রান্না নুন-খরো মিষ্টি-বেশি আলুনি আতেলা সবই তো খেয়ে নিই। এই ট্রেন প্লেনের তথাকথিত সুখাদ্য কেন কে জানে গলা দিয়ে নামে না! এর পরে বোধহয় দই বা আইসক্রিম দেবে, সেটাই ভরসা।

ভিনিত তো খাবারটা নিলই না। স্বাভাবিক। সে যেখানেই যাক না কেন তার ঘিও সঙ্গে যাবেই। একটা ডিব্বা খুলল, ঘিয়ের গন্ধে ভরে গেল আমাদের কুঠুরি, মোটা মোটা পরোটাগুলো আচার দিয়ে খেয়ে নিল চটপট। খইনি দেখি জুলজুল করে দেখছেন।

একটু বকবক শুনি ভিনিতের, চুপচাপ চিন্তাহীন বসে থাকি কিছুক্ষণ। সাড়ে নটা বাজতে না বাজতেই ভিনিত ওপরে উঠে যায়, ঝাড়ছে সশব্দে বাঙ্কটা, বিস্তঁরা বানাবে। ব্যবসায়ী দুজন না উঠলে আমি বা খইনি কেউই শুতে পারছি না। শেষকালে খইনি এক

আকাশ পাতাল জোড়া হাই তুললেন শব্দ করে।

—'ওহ সরি, আপকো সোনা হ্যায়'...একজন সেরামিক ব্রিক খইনির ওপরের বাঙ্কে উঠে গেলেন, আরেকজন অন্য খুপরিতে চলে যান। নিভাঁজ বিছানা করি অতঃপর। বাড়তি চাদর মাথার দিকে ভাঁজ করে দিই। কম্বলের কুটকুটোনির থেকে সুরক্ষা-চাদরটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পাড়ি একটা চটি বই নিয়ে। 'নিদ্রাযোগ' বা 'নিদ্রাইয়োগা', নামটা এভাবেই লেখা। কিন্তু বইটা ইংরেজিতে। নিদ্রা ছাড়া কী-ই বা করবার আছে ট্রেনে? লেখক নিদ্রাকে নিদ্রাতেই আটকে রাখতে চাইছেন না। তাকে যোগ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, একটা সচেতন মানসিক ব্যায়াম। এভাবে যদি নিদ্রাকে ব্যবহার করা যায়, তা হলে নিদ্রা যে আরও কতগুণ বিশ্রাম ও এনার্জি দিতে পারে তার হিসেব অঙ্ক কষে দেওয়া আছে। মজা লাগে, আশ্চর্যও লাগে সেই সমীকরণ পড়তে। নিদ্রাযোগ, মোহনিদ্রা যোগনিদ্রা, ও মহানিদ্রা—এই রকম শ্রেণিবিভাগ করেছেন ভদ্রলোক। নিদ্রাযোগ থেকে যোগনিদ্রায় পৌঁছলে প্রাণশক্তিকে পর্যন্ত মুলতুবি রাখা যায়। আমরা যেসব সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শুনি ক্বচিৎ কদাচিৎ যাঁরা মাটির তলায় দীর্ঘক্ষণ জীবন্ত সমাধির পরও বেঁচে থাকেন, তাঁরা এই যোগনিদ্রা ব্যবহার করেন। কিছুই না, খালি চর্চা। যোগনিদ্রার অভ্যাস পাকা হলে মহানিদ্রা অর্থাৎ চিরনিদ্রার ক্রান্তি খুব সহজ সুন্দর হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু কৌতুক বোধ করি। নিদ্রা মানেই তো চেতনাকে মুলতুবি রাখা, তার আবার সচেতন ব্যবহার কী জিনিস? শবাসনের মতো কী? ঘটনাহীন ট্রেন-যাত্রায় করার মতো কিছু পেয়ে আমি একটু হাঁফ ছাড়ি। মাথার কাছের সুইচটা অফ্ করে দিই। তারপর হাত পা সব শিথিল করে দিতে শুরু করি। পা থেকে ওপর দিকে উঠতে হয়। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স...।

একদম গোড়ার দিকে কোথাও কারও নাসিকাগর্জন শোনা যাচ্ছিল। তারপর কামরায় খালি ঘুমের শান্তি, যার ভেতরে আমি তলিয়ে যেতে থাকি। চেতনার অতলেও কিন্তু ট্রেনের ঝড়ো গতি শরীরে জেগে থাকে, কামরা মৃদু মৃদু দোল দেয়, শিশুকে দোল

দেওয়ার মতো। কত গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, অ্যাস্টারয়েড, কত তারা, মহাজাগতিক বর্জ্য অকল্পনীয় গতিতে ঘুরছে মহাকাশে। আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে তার কিছুই তো বুঝি না। শুধু দিনরাত, শুধু ঋতুবদল দেখে বুঝতে শিখেছি আমরা চলেছি। হোক একই কক্ষপথে, তবু চলেছি। এখন ঘুমের মধ্যে হিমোগ্লোবিনে হিমোগ্লোবিনে, নিউরোনে নিউরোনে গতি বয়। সেই গতির সঙ্গে শরীরের ভেতরের সমস্ত উপাদান প্রতি মুহূর্তে সমঝোতা করে নিতে নিতে চলেছে। এই ক্ষীণ বোধ চেতনার অবতলে জেগে থাকে। হে আপাত ঘুমন্ত মানুষ তুমি থেমে নেই। বাহিত হয়ে যাচ্ছ স্থান থেকে স্থানান্তরে, গতি থেকে স্বস্তিতে, স্বস্তি থেকে শান্তি, শান্তি থেকে উপশম।

তবু, এখানেও নিদ্রা আমাকে পুরোপুরি অধিকার করতে পারে না, কেন না আমার সব পথ গ্রাস করে দাঁড়ায় এক বিশাল প্রত্ন অট্টালিকা। উঁচু উঁচু মোটা মোটা... ডরিক থাম, গুপ্তযুগীয় খিলান, পল্লেস্তারা খসে গেছে। যেখানে কোনওকালে দেয়াল চিত্র ছিল, এখন সে দেয়াল আঁকড়ে রয়েছে দানব-বিছের মতো বট-পাকুড়ের শেকড়ের মানচিত্র। ঘরের পরে ঘর পার হয়ে যাই। শূন্য। উঠোন, বারান্দা, দালান শূন্য। অথচ কোথা থেকে প্রতিধ্বনি আসে, কত রকম ডেসিবেল-এর, পায়ের আওয়াজ, ছুটে যাওয়া, হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠা, কলকল করে রুদ্ধ হাসি বয়ে যায়। বাচ্চা গলা ঘ্যানঘ্যানায়, বুড়ো মানুষের শ্লেষ্মাজড়িত কাশি, কথা কাটাকাটি, প্রেমিকের ফিসফিস, প্রেমিকার শীৎকার...পেছন ফিরে দেখি, পায়ের শব্দ থেমে যায়, হাসিতে হাসি মেলাতে যাই, হাসি থেমে যায়, কে কাঁদছ? বারান্দায় ধুলোর আস্তরণ, তার তলায় চাপা পড়ে গেছে কান্না, ঝুঁকে দেখি বাইরের একদা বাগানে স্তূপীকৃত পড়ে রয়েছে ভাঙা দেয়াল-ছাতের ইট কাঠ পলেস্তারার জঞ্জাল, ইঁদুর বেরিয়ে আসে, হুলো বেড়াল চাপা রাগে গজরায়। আর হঠাৎ সেই সমস্ত শূন্যতা, প্রতিধ্বনি, পতিত জমি, পরিত্যক্ত প্রাসাদ বেড়ে তার কুণ্ডলীকৃত শরীর পাকে পাকে খুলতে খুলতে উঠে দাঁড়াতে থাকে

এক মহাসর্প। অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যে, গরিমায়। তার রং গাঢ় বাদামি, চিকন, উজ্জ্বল, ভেতরের আলোয় জ্যোতিষ্মান, ফণায় ধবধবে সাদা নকশা। যেন কোনও মহানর্তক ধীরে ধীরে অপাবৃত করছেন তাঁর মুদ্রা মহিমা।

ধুন্ধুমার গর্জনে সেই প্রাসাদ ভেঙে পড়ে। ভেতরে ভেতরে এত জীর্ণ এ যেন হওয়ারই ছিল। এই রহস্য কুঠির সব কোণ-কুলুঙ্গি দেখা হল না। খেদ নেই তেমন, কিন্তু ভেঙে পড়ার প্রতিঘাতে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। ভূকম্পের আওতা থেকে প্রাণপণে বেরিয়ে আসতে চাইছি, পারছি না। আমার নিদ্রাযোগ বা যোগনিদ্রা আমাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে। আপার বাঙ্ক থেকে বিরাট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে ভিনিত। ওদিক থেকে অস্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁর বাঙ্কসুদ্ধু ভেঙে পড়েন ভিনিতের ওপর। উল্টো দিকের বার্থ থেকে খৈনিখাদক ছিটকে আসেন আমার বার্থের কিনারায়। আবার ছিটকে যান ওদিকে। এদিকে ওদিকে, এদিকে ওদিকে যতক্ষণ না তাঁর ওপর পর্দার ওপার থেকে ভীষণ শব্দে ভেঙে ছিটকে আসে তাদের বার্থসুদ্ধ দম্পতি এবং সবাই মিলে তালগোল পাকিয়ে যায়। জানলার শাটার কাচ ভেঙে পড়ছে চতুর্দিকে। আমার ওপরও, কিন্তু আমার অসাড় শরীর কিছুই অনুভব করছে না। গায়ে রক্ত, কিন্তু সে যেন সদ্যোজাত শিশুর গায়ে মায়ের রক্ত। গোঙানি চলতে থাকে, হাহাকার, আর্তনাদ। তারপর চুপ। খালি ভাঙা জানালাপথে তুমুল চিৎকার শুনতে পাই। ক্রেন... ক্রেন, গ্যাসকাটার গ্যাসকাটার, দমকলের আওয়াজে রাত কাঁপতে থাকে। আমি শুধু শুয়ে থাকি তীক্ষ্ণ কাচের ফলা বুকে নিয়ে, তৃষ্ণার্ত, কখন কে মাটি ফুঁড়ে জল দেবে তার প্রতীক্ষায়।

চারদিকে অন্ধ দেয়াল। হাতড়াই। পেছল বেয়ে বেয়ে এগোতে চাই, অথচ কুয়োর ঢাকনি খোলা, দেখা যায় বর্তুল মুক্তি। কুয়োর কিনারা থেকে ঝুঁকে থাকে ছায়ামুখ, চিনি, চিনি, চিনতে পারি না। চারিদিকে জল খেলতে থাকে, মুখগুলো আপসাতে থাকে, ঝাপসা হয়ে যায়। কীরকম অন্তহীন জ্যোৎস্না ওপরে। পৌঁছতে চাই।

পৌঁছতে চাই। কী করে? কীভাবে? মাথা খুঁড়ি। তারপর মনে পড়ে যায় আমার সেই একান্ত নিজস্ব গুপ্ত ক্ষমতার কথা।

নিরেট শূন্যে পায়ের একটু ধাক্কা, উড়ে যাই গিয়ার বদলে বদলে ওপরের আলোকিত অন্ধকারে। নির্বাধ উড়ে যাই। নীচে অজস্র বুদবুদের বর্ণালি রঙের হলকা ছুটিয়ে ফেটে যায়।

---